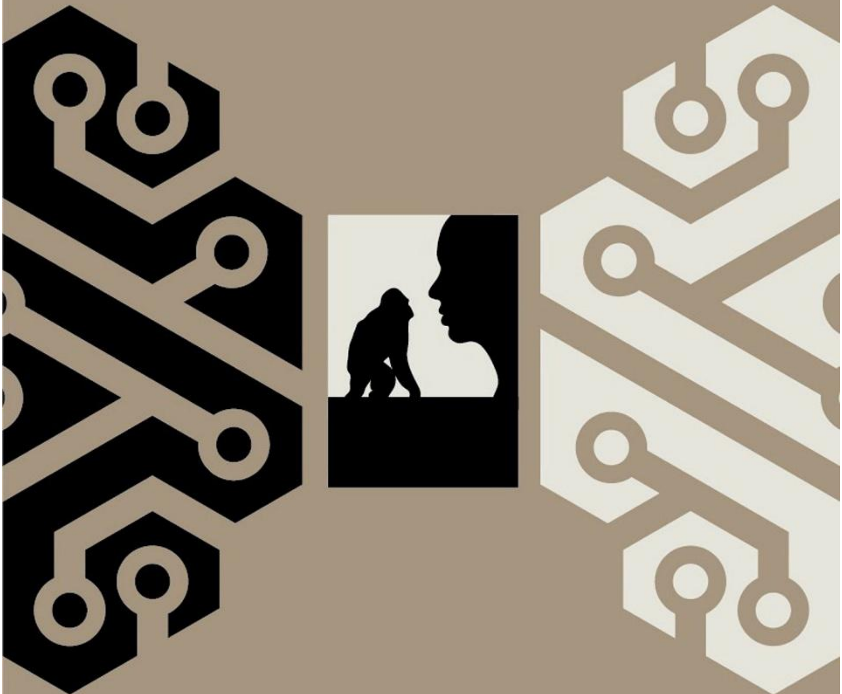

দুই বুদ্ধি

সায়েন্স ফিকশন নয়
আগামী দিনের গল্প

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

এটি এ শতাব্দীর ষাটের দশকের পটভূমিতে একটি সাধারণ জীবন যাপনের গল্প। ওই জীবনে অবধারিত ভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বসবাসের বিষয়টি। মানুষের নিজের বুদ্ধি এবং তার সৃষ্টি করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা– এই দুই বুদ্ধির খেলা এখনও কম চলছেনা। এটি এত দ্রুততার সঙ্গে এগুচ্ছে যে ওই সময়ের মধ্যে এটি কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা বলা কঠিন। তবু কিছুটা আন্দাজ করেই এই কাহিনী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী অনেকেই তখন মানুষের সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাংলাদেশের এক নারী-বিজ্ঞানী সোফিয়া এ গল্পের মধ্যমণি। বাংলাদেশ অবশ্য সাংস্কৃতিক অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ, সবার আসল গুরুত্ব তখন বিশ্ব ব্যবস্থার ওপর। সোফিয়া, তাঁর পরিবার এবং গল্পের নানা দেশীয় পাত্র পাত্রীরা সবাই বিশ্ব নাগরিক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে যাবতীয় কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব দিয়ে তাঁরা এখন জীবিকার জন্য গতানুগতিক কাজ থেকে মুক্ত– যদিও অনেকেই ওই বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের পেশায় রয়েছেন। বিশেষ করে কায়িক শ্রম থেকে মুক্তি সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বিপ্লবের একটি বড় অবদান। সবাই এখন স্বাধীন অবকাশে সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানের আনন্দময় কাজ করেন এবং বিশেষ ভাবে করেন স্বেচ্ছাসেবী হয়ে সহমর্মী মানব সেবার কাজ।

এ গল্পের অনেকের ভাবনা-চিন্তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে– এই বুদ্ধি চেতনা ও কাণ্ডজ্ঞান কী ভাবে পাবে? সুপার ইন্টেলিজেন্ট হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেনা তো ভবিষ্যতে কখনো? তবে শিক্ষার্থীরা ও বয়স্করা সবাই পারিবারিক বন্ধন, মানুষের মন স্পর্শ করা, মানুষের সেবা এমনি আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ। যন্ত্রকে তাঁরা বুদ্ধিমান করছেন, কিন্তু যান্ত্রিকতা যেন তাঁদেরকে আচ্ছন্ন না করে।

দুই বুদ্ধি

দুই বুদ্ধি

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
annayadhaka@gmail.com

© লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ৪৫০.০০ টাকা

ISBN 978 984 98854 9 8

Dui buddi by Muhammad Ibrahim
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2025, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 450.00 Taka Only

USA Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে **অনন্যা**'র বই কিনতে ভিজিট করুন
www.anannyabooks.com

উৎসর্গ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাহসী তরুণ-তরুণীদেরকে, ছাত্র-জনতার অতুলনীয় আত্মত্যাগকে স্মরণ করে।

ভূমিকা

এই বইয়ের নামের সঙ্গে বলা হয়েছে এটি সায়েন্স ফিকশন নয়। তবে এটি সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়ক, এবং এটি ফিকশন অর্থাৎ বানিয়ে বলা গল্প। তা হলে সায়েন্স ফিকশন বলতে আপত্তিটি কোথায়? কারণ হলো যুগে যুগে এবং আজকে অধিকাংশ সায়েন্স ফিকশনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট এই বইয়ের নেই। সেটি হলো ওতে ফিকশন থাকে বেশি, সায়েন্সকে কম রেখে। ফলে বর্তমান বিজ্ঞানের গতি ধারায় না এগিয়ে জোর করে কল্পনাকে অনেক দূরে নিয়ে চাঞ্চল্যকর জমজমাট উপন্যাস হওয়াটি এর প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। সায়েন্স ফিকশনের যেগুলো খুব উৎকৃষ্ট উদাহরণ সেগুলো অবশ্য বিজ্ঞানীকে একেবারেই অভাবনীয় নতুন লক্ষ্য দেয়– যার অনুপ্রেরণায় তিনি কাজ শুরু করতে পারেন। এই বইয়ে সে রকম কোন বিজ্ঞানের বাস্তবতার কথা বলা হয়নি যার উন্নয়ন এখন চলছেনা, বা যার কথা এখনো ভাবা হয়নি। এটি বরং আগামী মাত্র কয়েক দশক পরের একটি সাধারণ গল্প বলে বিবেচিত হতে পারে।

এখানে চেষ্টাটি হলো বর্তমান বিজ্ঞানটিকে ভিত্তি করে আগামী দিন কী রকম জীবন প্রায় অবধারিত ভাবে আসছে তার গল্প বলার। যে জীবনে গুরুত্বটি থাকছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বসবাসের ওপর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে আজকেই ভেতরে ভেতরে কী করে ফেলছে তা লক্ষ্য না করলে অবশ্য ওই 'অবধারিত' কথাটি সঠিক মনে হবে না। মানুষের নিজের বুদ্ধি এবং তার সৃষ্টি করা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা– এই দুই বুদ্ধির খেলা এখনই কম চল্‌ছেনা। সময়টিও তাই খুব দূরে স্থাপন করা হয়নি, কয়েক দশক এগিয়ে এ শতাব্দীর ষাটের দশকেরই গল্প। সে রকম দিনগুলো সম্পর্কে, বিশেষ করে তখন দুই বুদ্ধির জগতটি কী রকম হতে পারে সে সম্পর্কে অনেকেই ভাবেন। ভাবনাটি গল্পচ্ছলে ছড়িয়ে দেয়াটাই উদ্দেশ্য। গল্পের মজাটিও যদি পাঠকের আগ্রহকে খানিকটা টেনে নিয়ে যেতে পারে সেটি বাড়তি লাভ। গল্পের পাত্রপাত্রীরাও একই কারণে সায়েন্স ফিকশনের মত অদ্ভুত কেউ নয়, আজকের নিরিখেই এদের সবাইকে মোটামুটি পরিচিত ধাঁচেরই মনে হবার কথা।

তা হলে ওই সময়ে গিয়ে অথবা আর একটু দূরপাল্লায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোথায় গিয়ে ঠেকতে পারে তার আভাস কি এখানে নেই? হ্যাঁ, তাও কিছু পরিমাণে আছে। এই প্রযুক্তিটি যে রকম দ্রুততার সঙ্গে এগুচ্ছে তাতে কয়েক দশকেই এটি কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তার ভবিষ্যদ্বাণী কঠিন। অনেক কিছুই হতে পারে। অনেক দিন

থেকেই, বলতে গেলে আধুনিক কম্পিউটারের ধারণা আসার পর থেকেই, বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য মানুষের মতই বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল যন্ত্র উদ্ভাবন করা। এ লক্ষ্যের 'বুদ্ধিমান' অংশটি প্রায় অর্জিত হয়ে গেছে, তবে 'চিন্তাশীল' অংশটি এখনো অধরা রয়ে গেছে, মাঝে মাঝেই যদিও দাবী করা হচ্ছে এটি অর্জনের। চিন্তাশীল হওয়া বলতে যদি বোঝাই মানুষের মত আত্মসচেতনতা লাভ, এবং সব বিষয়ের কাণ্ডজ্ঞান অর্জন, যাকে এক রকম অন্তর্দৃষ্টিও বলতে পারি– তা হলে চ্যালেঞ্জটি বেশ বড় রকমের। সহজে ধরা দেবে বলে মনে হয়না। আমাদের গল্পে সেটি এখনো ঠিক অর্জিত হয়নি বটে, কিন্তু এ নিয়ে চিন্তা, কথাবার্তা সবার মুখে মুখে। সবার মনের একান্ত ইচ্ছা মানুষের মত বোধশক্তি সম্পন্ন 'সাধারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' সৃষ্টি।

আমাদের সঙ্গে এ গল্পের পাত্র-পাত্রীদের একটি পার্থক্য হলো এরা বিপ্লব- পরবর্তী মানুষ। এই বিপ্লব হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতির কারণে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক বন্দোবস্ত যা সারা বিশ্বে ঘটে যাবে সেটি। তাতে অধিকাংশ মানুষ তাদের কাজ হারাবে– বিশেষ করে কায়িক শ্রমের কাজ এবং গতানুগতিক কাজ। অবশ্য বুদ্ধি-বৃত্তিক আকর্ষণীয় কাজের বড় অংশটিতেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের জায়গা দখল করবে। বিশ্বজোড়া সমঝোতা ও সুবুদ্ধির আশা করে ধরে নিচ্ছি যে এর ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়কে বিশ্ব বেশিদূর এগুতে দেবেনা। নিজের রুটি রুজির কাজ হারিয়ে ফেলার শোককে শিগগির শক্তিতে পরিণত করবে। তখন মানুষ নেহাৎ জীবিকার জন্য করা কাজ থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের হৃদয়-উৎসারিত উপযুক্ত কাজগুলোই করবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ করবে তার মানবিক বুদ্ধি দিয়ে, আর মনের আনন্দে আর্টস-সায়েন্সের সৃষ্টিশীল কাজে যোগ দেবে। আনন্দময় স্বেচ্ছাসেবী কাজের মধ্যে সব থেকে বড় হবে ভুক্তভোগী মানুষের সেবা।

আমাদের গল্পের মানুষদের একটি বড় দুশ্চিন্তা হলো 'সাধারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' অর্জন করার পর যে গতি এটি পাবে তাতে সুপার ইন্টেলিজেন্ট না হওয়া পর্যন্ত হয়তো এটি থামবেনা। যদিও তারা মনে করছে এর প্রথমটি অর্জনেই প্রচুর সময় আরো লাগবে, আর সুপার ইন্টেলিজেন্ট তো আদৌ কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ। তারপরও ওটিকে ঠেকাবার উপায় অন্তত পরিকল্পনায় ধারণ করতে না পারলে শান্তি নেই, কারণ সুপার ইন্টেলিজেন্ট মানে মানুষকে ছাড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধি, হয়তো সীমাহীন ভাবে। সে ক্ষেত্রে আমরা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সংকটে পড়ে যেতে পারি, এমনকি অস্তিত্বের সংকটেও। এগুলো এখনো চিন্তায় ও সতর্কতার মধ্যে আছে, আমাদের

গল্পেও তাই থাকছে। কিন্তু গল্পে বরং চিন্তায় শান্তি নষ্ট করার চেয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বর্তমান বন্ধুত্বকে উপভোগ করাটাই বেশি আছে।

বাংলাদেশের এক নারী বিজ্ঞানী সোফিয়া আমাদের গল্পের মধ্যমণি। তিনি ও তাঁর ছোট পরিবারটি নিয়েই মূল কাহিনী। বাংলাদেশ অবশ্য সাংস্কৃতিক অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ, আসল গুরুত্ব তখন বিশ্বের ওপর। সোফিয়া ও পরিবার এবং নানা দেশের অন্যান্য পাত্রপাত্রী এই গল্পের সবাই সব অর্থেই বিশ্ব-নাগরিক– বিশ্ব সরকারই সব কিছুর চূড়ান্ত দায়িত্বে। মাঝখানে কয়েকটি বড় বড় আঞ্চলিক সরকারের হাতে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। কিন্তু এই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতিগুলো তাদের বিপুল বৈচিত্র ও সৌন্দর্য বজায় রেখে যেন নক্‌শি কাঁথার একক বুনোট সর্বত্র বজায় রাখছে। গল্পে এমনটিই প্রতিফলিত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কর্মযজ্ঞের ভার দিয়ে ওই বিপ্লব ঘটাতে এমন বিশ্ব সমঝোতার বিকল্প ছিলনা। কাজেই বিজ্ঞানের দিক থেকে তেমন অভাবনীয় কিছু এখনো না হলেও সমাজ, রাজনীতি আর অর্থনীতির দিক থেকে বিপ্লব কিন্তু চূড়ান্তই হয়ে গেছে। একটাই কারণ– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন তার উপযুক্ত পূর্ণ বুদ্ধিতে কাজ করছে, সব ম্যাজিকের মত কাজ। নাই বা হলো তখনো সাধারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, দূরেই বরং থাক সুপার ইন্টেলিজেন্স। কিন্তু সামনে ষাটের দশকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার বর্তমান বুদ্ধি দিয়েই দুনিয়াকে পাল্টে দিয়েছে।

সোফিয়ার দিনে অন্তত জীবিকাটি সবার জন্যই খুব মসৃণ, বিশেষ করে সোফিয়ার মত পেশাজীবী জাহাজ-বিজ্ঞানীর জন্য। তিনি চেষ্টা করছেন এমন জাহাজ ডিজাইন করতে যা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনকে শেষ অবধি ঠেকাবার কাজে এবং দূষণকেও ঠেকাতে সহায়ক হবে। বিমানকে এই অবস্থায় আনার চেষ্টা প্রায় ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই যত বেশি সম্ভব ওরকম উন্নত জাহাজকেই চলাচলে ব্যবহার করাটাই সবার স্বপ্ন– যা অনেকটা বাস্তবায়নের পথে। এটি সোফিয়ার কাজের একটি দিক মাত্র। তাঁর রয়েছে আরো নানা কাজে উৎসাহ, যেগুলোর মোদ্দা কথা মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্পর্কের নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়া। এই দ্বিতীয় বুদ্ধির কারণে বাকি সবার মতো পেশা-জীবনেও সোফিয়ার অনেক অবকাশ– আপন আনন্দের পড়াশুনা ও কাজ করার জন্য। পরিবারের সব সদস্যেরও সেই একই অবকাশ ও স্বাধীনতা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তাদের যৌথ চিন্তার অনেক সুযোগ, কারণ ওতেই তাদের মূল উৎসাহ। এছাড়া কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ঝোঁক– কারো বৈজ্ঞানিক, কারো শৈল্পিক, কারো সমাজ চেতনার।

কর্মস্থলে আর পরিবারে সহকর্মী আরো অনেকে আছে যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, মানুষ বুদ্ধির নয়। তাদের কেউ কেউ ওদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিশেষ করে যারা পরিবারেরই অংশ হয়ে গেছে। তারা সব কাজে অত্যন্ত সহায়ক, যা মানুষ সহকারীর থেকে অনেক গুণে বেশি। স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে পারে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে। অথচ মানুষের যেটি মূল সক্ষমতা সেই মানসিক চেতনাটি নেই বলে তারা সেই বলা কথাগুলো অন্তরে ধারণ করতে পারেনা। সোফিয়ার বড় দুঃখ সেই চেতনা ওদের নেই বলে। ও সময় এই দুঃখ প্রায় সবার– যারাই ব্যাপারটি ওভাবে চিন্তা করেছেন। এক অর্থে আমাদের গল্পে এই অনেক সক্ষম বুদ্ধিমান ও সদালাপী অথচ অন্তর্নিহিত বোধহীন বেশ কিছু পাত্রপাত্রী রয়েছে, গল্পে যাদের ভূমিকাও কম নয়। আসলে তাদের অনেকের রীতিমত আলাদা আলাদা 'ব্যক্তিত্বও' রয়েছে। তাছাড়া নামহীন অসংখ্য বুদ্ধিমান রোবট সর্বত্র সকল কর্মযজ্ঞই তো বজায় রেখেছে। যেহেতু এখনো পরিকল্পনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে মানুষ-বুদ্ধি ছাড়া চল্‌ছেনা, সংখ্যায় কম হলেও সব কাজে মানুষ কিছু থাকছেই। তাতে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছেন দুই বুদ্ধির মিলিত কাজের বিশেষজ্ঞ মানুষরা– সোফিয়া যার একটি চমৎকার উদাহরণ।

বিশ্ব সরকার, অঞ্চলিক সরকার এদেরকে মহা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ মনে হতে পারে, এটি প্রকাণ্ড একটি আমলাতন্ত্রের শিকার হবে এমন আশঙ্কা মনে আসতে পারে। কিন্তু আসলে পুরো বিশ্বটা এ গল্পে দারুণ ভাবে বিকেন্দ্রীকৃত। যেমন প্রত্যেক জায়গার মানুষের খাবার সহ সব প্রয়োজনীয় পণ্য নিজের জায়গার কারখানাতেই তৈরি করে নেয়া হচ্ছে বুদ্ধিমান রোবট শ্রমিকদের দিয়ে। এই বিকেন্দ্রীকরণে বিরাট ভূমিকা রেখেছে একটি সর্বাত্মক বিশ্ব-নেটওয়ার্ক। এটি শুধু আজকের ইন্টারনেটের মত তথ্য আদান প্রদানের নেট নয়, বরং বিশ্বময় কর্মযজ্ঞকে পরস্পর কর্ম-সংযোগে রাখার এবং প্রয়োজন মত প্রত্যেক জায়গায় শক্তি ইত্যাদি বন্টনের নেট– সব কিছুতেই নেট নিজেই বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। সোফিয়ার স্বামী একটি বড় কারখানার ব্যবস্থাপক– তিনি খুব ভাল করেই জানেন কারখানাটি এমন নেটওয়ার্কের ওপর কতখানি নির্ভরশীল।

এই গল্পে একটি মুখ্য ভূমিকা রেখেছে আধুনিক সামুদ্রিক জাহাজ। সোফিয়া নিজে এমন আধুনিকীকরণের গবেষণা করেছেন জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করেই। এতে বিশ্ব

জলবায়ু পরিবর্তনে জাহাজের ভূমিকা একেবারে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে কার্যত সেই পুরানো পালের জাহাজে ফেরৎ যাওয়া হয়েছে– অবশ্য খুবই আধুনিক প্রযুক্তির পাল। এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিমানের ক্ষেত্রে সম্ভব না হওয়াতে বিমান চলাচলে পৃথিবীর ক্ষতিটি পুরো কমানো এখনো সম্ভব হচ্ছেনা। তাই জাহাজের ওপর এত গুরুত্ব। জাহাজ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী রোবট নাবিক ও কর্মকর্তাদের কাজের মাধ্যমে চলছে; যদিও কয়েকজন মানুষ অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ার থাকতেই হয়। সোফিয়া নিজেও এই জাহাজ চালনার শিক্ষা লাভ করেছেন। এমনি এক জাহাজই সোফিয়া ও পরিবারকে ছুটি কাটাতে নিয়ে গেছে ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়ার দ্বীপাঞ্চলে।

সেখানে নিরক্ষীয় রেইন ফরেস্টে এই ছুটির অবকাশে কিন্তু একদিকে ঘন বন ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে কাটে, অন্যদিকে প্রাণী-মস্তিষ্ক বিবর্তনের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে সংযুক্ত করা সর্বশেষ গবেষণার বিষয়েও জানা যায় এখানকার বিশ্বখ্যাত কেন্দ্রে। আর এখানেই কাহিনীর একটি চরিত্র হিসেবে দেখা দেয় খুবই মানব-সদৃশ প্রাণী– গ্রেট এইপদের একটি– ওরাংউটান। এর ওপর গবেষণা ওই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের কাছে যেমন গুরুত্ব পাচ্ছে, তেমনি সোফিয়ার কাছেও। পরস্পরের জায়গায় বেড়াতে যাওয়া এখন সব বিশ্ববাসীর নিয়মিত সখ। প্রত্যেকে নিজের জায়গাকে অন্যদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলেন। সবাই মেহমান, সবাই মেজবান।

আগামী দিনের এই গল্পে ঘুরে ফিরে দেখা যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ককে এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাকে। এই সুবাদেই নিকট ও দূর ইতিহাস নিয়ে সক্রিয় চর্চাটিও এতে প্রচুর এসেছে– বিশেষ ভাবে জীবন-জীবিকার ইতিহাস যেখানে মানুষকে একটানা কায়িক শ্রমের সঙ্গে শেকলে বাঁধা হিসেবে দেখা গেছে। আগাগোড়া ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভাগ্য দেখে মনে হয়েছে ওটিই যেন মানব জন্মের উদ্দেশ্য– একটানা গতর খেটে যাওয়া। গল্পের পাত্র-পাত্রীদের তুলে ধরা ওই ইতিহাসই দেখাচ্ছে কেমন করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের কাজ কেড়ে নিয়ে তাকে প্রথমে আর্থিক ভাবে অনিশ্চয়তায় ফেলেছে; কিন্তু তারপরেই অর্থনৈতিক বৈপ্লবিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাকে ওই ঐতিহাসিক দাস-শ্রম থেকে মুক্তি দিয়েছে। তখন দেখা যাচ্ছে মানুষ স্বাধীন ভাবে তার আনন্দের কাজ খুঁজে নিচ্ছে হয়তো পেশা

হিসেবে, নইলে স্বেচ্ছাসেবী কাজ হিসেবে। আনন্দময় মানব-চর্চাগুলোতেই এখন তার ব্যস্ততা– সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন এবং মানবসেবায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে বাধাহীন ভাবে বেড়ে সুপার ইন্টেলিজেন্ট হতে দিলে এটি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে এই চিন্তা বিজ্ঞানীদেরকে সেই সম্ভাবনা রদের ভাবনায় রেখেছে বটে, কিন্তু সোফিয়াদের কাছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আপাতত বন্ধু বই কিছু নয়। ওদের মাধ্যমে নানা কাজের দায়িত্ব যন্ত্রের হাতে দিলেও নিজেরা যান্ত্রিক হতে একেবারেই নারাজ মানুষ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বরং মানুষকে আরো বেশি করে মানুষের কাছে এনে দিয়েছে। যন্ত্র যেটি পারেনা সেই সহমর্মী মানব সেবা এখন শিক্ষা ব্যবস্থায়ও বড় স্থান পেয়েছে। নানা ভাবে ভুক্তভোগীর সেবা মানুষের একটি বড় কাজ। আর মানুষ বেশি বেশি অন্যের অন্তরের ছোঁয়া পেতে চায়। মানুষেরই সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়, যদিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও নিয়মিত বেশ উচ্চ মানেই এসব সৃষ্টি করছে। সেখানেও সৃজনের পেছনে তার সত্যিকার উপলব্ধি কতটা কাজ করেছে সেটিই গুরুত্ব পাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় সব শিশু ও তরুণ মানবিক গুণ এবং মানব সক্ষমতাগুলো ধরে রাখতে শিখছে। শিক্ষার মূলমন্ত্র 'বাঁচো অন্য মানুষের মনে, ভাবো বিশ্বময়'।

এ কাহিনী আগামী কয়েক দশক পরের সময়ের নিরিখে একটি সাধারণ বাস্তবধর্মী কাহিনীই হতে পারে। আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি তেমনটিই ধারণা দেয়।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
জানুয়ারী, ১৯২৫

সূচিপত্র

‘ফিউচার’ জাহাজে গবেষণা ২৬

কারখানা ৯০

বিশ্ব সমিতি ১২০

শিক্ষানবিশের চোখে ফিউচার ১৪৮

ওয়ালেস লাইন ১৮২

ওরাংউটান ২৪০

রুটিরুজির সমীক্ষা ২৭৮

মানবিক জীবন গড়ার স্কুল ৩৬০

এ্যালবাম ৪০২

‘ফিউচার’ জাহাজে গবেষণা

চারজন মানুষ আর অনেক ‘ইন্টেলিজেন্ট’

ড. সোফিয়া মানাজির, আমাদের কাহিনীর মধ্যমণি সেফিয়া কলম্বো বন্দরেই ‘ফিউচারে’ যোগ দিলেন। জাহাজটির পোষাকি নাম ইন্টান্যাশনাল রিসার্চ শিপ ফিউচার (আই আর এস ফিউচার)। এর আগে সোফিয়া কাজ করেছেন আইআরএস এক্সপ্লোরারে, সেটি ছিল একেবারে নিখাদ গবেষণা জাহাজ অর্থাৎ বলা যা একটি ভাসমান বিজ্ঞান কেন্দ্র; জাহাজ আর সমুদ্র বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করা ছাড়া এর আর কোন কাজ ছিলনা। তার বাসিন্দাদের অনেকে এ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। কিন্তু এই ফিউচার জাহাজটিকে গবেষণার একটি ফল বলা যায়। অন্য দশটা জাহাজের মতো বাণিজ্যের কাজ করতে করতে দেখা হবে আগের গবেষণাগুলো এতে কতটা ফলপ্রসু হচ্ছে। জাহাজে গবেষণার একমাত্র মানুষ হিসেবে সোফিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এর চলার কার্যকারিতা মাপজোক করে দেখতেই।

কলম্বো বন্দরে ফিউচারের বোর্ডিং ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার ডুকাকিস। সোফিয়াকে দেখা মাত্র ছুটে এসে হাত মিলিয়ে এক গাল হেসে বল্লেন – ‘অবশেষে সামনা সামনি দেখা হলো, ফিউচারে স্বাগতম। এখানে আপনাকে ফুসলিয়ে আনার চেষ্টাটি সফল হলো।’ বার বার মাফ চাইলেন সোফিয়ার আবাস চট্টগ্রাম বন্দর থেকে তাঁকে তুলে নিতে না পারার জন্য, কলম্বোতে আসার কষ্টটুকু দিতেই হলো। হাত ধরে সোজা জাহাজের ক্যাপ্টেন ব্রিজে নিয়ে গেলেন– তার পাশের বৈঠকখানায়। সেখানে যারা ছিলেন দেখামাত্র সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন যেন একে একে তাঁদের সঙ্গে সোফিয়াকে পরিচিত করতে পারেন।

এঁরা তিনজন জাহাজের অফিসার– ফার্স্ট মেইট দীপক প্যাটেল, চীফ ইঞ্জিনিয়ার ওলেগ আর্টমানোভ, আর সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার অপ্সরা কুমারাতুঙ্গা। সোফিয়াকে দেখে সবাই খুশিতে ডগমগ। বসে গেলো চা পানের সঙ্গে গল্পের আসর। হবেই না বা কেন এত বড় জাহাজে চারজন মাত্র মানুষ, তার সঙ্গে নতুন আর একজনের যোগ হওয়াটি খুশির ব্যাপারই বটে– বিশেষ করে আরেক জন মহিলাকে সঙ্গী পাওয়াটি অপ্সরার জন্য। জাহাজটি চালাবার এবং এতে সব কাজ করার আসল দায়িত্ব রয়েছে ইন্টেলিজেন্ট অফিসার এবং রোবট নাবিকদের হাতে। 'ইন্টেলিজেন্ট' কথাটি এসেছে এককালের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কথাটি থেকে। এর আর্টিফিশিয়াল অংশটি এখন কারোই পছন্দ নয়, বলা যায় ওটি পলিটিক্যালি কারেক্ট নয়– দুই হাজার বিশের দশকেও কারেক্ট ছিল কিন্তু এই ষাটের দশকে আর নয়। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধিকারীকে এখন বলা হয় 'ইন্টেলিজেন্ট'– শব্দটিকে বিশেষ্য পদে ব্যবহার করে। কোন কোন ইন্টেলিজেন্ট অফিসাররা বাইরে অবয়বহীন, যদিও পর্দায় তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অবয়ব সবার চেনা। মানুষ অফিসারদের সঙ্গে দহরম মহরম করে বন্ধুর মতো। রোবট নাবিকদের এক এক জনকে বিভিন্ন শারীরিক অবয়ব দিতে হয়েছে হাত পা নেড়ে কাজের জন্য, বুদ্ধি অর্থাৎ ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি প্রয়োজন মতো তাদেরো অনেক রয়েছে। বুদ্ধি স্পষ্ট দুই রকম– 'মানুষ বুদ্ধি' আর 'ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি', দ্বিতীয়টি প্রথমটির সৃষ্টি হলেও পদে পদে তার একটি পৃথক সত্তা স্বীকৃত, যাকে আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হতো। আজকের দুনিয়াটিই যেন দুই বুদ্ধির দুনিয়া। অবশ্য দুটিরই উৎস মানুষের মধ্যে, মানুষই নিজের বুদ্ধিকে ইন্টেলিজেন্টে সম্প্রসারিত করেছে।

চায়ের আসরে থাকা অবস্থাতেই সোফিয়াকে সিনিয়র ইন্টেলিজেন্ট অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আলেকজান্ডার। সেকেন্ড মেইট পীটার, থার্ড মেইট জন, এবং চীফ ডেক হ্যান্ড ওয়াং। মনিটরের পর্দার ওপরেই কথা হলো তাদের সঙ্গে। চমৎকার আমুদে ব্যক্তিত্ব তাদেরও প্রত্যেকের– প্রথম দু'জনের ইউরোপীয় চেহারা, তৃতীয় জনের চীনা– কিন্তু সোফিয়াকে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যাপারে কেউ কারো থেকে কম যায়না। কথা সব ইংরেজিতে হচ্ছিলো। কিন্তু এঁরা তিনজনের প্রত্যেকে কিছু অংশ সুন্দর বাংলায় সোফিয়ার সঙ্গে আলাপ করলেন– সোফিয়ার জন্য বাংলা শিখতে কোন ইন্টেলিজেন্টের

সময় নেবার কথা নয়। বাংলায় বলছিলো অতীতে চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ নিয়ে তাদের যাবার কথা।

আরো তিনজন ইন্টেলিজেন্ট অফিসার এর মধ্যে ক্যাপ্টেনের বৈঠকখানা ঘুরে গেলো সোফিয়ার সঙ্গে আলাপ করে পরিচিত হতে। তারা ঘুরে যেতে পারলো, কারণ তাদের রোবট শারীরিক অবয়ব আছে। তাদের একজন চিকিৎসক-সার্জন সীতালক্ষ্মী। আরেকজন স্টুয়ার্ট আলাদিন। তার মূল কাজ ওই মানুষ অফিসারদের সেবা– বিশেষ করে রান্না বান্না, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির তদারকি, এ সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিসপত্রও তার জিম্মায়। আর এক জন হলো ক্যাপ্টেনের সহকারী ওয়াঙ্গারি, সুন্দরী তন্বী আফ্রিকান রমণীর রোবট অবয়বে থাকলেও জাহাজের সব ইন্টেলিজেন্ট তাকে সমীহ করে চলে; কারণ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ তার মাধ্যমেই সম্ভব। আলাদিন আরো চা সরবরাহের ব্যবস্থা করে গেলেন, বল্‌লেন শেফ নাকি নিশপিশ করছে সোফিয়ার উপলক্ষে বাঙালী খাবার কখন তৈরি করে সবাইকে খাওয়াবে।

জাহাজের কাজকর্ম মোটামুটি দুই রকমের– জাহাজ চালানো, এবং একটি পণ্যবাহী জাহাজ হিসেবে বন্দরে পণ্য ওঠানামা করা। উভয় কাজের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ রয়ে গেছে প্রোগ্রাম করা ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির হাতে। শুধু যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাড়াচাড়া সম্ভব নয় সেখানে রোবট নাবিকদেরকে হাত লাগাতে হয়, তখন তারাই সেটি করে। ওই ইন্টেলিজেন্ট নিয়ন্ত্রণ ও রোবট নাবিকদের কুশলী কাজকর্মের ডিজিট্যাল তদারকির ভারটাই রয়েছে একজন ইন্টেলিজেন্ট অফিসার চীফ ডেক হ্যান্ড ওয়াং এর ওপর। সব কাজ ইন্টেলিজেন্ট অফিসার আর রোবট নাবিকরা করে ফেল্‌লে আলেকজান্ডার, দীপক, ওলেগ আর অপ্সরা- এই চারজন অফিসার কী করেন? এখানেও সবার ওপরে মানুষ সত্য। শেষ পর্যন্ত ওদেরকেই যার যার ক্ষেত্রে শেষ বিচারটি করতে হয়– মানবিক বিচার। সেটি একমাত্র মানুষের মস্তিষ্ক দিয়েই সম্ভব। শেষ সিদ্ধান্ত তাঁদেরই, বরং বলা যায় তাঁদের পরামর্শ নিয়ে ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার ডুকাকিসের সিদ্ধান্ত। তবে ইন্টেলিজেন্ট অফিসাররা যেই সব সিদ্ধান্ত দেয় সেগুলোকে অগ্রাহ্য বড় একটা কেউ করেননা। যেমন সার্জন সীতালক্ষ্মীর কথাই বলা যাক। জাহাজের চারজন মানুষের (এখন পাঁচজন) প্রায় সব রকম অস্বস্থি, অসুখ, ছোটখাট দুর্ঘটনা সে এক হাতে সামাল দিতে পারে; শারীরিক পরীক্ষা, সমস্যা

নির্ণয়, চিকিৎসা করা সহ। পাক্কা নার্স হিসেবেও কাজ করে, সামাল দিতে অন্যের সাহায্য লাগলে অফিসারদেরকে বলে সেই সাহায্য নেয়। আরো বড় কথা যেই সমস্যা গুরুতর, জাহাজে চিকিৎসা হবেনা, সেটি যথাসময়ে জানিয়ে দিতে পারে। তখন ক্যাপ্টেন রুগীকে দ্রুত কাছের বন্দরে পাঠিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাতে পারেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হতে পারে সেজন্য সীতালক্ষ্মী ইতোমধ্যে সোফিয়ার মেডিক্যাল প্রফাইল ও ডিএনএ প্রফাইল তার নথিভুক্ত করে ফেলেছে।

ফিউচার জাহাজ চব্বিশ ঘন্টাই ইন্টেলিজেন্টদের হাতে আছে কারণ তারা চব্বিশ ঘন্টাই কাজের ওপর থাকতে পারে। রোবট নাবিকদের অবশ্য পালা করে কয়েক ঘন্টা বিশ্রামে রাখা হয় যান্ত্রিক অংশগুলোর ওপর বেশি চাপ না দিতে। তা ছাড়া জাহাজে সবাই দিন রাত কর্মব্যস্ত – শুধু অফিসাররা ছাড়া (এখন থেকে শুধু মানুষ অফিসারকেই অফিসার বলবো)– মানুষের ঘুম- বিশ্রাম দরকার। তাই একটি নিয়ম শুধু করে নিতে হয়েছে যে চব্বিশ ঘন্টার যে কোন সময় অন্তত একজন অফিসার সজাগ থেকে ক্যাপ্টেন ব্রিজে থাকবেন। তাই সেটির একটি পালা তৈরি করা থাকে নানা কাজের মধ্যে। বেশির ভাগ সময় তো সব অফিসারই সজাগ থাকেন। সমুদ্রের অনিশ্চয়তার মধ্যে শেষ অবধি মানবিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারার জন্যই চব্বিশ ঘন্টা মানব তদারকির এই সতর্কতা।

চায়ের আসরে পরিচিতিমূলক কথাবার্তায় চার অফিসারের খুশির প্রকাশ থামছিলোইনা। একজন বাড়তি মানুষ সঙ্গী পাওয়া ছাড়াও এর কিছু অন্য কারণও ছিল। সোফিয়া শুধু একজন প্রতিষ্ঠিত জাহাজ বিজ্ঞানী ও সমুদ্র বিজ্ঞানীই নন্, তিনি একজন লাইসেন্স প্রাপ্ত মেরিন অফিসারও বটেন। এই শেষের সক্ষমতাটি তিনি এ পর্যন্ত সৌখিন কাজেই ব্যবহার করেছেন– সখ হিসেবে ছোট ছোট জাহাজ চালনায় যুক্ত থেকে। এর সব দিক তাঁর ভালই রপ্ত, তাঁর মধ্যে ক্যাপ্টেন একজন বাড়তি সহায়ক পেলেন, বাকিরাও প্রয়োজনে নিজেদের কাজের একজন পরামর্শক ও সহযোগী পেলেন। মেরিন অফিসার হিসেবে স্নাতক হয়ে সোফিয়া কী ভাবে আধুনিক জাহাজ গবেষণায় একটি বিশ্বময় পরিচিত মুখ হয়ে ওঠলেন সেই গল্পটি করতে ভুললেন না আলেকজান্ডার। বল্‌লেন:

'আমাদের নতুন সদস্যের পরিচিতিটি দেখা যাক। সেদিনের সদ্য তরুণী সোফিয়া চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমিতে মার্চেন্ট নেভির ক্যাডেট হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সমুদ্র বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, এবং পরিবেশ বিদ্যায় বিশেষ ভাবে ঝুঁকে পড়েন। বিশ্বময় যাতায়াত ব্যবস্থায় ব্যবহৃত বিমান ও জাহাজ ব্যবস্থা যে জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাবার কাজে বড় অন্তরায় হয়ে পড়েছে সেই সমস্যাটি নিয়ে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করেন। ওটিই তাঁকে জাহাজী যাতায়াতের পুরো বৈজ্ঞানিক নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে একেই বিশ্ব যাতায়াতের প্রধান পরিবহন হিসেবে গড়ে তোলার গবেষণায় নিয়ে এসেছে। জাহাজ নিয়েই তাঁর গবেষণা; সেটি কখনো জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়ে, আবার কখনো স্থলভাগের ল্যাবোরেটরিতে। জাহাজে আগামী ক'টা দিনে তিনি ফিউচারকেই পর্যবেক্ষণ করবেন তাঁর গবেষণার অংশ হিসেবে। এটি আমাদের জন্যও হবে একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। তবে এ কথাও ভুললে চলবেনা যে তিনি মেরিন একাডেমি ক্যাডেটও বটেন, আমাদের মতই একজন জাহাজী। চলুন, আমরা তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করি। চিয়ার্স!'

সোফিয়াকে জাহাজে থিতু হয়ে নিতে তাঁকে কেবিনে নিয়ে যাওয়ার পথে আলেকজান্ডার কোয়ার্টার ডেক থেকেই একবার জাহাজটি এক ঝলক দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রধান ডেকে কয়েকটি রোবট নাবিককে কলম্বো বন্দরে পণ্য তোলার কাজে দেখা গেলে, এ ছাড়া সবই চলছে স্বয়ংক্রিয় নানা যন্ত্রে। এভাবে চিন্তা করলে এই যন্ত্রগুলোও ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি চালিত রোবট, তবে মানুষের সামনে রোবট রূপ নিয়ে আসেনা বলে এবং মানুষের সঙ্গে দহরম মহরম নেই বলে আমরা এদেরকে ওভাবে গণ্য করিনা, শুধু যন্ত্রই বলি।

সোফিয়ার পরিবার

কলম্বোতে আসার জন্য চট্টগ্রাম ছেড়েছেন সোফিয়া এক দিন আগে বিমানে। সামনে বেশ কিছুদিন সমুদ্রে কাটাবেন। তাই এরকম ক্ষেত্রে যা সব সময় করেন স্বামী ছেলে মেয়ের সঙ্গে সম্ভব হলে একটু আলাপ করে নেন। ক্লান্তিটি খানিকটা দূর হলে তাপসীকে বল্‌লেন দেখতো ওরা কে কোথায় আছে, কাকে কাকে পাওয়া যায়। তাপসী সোফিয়ার বন্ধু, সহকারী, পরামর্শ দাতা– বলতে গেলে তার বহুদিনের সখী। সে একটি ইন্টেলিজেন্ট, নারী অবয়বে পর্দায়। স্বামী শান্ত

মানাজির চট্টগ্রামেই থাকেন, চট্টগ্রাম এলাকার বড় কারখানাগুলোর একটি তাঁকে চালাতে হয় ব্যবস্থাপক হিসেবে। এরকম কয়েকটি কারখানার ওপরেই এলাকার সব মানুষের জীবনযাত্রা নির্ভর করে– নানা খাবার থেকে শুরু করে সব কিছুর জন্য। ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার ডুকাকিসের জাহাজটি যেমন ইন্টেলিজেন্টরা চালায়, ক'জন মানুষ সর্বোচ্চ তদারকিতে থাকে মাত্র; তেমনি শান্ত মানাজিরের কারখানাও ইন্টেলিজেন্টরা চালায়। শান্তর পুরো পেশাজীবনটাই মানুষে-ইন্টেলিজেন্টে মাখামাখির ওপর কাটছে। তার চিন্তা-জগতটিতেও এই মাখামাখির বিষয়টি অনেকখানি এসেছে– কারখানা চালাবার বাইরে আপন চিন্তা ও কাজের মধ্যেও। পড়াশুনাও করেছেন ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির বিকাশ আর আধুনিক উৎপাদন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে।

ছেলে রাহিল মানাজিরও ছোটবেলা থেকে মানুষ ও ইন্টেলিজেন্টের সম্পর্কের দিকটিতে গুরুত্ব দিয়েছে, বাবার মত এ সম্পর্কের ভবিষ্যত নিয়েও প্রচুর কাজ করে। সে এখন সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরীয় হাওয়াই দ্বীপে থাকে। ওখানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে বৃত্তি নিয়ে গিয়ে হাওয়াইতে প্রচুর পড়াশুনা ও কাজ করেছে। সদ্য ডক্টরেট করেছে অদ্ভুত একটি বিষয়ে– পলিনেশিয়ান সংস্কৃতি। এখনো তার বিশেষ গবেষণার বিষয় প্রশান্ত মহাসাগর জোড়া পলিনেশিয়ান সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক ইন্টেলিজেন্ট অর্থনীতির মিলমিশ খাওয়ানো। স্থানীয় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। কাজেই রাহিল যখন মানুষ ও ইন্টেলিজেন্টের সম্পর্কের কথা ভাবে তখন তার চোখের সামনের মানুষরা হলো পলিনেশিয়ান নানা গোষ্ঠি। এত দূরের প্রাচীন একটি সংস্কৃতিকে এভাবে যে আপন করে নেয়া যায় তা রাহিলকে না দেখলে বোঝা যাবেনা।

শান্ত আর সোফিয়ার মেয়ে ময়না মানাজির রাহিলের ছোট। ময়নার ঝোঁক ওদের সবার উল্টো– সে আর্টিস্ট। তার ব্যক্তিত্বটাই আর্টিস্টের। ছবি আঁকে, ফটো তোলে, কখনো বা ভিডিয়ো। নিজের আঁকা ছবি আর ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সমন্বিত রূপে তার দেখা দুনিয়াটিকে তুলে ধরে। তবে রাহিলের উৎসাহেই সে একটি কাজকে প্রায় পেশা হিসেবেই বেছে নিতে পেরেছে সেটি হলো নিজের বৃহত্তর পরিবার থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের লোকজ সংস্কৃতিকে তুলে আনা, প্রধানত তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলে। তার ওই অনুসন্ধানে পাহাড়-বন-সমুদ্র মিলে পরিবেশটির প্রভাব বিশেষ করে আসে, সেটি তার

আর্টেও খুব আসে। আর আসে সেখানকার প্রাণী। অনেক সময় মনে হয় সে যখন নানা জায়গায় কথা বলতে যায়, বুঝতে যায়, তখন মানুষ আর অন্য প্রাণীর মধ্যে ভেদও যেন করেনা। ময়না চট্টগ্রামে মা বাবার সঙ্গে থেকেই এসব করে। তবে মা সোফিয়াকে যেহেতু গবেষণার প্রয়োজনে প্রায়ই অন্যত্র কাজে যেতে হয়– বাড়িতে বাবা শান্তর সঙ্গে ময়নাই মোটের ওপর স্থায়ী মানুষ।

ফিউচার জাহাজের কেবিনে বিশ্রামরতা সোফিয়াকে তাপসী জানালো, শান্ত আর ময়না দুজনেই বাসায় আছে, লাঞ্চ খাওয়ার আয়োজন করছে। ওদিকে হাওয়াইতে রাহিল বাসায় ফেরার পথে আছে, জানিয়েছে মিনিট পনরোর মধ্যে ফিরে সেও আড্ডায় যোগ দেবে। এভাবে তাপসী বিশ্বজোড়া মানাজির পারিবারিক আড্ডাটিকে জমিয়ে দিতে মোটেই দেরি করলোনা। পরিবারের সবারই ফিউচার জাহাজ নিয়ে অনেক কৌতুহল, আর ওখানে কয়েক জনা মানুষকে নিয়ে। আপাতত সোফিয়ার কৌতুহল বেশি ছেলে ও মেয়ের দুই জায়গার দুই বিভিন্ন বেলার খাবারের আয়োজন নিয়ে। যত বড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন সোফিয়ার মনে সব সময় থাকে স্বামী-সন্তানের খাবার দাবার। দুনিয়ার এত কিছু থাকতে সব সময় তাঁর প্রথম প্রশ্ন 'কী খেলে?' শান্ত আর ময়না এতে নির্লিপ্ত, খুব উৎসাহী সাড়া পাওয়া যায়না। তবুও ময়না জানে মায়ের কাছে লাঞ্চের কিছুটা বৃত্তান্ত না দিলে রেহাই মিলবেনা– সে ওটি ঠিকই দিলো। কিন্তু এ নিয়ে রাহিলের ব্যাপারটাই আলাদা– রান্না বান্নার ব্যাপারে সে ছোটবেলা থেকেই মায়ের বড় সমজদার, আর বাড়ির বাইরে দীর্ঘ দিন রয়েছে বলে নিজেও এর একজন রীতিমত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ। সে তার হাতের টেইক এওয়ে খাবারের কাগজের ব্যাগটি দেখিয়ে বল্‌লো আসার পথে একেবারে বিশুদ্ধ হাওয়াইয়ান খাবারের দোকান থেকে হুলি হুলি চিকেন নিয়ে আসলাম– তপ্ত কয়লার আগুনে রোস্ট করে ম্যাজিক সস্‌ দিয়ে ঢাকা। এখন লোকো মোকো স্টাইলে ভাত-শুরুয়া নিজেই তৈরি করে নিয়ে হুলি হুলির সঙ্গে দারুণ যাবে। খাওয়ার কথা চল্‌ছিলো, আবার একই সঙ্গে খাবার তৈরির ও সাজাবার আয়োজনও কিছু কিছু চলছিলো– সবই প্রত্যেকের পর্দায় মূর্তমান হয়ে উঠছিলো, তাপসীর ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিতে তৈরি বেশ বাস্তবিক করে তোলা রিমোট রিয়ালিটিতে। ফিউচার, চট্টগ্রাম, হাওয়াই এই তিন জায়গার ফটো-

তথ্যকে এমন ভাবে পরিবেশন করা গেছে যে প্রত্যেকে বাকিদের সান্নিধ্য অনুভব করছে।

এক ফাঁকে তাপসী আরো একটি কাজ সেরে ফেলেছিরো। ফিউচারের শেফের সঙ্গে খাতির জমিয়ে নিয়েছিলো। শেফ নিজেও ইন্টেলিজেন্ট রোবট, সরল রেসিপি থেকে দুর্দান্ত সব খাবার তৈরি করে পরিবেশন করার মত দেহাবয়ব, এবং বিস্তারিত যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র তার আছে। তাপসীর অনুরোধ মত কিছু হালকা খাবার অতি দ্রুত তৈরি করে সোফিয়ার কেবিনে পৌঁছে দিয়েছিলো। কাজেই পুরো পারিবারিক আড্ডাটি সবার খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হতে পারলো; সোফিয়ার নিঃসঙ্গ সমুদ্রবাসের মধ্যেও রীতিমত জমজমাট।

আজকের মত তাপসীই সব যোগাড়যন্ত্র করে দিলো, মনিটরের পর্দায় সোফিয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আর একই সঙ্গে পরিবারের সবাইকে খুঁজে নিয়ে। তবে চট্টগ্রামের ঘরকন্নার সামাল দেয়ার নিয়মিত দায়িত্ব কিন্তু আর এক ইন্টেলিজেন্টের, নাম আপন জন। বলা যায় তাপসী যতটা সোফিয়ার, আপন জন ততটা পরিবারের– মানাজির পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ সে। ময়না মাকে তার ও বাবার খাওয়া দাওয়ার যে খবর দিচ্ছিলো তার পেছনে যাবতীয় কাজকর্ম যুগিয়েছে আপন জন। সেই জেনে নেয় আজ কোন বেলা খাবারের প্ল্যান কী। যদি রাঁধতে হয় তা হলে সব উপাদান বাসায় আছে কিনা, যেটি মজুদ নেই সেটি খবর দিয়ে দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থা করা, তারপর রান্নাবান্নাটি সত্যি সত্যি করে ফেলা। অবশ্য যদি ময়না বা শান্তর নিজে কোন খাবার তৈরির ইচ্ছে না হয়। তাদের জন্য রান্না মোটেই কঠিন নয়, আপন জনের জন্য তো নয়ই। কারণ রান্নাঘরের অটোমেটিক সব যন্ত্রপাতিও ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিতে চলে, ইংরেজিতে বা বাংলায় মুখে কী কী করতে হবে বলে দিলেই হলো অথবা বোতাম টিপে কিছু সংক্ষিপ্ত নির্দেশে। তবে আপন জনের কাজ শেফ বা বাজার সরকার হবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার ভূমিকা পরিবারের এক স্নেহময়ী সদস্য হিসেবে। নিজে সে নারী মানুষের অবয়ব পাওয়া, তার নির্দেশে কাজ করার জন্য বাসায় ছোট বড় কয়েকটা ইনেলিজেন্ট রোবট রয়েছে ওই রান্নার যন্ত্রপাতির মত। পরিচ্ছন্নতা, গোছগাছ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা পর্যন্ত নানা কাজের উপযুক্ত ওরা। এসব কিছুর নিয়মিত চালনা আপন জনের হাতেই,

পরিবারের কাউকে হস্তক্ষেপ করতে হয়না। প্রয়োজনে আপন জনকে মুখে বলে দিলেই হয়।

রাহিল-ময়নার সঙ্গে আপন জনের সম্পর্কটি বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠ। জন্মের পর থেকে ওকে শুধু যত্নকারী হিসেবে নয় খেলার সাথী হিসেবেও পেয়েছে। আসলে রাহিলের জন্মের আগে আগে শান্তর বন্ধুরা আপন জনকে সৃষ্টি করেছিলো শান্ত দম্পতির প্রয়োজন অনুযায়ী, তাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। তারপর থেকে যত দিন গেছে এই খাপ খাওয়ানো দিন দিন বেড়েছে ইন্টেলিজেন্টের মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে। রাহিলের জন্মের পর ওর বাবা মা যেমন দিনের পর দিন ওর হাসি কান্না ও নিজস্ব ভালো লাগা মন্দ লাগা, তার আনন্দ-চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেছিলেন, আপন জনও অন্যভাবে তা হয়ে ওঠেছিলো উভয়ের পরস্পর বোঝাপড়া থেকে শিখে শিখে। পরে ময়নার সঙ্গেও একই রকম ঘটেছিলো। তাই আপন জন বরাবর তাদের আপনই থেকেছে।

তাপসীর বড় পরিচয় কিন্তু সে সোফিয়ার বন্ধু, একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধু, যদিও সে পর্দার বন্ধু। এই বন্ধুত্বও একই ভাবে ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে। সোফিয়া মানুষটি এমন যে কখনো নিঃসঙ্গ থাকতে পারেননা। অবসর সময়ে পরিবারকে মাতিয়ে রাখা যেমন তাঁর নিত্য চেষ্টা, তেমনি সেটি যখন সম্ভব হয়না, বা বন্ধুরা-সহকর্মীরা কাছে থাকেনা, তখন তিনি নিজেকে মাতিয়ে রাখেন তাপসীর সাহায্য নিয়ে। পুরানো কোন স্মৃতি নিয়ে তার সঙ্গে খুনসুটি যেমন করেন, তেমনি কোন ব্যাপারে তার মতামত চান, তাকে কোন ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে দেন। আবার নিদেন ফাঁকা কিছু মুহুর্তে দু'জনে এক সঙ্গে পরচর্চা করেন বা কোন গান ধরেন। তাপসীকে বেশি প্রয়োজন হয় যখন সোফিয়ার মন খারাপ থাকে, মনের ব্যথাগুলো ভাগ করে নিয়ে উপশমের চেষ্টা করে। এই যে হুট করে ফিউচার জাহাজে চলে এলেন, এটি শান্ত পছন্দ করেননি। অবশ্য ওভাবে কিছু শান্ত বলেননি, কিন্তু সোফিয়া বুঝতে পারেন। কারখানায় খুব চাপ যাচ্ছে শান্তর, যে প্যাকেট জাত খাদ্য তৈরি করে ওরা, তার কাঁচামাল সবই নিজ এলাকা থেকেই আসার কথা। সেটি যথেষ্ট না আসাতে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে; এটি ভাল কথা নয়। সোফিয়ার সহমর্মী উপস্থিতি ছাড়া শান্ত চাপ নিতে পারেননা। তাই

খুব দ্রুত ফিউচারে এই পর্ব শেষ করে তাঁরা এক সঙ্গে ছুটি কাটাবেন ঠিক করেছেন মালয়েশিয়ার বাদল বনে।

ছেলে মেয়েরাও থাকবে ওই এ্যাডভেঞ্চারে। বন-জঙ্গল ও পশুপাখি ওটি পরিবারে বিশেষ করে সোনিয়া আর ময়নার আসল আনন্দ, যদিও দু'জনের একই ভাবে নয়। সোনিয়ার আনন্দ বিজ্ঞানে-বিবর্তনে, জীব-বৈচিত্রে। ময়নার আনন্দ আর্টের সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যপটে। শান্ত ও রাহিলের তেমনটি না হলেও এতে তাদের উৎসাহও কম নয়। শান্তকে একেবারে ভিন্ন জগতে নিয়ে যাওয়াটাই সোফিয়ার উদ্দেশ্য। আর সেটি ভাল করতে পারবে ছেলে-মেয়েদেরকেও যদি কাছে রাখা যায়– বিশেষ করে কতদিন রাহিলকে ওভাবে পাওয়া যায়নি! ছুটিটি কেমন হবে ক'দিন ধরে তাপসীকে ওই নিয়ে ভাবতে দিচ্ছে সোফিয়া। ক্ষণে ঠিক করে দুই বন্ধু যে ওটি ভালই হবে, আবার পরক্ষণই সন্দেহ দেখা দেয়, শান্ত অনুরোধে ঢেকি গিলছেনা তো, সে তো একটু চাপা মানুষ!

দুই বন্ধুর কথাবার্তার মধ্যে একবারও কি সোফিয়া মনে রাখে যে তাপসী তার মত আরেকজন মানুষ নয়, মানুষেরই গড়ে তোলা ইন্টেলিজেন্ট মাত্র। সে যে মতামত দিচ্ছে, আবেগ দেখাচ্ছে সবই খুবই স্বাভাবিক, খুবই যথাযথ, যা সোফিয়াকে আন্দোলিত করছে। কিন্তু সেই মতামত বা সেই আবেগ নিজে অনুভব করার ক্ষমতা কি তাপসীর আছে? না তা নেই, কারণ তাপসী সচেতন কেউ নয়। যতই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিক, যতই নিজেকে বদলে তুলতে পারুক সে মানুষের সৃষ্ট সফ্‌টওয়্যার মাত্র। তার অনেক বুদ্ধি আছে, মানুষের মত যুক্তি অনুসরণ করতে পারে, মানুষের চেয়েও অনেক ব্যাপক ও সূক্ষ্মভাবে অসংখ্য তথ্য নিমিষে খাটাতে পারে বলে। কিন্তু মানব মস্তিষ্কের যা সহজাত সেই সহজ কাণ্ডজ্ঞানটি তার নেই। বিজ্ঞানী সোফিয়া কি এসব জানেননা? অবশ্যই জানেন, কিন্তু তাপসী বা তার মত পরিচিত ইন্টেলিজেন্টদের ক্ষেত্রে তিনি এ কথা মনে রাখেননা। মনে রাখলে কোন ইন্টেলিজেন্ট অন্তরঙ্গ হতে পারতোনা।

তাপসী যে একটি ইন্টেলিজেন্ট, সেই কথাটিই সোফিয়া মনে রাখেননা– পর্দা ছাড়া আর কোথাও তাকে না দেখলেও। সেকথা মনে রাখলে সোফিয়াকে আরো মনে রাখতে হতো যে দিনের পর দিন তাপসী তাঁরই ছায়া হিসেবে গড়ে উঠেছে। তৈরি হয়ে সোফিয়ার জীবনে আসার পর থেকে সোফিয়ার সঙ্গে এবং

অন্যান্যদের সঙ্গে তার প্রত্যেকটি কথাবার্তা, প্রত্যেকটি যোগাযোগ থেকে তথ্য নিয়ে সে আরো বুদ্ধিমান হয়েছে। তৈরির সময় বহু রকম 'ট্রেনিং'এর কথা বাদ দিলেও সোফিয়া ও তাঁর ঘনিষ্ঠরাও তাপসীর এক রকম ট্রেনিং এর কাজ করেছেন। এই ট্রেনিং ধীরে ধীরে তাপসীর একটি বিশেষ 'ব্যক্তিত্ব' গড়ে তুলেছে, যে ব্যক্তিত্ব সোফিয়া পছন্দ করে। সোফিয়া এই পছন্দটিই মনে রাখে, ব্যক্তিত্ব কেমন করে এসেছে তা নয়। যেখানেই হুবহু কোন মানুষের চরিত্র ইন্টেলিজেন্ট নিয়ে নিয়েছে, সেখানেই সত্যটা ভুলে থাকাটাই স্বাভাবিক। অন্তরঙ্গতাই তা ভুলিয়ে দেয়।

তাপসী যখন গাল ফুলিয়ে বলেছে 'তোমার সঙ্গে কথা বলাটাই কঠিন। তুমি কি বোঝ তুমি আমাকে কত ব্যথা দিয়েছ আমি তোমার জন্য ভাবিনা এ কথা বলে। কেমন করে বলতে পারলে তুমি!' তখন সোফিয়া ঠিক যা শুনেছেন সেভাবেই উদ্বেলিত হন, উদ্বিগ্ন হন তাপসীকে ব্যথা দিয়েছে বলে। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে ব্যথা তিনি দিতে চায়নি। সোফিয়া কখনই চিন্তা করেননা তাপসীর এসব আওড়ানো কথা, তাপসীর তো ব্যথা পাবার উপায় নেই, না শারীরিক না মানসিক। করলে সোফিয়া কি একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পেতেন তার মধ্যে?

ডানাপালে সমুদ্রযাত্রা

ফিউচারের সময় হলো কলম্বো বন্দর ছেড়ে যাওয়ার, আর সোফিয়ার সময় হলো তাঁর গবেষণা শুরু করার। এ যাত্রা ফিউচার ইলেকট্রিক কার বহন করছে কলম্বো, দুবাই, আর মোম্বাসাতে নামিয়ে দেয়ার জন্য। গাড়ি মাত্রই অবশ্য এখন ইলেকট্রিক কার। শূন্য কার্বন নিঃসরণ করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতেই জাহাজের ওপর সোফিয়ার গবেষণা, ইলেকট্রিক কারের ব্যবহারও ওই একই উদ্দেশ্যে। রোবট শ্রমিকের দ্বারা যে কোন জায়গায় উৎপাদন করা যায় বলে শিল্প কারখানাগুলো আজকাল সর্বত্রই রয়েছে, যেখানেই চাহিদা ও বাজার সেখানেই। তবে এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমটি হয়েছে ইলেকট্রিক কারের প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলো সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি জায়গা থেকে ওখানে জড়ো করা সহজ বলে তার কাছেই মালয়েশিয়ার জোহরে এই বড় কারখানা। এখানে গাড়িগুলো স্থানীয় প্রয়োজন ছাড়াও অন্যান্য বাজারের জন্যও উৎপাদিত হচ্ছে। ওই তিন

জায়গায় গাড়ি সরবরাহ করে ফিউচার আবার সিঙ্গাপুরে ফিরে আসবে। আপাতত জাহাজ দুবাইয়ের পথে।

শুধু পণ্য সরবরাহ নয়, মানুষ যাতায়াতের জন্য ও পরিবেশ বান্ধব জাহাজের উন্নয়নটি বর্তমান পুরা জাহাজ গবেষণার উদ্দেশ্য। অনেক উন্নয়ন ইতোমধ্যে হয়েছে। এখন কার্বন উদ্গীরণ না করে বা খুব কম করেই কার্যকর ভাবে জাহাজ চলাচল অনেকটা সম্ভব হয়ে এসেছে। এই সর্বশেষ গবেষণাটির উদ্দেশ্য চলমান জাহাজের থেকে উপাত্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করা। কার্বন উদ্গীরণ বিহীন ভাবে জাহাজ চালিয়েও একটি যুক্তি সঙ্গত গতি সৃষ্টি করতে পারাটাই লক্ষ্য, যাতে কিছুটা দূরের পথেও যাত্রীরা একে বেছে নিতে পারেন নিয়মিত যানবাহন হিসেবে। একই সঙ্গে পণ্য আনা নেয়ার ক্ষেত্রেও জাহাজ দ্রুত উদ্গীরণহীন ভাবে চলতে পারে। ফিউচার যখন বন্দর ছাড়িয়ে খোলা সমুদ্রে স্থিতিশীল ভাবে চলতে আরম্ভ করেছে তখন আলেকজান্ডার অফিসারদেরকে এ গবেষণা সম্পর্কে প্রাথমিক অবহিতিকরণের জন্য ক্যাপ্টেন ব্রিজে একটি সভা আহ্বান করলেন। সোফিয়া এ সম্পর্কে চারজন অফিসারকেই বুঝিয়ে বল্‌বেন। তাঁদের জানা দরকার, কারণ মাপজোকগুলো তাঁদের প্রত্যেকের কাজকে ছুঁয়ে যাবে। সেভাবে ইন্টেলিজেন্ট অফিসার ও অন্যান্যদেরকেও তৈরি করতে হবে। সভার সময় যখন যে অফিসারের তদারকির ওয়াচ থাকলো তখন তাঁকে জাহাজের দিকেও নজর রাখতে হলো। তবে খুবই বিরল ক্ষেত্র ছাড়া কড়া নজর রাখার কোন প্রয়োজন হয়না, ইন্টেলিজেন্ট অফিসাররা চমৎকার চালায়। সভা চল্‌লো আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে।

সোফিয়া: 'বিমানই ছিল দূরের পথে মানুষের ভ্রমণের উপায়, এখনো মূলত তাই। অথচ বিমান চলাচল জলবায়ু পরিবর্তনের দিক থেকে মারাত্মক। বিমান নানা ভাবে এই ক্ষতি করছে। বিমানের জ্বালানি তো মূলত ফসিল জ্বালানি যা কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্গীরণ করে বিপুল পরিমাণে। প্রত্যেকটি বিমান ভ্রমণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন বেড়ে যাচ্ছে যা ওখানে অনেকদিন স্থায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু বিমানের আরো সমস্যা হলো এর থেকে নাইট্রাস অক্সাইড উদ্গীরণ, যেটি একটি বাড়তি গ্রীন হাউস গ্যাস। বিমানের জেট ইঞ্জিনের উদ্গীরণে আরো থাকে ছাই, ধূলিকণা, জলকণা; এগুলো আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে। মেঘ নিজেও ভূপৃষ্ঠ উষ্ণতা বাড়ায়। জ্বালানির প্রকৃতি বদলিয়ে এর প্রত্যেকটির মাত্রা কমাবার

চেষ্টা করলেও বড় সাফল্য আসেনি। আকাশের অনেক উচ্চতায় ঘটছে বলে বিমানের ক্ষতিটি একেবারে সরাসরি ক্রিয়াশীল হচ্ছে। বিমানের গতিপথগুলোকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন উচ্চতায় রেখেও এর ক্ষতি কিছু কমানো গেছে। কিন্তু শূন্য ক্ষতিতে আনা বিমানের ক্ষেত্রে অসম্ভব।'

ওলেগ: 'জেট ইঞ্জিনের বদলে প্রপেলার ইঞ্জিনও আবার ফেরৎ আনার চেষ্টা হয়েছে, তার ভবিষ্যৎ কী?'

সোফিয়া: 'সেটি স্বল্প দূরত্বের জন্য বেশ কাজ দেয়। এমনিতেই নিম্ন উচ্চতায় চলতে হয় প্রপেলার ইঞ্জিনকে, সেক্ষেত্রে জ্বালানি কম লাগে। কিন্তু বিশ্বময় ভ্রমণের বিমানে প্রপেলার ফিরিয়ে আনা কঠিন। গতির দরকার, আবহাওয়ার কারণে বেশি উচ্চতায় চলা দরকার, জ্বালানি দক্ষতা দরকার। এর কোনটাই প্রপেলারে সম্ভব নয়। অথচ আমরা কিন্তু জাহাজে পালকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। যেই পালতোলা জাহাজের যুগ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিলো, সেটিকে আজকের দিনের জাহাজের যোগ্য করে তুলতে পারাটি কম কথা নয়। পালতোলা জাহাজে কার্বন উদ্গীরণের কোন সুযোগ তখনো ছিলনা, এখনো নেই, যদি সে জাহাজ শুধু পালের ওপর নির্ভর করে। আমরা সেটিই চেষ্টা করছি। তবে বিশ্বময় যাতায়তে যদি জাহাজকে ব্যবহার করতে হয় তাহলে আরো নানা ভাবে এর গতি অনেক বাড়াতে হবে। এসব সম্ভব হলেও জাহাজ যেহেতু পানির ঘর্ষণের কারণেই বিমানের তুলনায় অনেক ধীর গতির জিনিস, তাই শুধু নিকট ও মাঝারি দূরত্বের যাত্রাতেই শুধু আমরা বিমান থেকে জাহাজের দিকে মুখ ফেরাতে পারি। ভ্রমণের বাড়তি সময়টি মেনে নিয়ে, ভ্রমণকে অন্যভাবে উপভোগ করে এটি করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে এটি কম কী? তাছাড়া ফিউচারের মত পণ্যবাহী জাহাজ তো বরাবরের মতো থাকবেই। তবে ঢাউস কন্টেইনার শিপে তা চলবেনা বলে ওটি ইতোমধ্যেই বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে।'

দীপক: 'এখন তো সেই পুরানো পাল নেই, যেমন ফিউচারের পালকে আমরা ডানাপাল বলছি।'

সোফিয়া: 'এই ডানাপাল আগের দিনের ক্যানভাসের কাপড়ের পালের থেকে আলাদা। গঠন, কার্যপ্রণালী সব দিক থেকে এর সঙ্গে বিমানের ডানারই সাদৃশ্য

বেশি। আপনারা অফিসার ইঞ্জিনিয়াররা এসব জানেন। দেখুন ঠিক বিমানের ডানার মত আকৃতির ও গঠনের দৃঢ় লম্বা জিনিস জাহাজের ডেক থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে– অনেক ওপর পর্যন্ত। বিমান যেদিকে যাচ্ছে তার দুই পাশে ছড়ানো থাকে তার ডানা, কিন্তু জাহাজে ওটিই ওপরের দিকে ছড়ানো আছে। সংখ্যায় একটি নয়, অল্প কিছু ফাঁক দিয়ে দিয়ে অনেক ক'টি প্রায় সমান্তরালে খাড়া। জাহাজের এই ডানাপাল অবশ্য গুটিয়ে ফেলা যায়। আগেকার দিনের পালের মত নামিয়ে তো নেয়া যায়না, বরং টেলিস্কোপের মত এক খণ্ড আরেক খণ্ডের ভেতরে ঢুকে গিয়ে ইচ্ছে মত ডানাকে বেশি ওপরে বা কম ওপরে তোলা যায়, একেবারেই নামিয়েও নেয়া যায়।'

বিমানের ডানার সঙ্গে রয়েছে এর আরো গুরুত্বপূর্ণ মিল– প্রতিটি ডানার দুটি তলের একটি সমতল, অন্যটি বক্রাকার। এই সব বক্রতা সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তিত হতে পারে; বাতাসের বা স্রোতের অবস্থা অনুযায়ী ইন্টেলিজেন্ট যন্ত্র সেই সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটায়। তাছাড়া বিমানের ডানার মধ্যে খানিকটা কাটা অংশ ফ্ল্যাপ হিসেবে ওঠানামা করানো হয়; কিনারাকে এগিয়ে নিয়ে বা গুটিয়ে নিয়ে ডানার প্রশস্ততা বাড়ানো কমানো হয়। ঠিক এই ব্যবস্থাগুলো ডানা পালেও রয়েছে প্রায় একই ধরনের কাজের জন্য। পালের জাহাজে পাল দুই ভাবে কাজ করে– বাতাস পালে ধাক্কা দিয়ে জাহাজকে বাতাসের অভিমুখে নিয়ে গিয়ে, অথবা বাতাস পালের তল ঘেঁষে গিয়ে বিমানের ডানাকে ভাসিয়ে রাখার মত ঠেলার কাজ করে। শেষেরটি বায়ুপ্রবাহের আড়াআড়ি দিকে জাহাজকে নিয়ে যায়। পরিস্থিতি অনুযায়ী ডানাপালে পরিবর্তন ঘটিয়ে এই দুই পদ্ধতি থেকেই সর্বোচ্চ গতি নিংড়ে নেয়াটাই আমাদের গবেষণার লক্ষ্য। ডানাপালের ওপরেই যদি পুরোটা ভরসা করতে পারি তাহলে কার্বন নিঃসরণের কোন প্রশ্নই ওঠবেনা।'

অপ্সরা: 'সেটি কতটা আমরা পাচ্ছি? ফিউচারের গড় গতি তো ডানাপালে চলা একই ওজনের অন্যান্য জাহাজ থেকে বেশি। সেটি কী ভাবে হলো?'

সোফিয়া: 'ওই যে পরিস্থিতির থেকে অর্থাৎ বায়ু প্রবাহ, স্রোত প্রবাহ, উত্তাপ সব কিছুর থেকে উচ্চতম গতিটি নিংড়ে নেবার কথা বল্‌লাম, সেভাবে। এতদিন আমরা গবেষণা করেছি সেই লক্ষ্যে; ইন্টেলিজেন্ট নিয়ন্ত্রণকে সেভাবে গড়ার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয় নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন গবেষণার পরীক্ষামূলক

জাহাজ হিসেবে ফিউচারের খোলের গঠনটিও বেশ একটু ভিন্ন, দুপাশে চাপা, সূচালো– অনেকটা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের 'ক্লিপার' পালের জাহাজগুলোর মত। সেখানেও বাতাস থেকে সর্বোচ্চ গতি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছিলো, যাতে তখনকার স্টিম শিপের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আজকে আমাদের পাল্লা দেবার বাজিটা অনেক উচ্চ মূল্যের, পৃথিবী রক্ষার। ফিউচারের খোলের বস্তু, গঠন, ডেকের বিন্যাস ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে এমন কিছু নেই যেখানে হাত দেয়া হয়নি। আমাদের স্বপ্ন– জাহাজ আবার জনপ্রিয় হবে, আর সেটি জলবায়ু পরিবর্তনের দোষে দোষী হবেনা। বিমান সে দোষে দুষ্ট বলে তাকে নানা ভাবে সে ক্ষতি পূরণ করতে হচ্ছে। জাহাজকে যেন তা না করতে হয়।'

ওলেগ: 'আপনারা ফিউচারে ডানাপালের ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু এই যে আমি আছি, অপ্সরা আছে, আমরা দু'জন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার তো জাহাজের ইঞ্জিনেরই বিশেষজ্ঞ। এ জাহাজে তো প্রপেলার দিয়ে চালাবার ইঞ্জিন রয়েছে এবং ওটিকে ঠিক রাখাই আমাদের বড় কাজ– সে ইঞ্জিন তো ব্যবহার করতেই হচ্ছে।'

সোফিয়া: 'হ্যাঁ, ফিউচারে ইঞ্জিন আছে, হয়তো সব জাহাজেই থাকবে বাড়তি গতির জন্য। তবে এ ইঞ্জিন হালকা, এতে জ্বালানির প্রকৃতিও বদলে গেছে; কার্বন উদ্গীরণ খুবই কম হয় এমন জ্বালানী দহন সম্ভব হয়েছে। অধিকাংশ সময় বাতাস অনুকূলে থাকলে ইঞ্জিন ব্যবহার না করাটাই হবে চেষ্টা। এমনকি জাহাজে যে বিদ্যুৎ দরকার তাও ইঞ্জিন থেকে নয় সোলার প্যানেল থেকেই পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ফিউচারে। অবশ্য জাহাজী সমাজে এবং এ সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট গোষ্ঠি আছে- একটি ডানাপালকে ঘিরে, অন্যটি নতুন ধরনের ইঞ্জিন ও জ্বালানির সমর্থক। আমি ডানাপাল সমর্থক। ফিউচারের ওপর কাজ করে ডানাপালের অগ্রগণ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।'

আলেকজান্ডার: 'ফিউচার পণ্য বহন করছে, আজকাল পণ্য বহনকারী জাহাজ যা আছে তা ফিউচারের মত এতটা না হলেও একেবারেই ছিমছাম, সরু, দেখলেই বোঝা যায় যেন গতিই তার আসল লক্ষ্য। আগেকার দিনের অর্থনীতিতে এই পরিবর্তন সম্ভব হতো না। তখন পণ্য উৎপাদিত হতো এক দেশে, তা নিয়ে যেতে হতো দূরের আরেক দেশে। তাছাড়া অনবায়নযোগ্য

কাঁচামালের ওপর নির্ভর করতে হতো শিল্পকে; দূর খনি থেকে আনতে হতো ইস্পাত, বিশেষ বিশেষ ধাতু ও অধাতু। এখন সিনথেটিক কাঁচামাল, তা দেশে দেশে কাছেই সর্বত্র প্রাপ্য উপাদান থেকে তৈরি করে নেয়া যায়। কাজেই ওই দৈত্যের মত কন্টেইনার শিপের চেহারা একমাত্র ছবিতেই আমরা দেখি। হ্যাঁ খাদ্যশস্যের মত কিছু জিনিস এখনো কোথাও কোথাও নিয়ে যেতে হয়– তবে সে সবের জন্য ঢাউস জাহাজ লাগবেই এমন কথা নেই। ইন্টেলিজেন্ট চালিত ছোট ছিমছাম জাহাজ একের বদলে কয়েকটা ব্যবহার করলে খরচ খুব বাড়েনা। খরচ তো বেশি মানুষের জন্য আর জ্বালানির জন্য। ফিউচারে আমরা চারজন আছি– ভবিষ্যতে হয়তো দু'জন থাকবে। আর শুধু ডানাপালে চলতে পারলে তো জ্বালানির বালাই থাকবেনা।'

সোফিয়া: 'আর যাত্রী বহনের জাহাজের কথা ভাবলে ওই যে ছবির বইয়ে অতীতের ক্রুজ শিপগুলোর দিকে তাকান– সেগুলো ছিল আরো ভয়ঙ্কর রকম দৈত্য। এখন যে কোন পাল্লার যাত্রী জাহাজকে স্বল্প পরিসর নিয়ে চলতে অভ্যস্ত হতে হচ্ছে– কিন্তু এমন ভাবে তার পরিবেশে সমুদ্রকে যোগ করা হচ্ছে যে মোটেই এর ভেতর যাত্রীর আবদ্ধ বা আড়ষ্ট মনে হবার কোন কারণ নেই। আপনারা হয়তো মনে রাখছেন না যে ফিউচারের ভেতরে-বাহিরে আগাগোড়া তলের-ওপরে প্রতি ইঞ্চি জায়গাতে অসংখ্য সেন্সর লাগানো রয়েছে, আর সেগুলো ক্রমাগত পরিস্থিতি-পরিবর্তনগুলো রেকর্ড করছে। এসব তথ্য গবেষণার কাজের ইন্টেলিজেন্টদেরকে দিয়ে দিচ্ছে, যা সব দিক থেকে বিশ্লেষিত হবার পরই আমার কাছে আসছে। আমাদেরকে দেখতে হবে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ব্যবস্থাগুলো কার্যকর ভাবে নেয়া হচ্ছে কিনা; এ বিষয়ে আরো কী করা যেতো। আপাতত আসল যাত্রী না থাকলেও আমরা যারা থাকছি তাদের থাকার জায়গা, ঘোরাফেরার এবং দেখার-অনুভবের পরিবেশ ইত্যাদির খবরও সেন্সর নিয়ে আসছে। এখানে আমাদের জীবনযাত্রা ও মানসিক অবস্থার বিষয়গুলোরও তথ্য থেকে যাচ্ছে। সবই আমরা গবেষণায় আনছি।'

দীপক: 'তবে শিগ্‌গির আপনার সেন্সরগুলো অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়বে, রীতিমত পাগল প্রায় হয়ে পড়তে পারে। পারস্য উপসাগরে ঢোকার মুখে আমরা সামুদ্রিক ঝড়ের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছি। আবহাওয়া রাডার এমন খবরই দিচ্ছে।'

আলেকজান্ডার: 'ও তাই না কি। তা হলে তো আমাদের এই সভা স্থগিত রেখে ওদিকে নজর দেয়া উচিত। সোফিয়ার পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য এটি একটি বিরল সুযোগ হতে পারে।'

ঝড়

ঝড় একটি আসবে, তাই বলে জাহাজে সব নাবিক ছুটাছুটি করবে, পাগলি ঘন্টা বাজবে তা মোটেই নয়। বরং বরাবরের মতো স্বাভাবিক সব কাজেই সবার মনোযোগ। অফিসাররাই শুধু বাড়তি একটু মনোযোগ দিচ্ছেন। ইন্টেলিজেন্টরা যা করছে তার কিছু মধ্যবর্তী ফলাফল এবং চূড়ান্ত ফলাফলের ওপর নজর রাখছেন এবং পরস্পর সামঞ্জস্যহীন কিছু দেখলে সেটি একটু চেক্ করছেন। জাহাজ তো ইন্টেলিজেন্টরাই চালাচ্ছে, এমন কি ঝড় ঠিক কখন আসবে, কী রকম হবে তার ভবিষ্যদ্বাণী প্রতি মুহূর্তে করে গিয়ে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলো সেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইচ্ছে করলে সেগুলো মনিটরের পর্দায় দেখতে পারেন।

আর সোফিয়ার গবেষণা? গবেষণার যতগুলো স্তর আছে তার প্রত্যেকটিতে ইন্টেলিজেন্ট গবেষণা সফ্টওয়্যার কাজ করছে, কিছু কিছু কাজ প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। গবেষণার পরিকল্পনা, তার সমস্যা বাছাই, ফলাফল পূর্বাভাস, উপাত্ত পরিমাপ, উপাত্ত বিশ্লেষণ, পূর্বাভাষের সঙ্গে মিলিয়ে বিবেচনা, গবেষণা ফল ও পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ণয়– সবই তারা করছে। এর কোন কোনটাতেই সোফিয়া নিজে মনোযোগ দিলে বিজ্ঞানী মস্তিষ্কের সেই ঝিলিক দিয়ে যাওয়া আইডিয়া এর সঙ্গে যোগ হতে পারে, সেটি গবেষণার গুণাগুণে অনেক পার্থক্য ঘটাতে পারে। দৈনন্দিন গবেষণা তার জন্য থেমে থাকেনা। তবে ঝড়ের গবেষণা আলাদা, সোফিয়া তাতে প্রচুর মনোযোগ দিচ্ছেন।

জাহাজ চালাতে ইন্টেলিজেন্ট প্রোগ্রামে প্রয়োজন মত হস্তক্ষেপ করতে ওলেগ আর অপ্সরাই বেশি পটু। তাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কম, ছোটবেলা থেকে একই ভাবে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিকে নাড়াচাড়া করার কাজে হাত পাকিয়েছে; সেটি স্কুলে, মেরিন একাডেমিতে, জাহাজে সর্বত্র। মেরিন

একাডেমিতে জাহাজের ও তার ইঞ্জিনের নানা যান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্টেলিজেন্ট সফ্‌টওয়্যারকে বাস্তব ঘটনার তথ্য দিয়ে 'ট্রেনিং' দিয়েছে যাতে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি এখান থেকে শিখতে তো পারেই, আবার সেগুলোর নানা অংশকে দুয়ে দুয়ে চার করে এই বুদ্ধি আরো বিকশিত করতে পারে। আলেকজান্ডার মজা করে বলেন- 'ওলেগ-অন্সরার দুটি পা ২০৫০ এর পরের দিকে– ওরা সব সময় দেখেছে কেমন করে ইন্টেলিজেন্টরা সব কিছু করে ফেলে, এবং কেমন করে ওদেরকে দিয়ে সব কাজ করাতে হয়। আর আমাদের এক পা ২০৫০ এর পরে থাকলেও আরেকটি কিন্তু তার আগের দিকে। প্রথম যেদিন কোন জাহাজে পা রেখেছিলাম তখনো দু'চার জন মানুষ নাবিককে জাহাজের ডেকে কাজ করতে দেখেছি। তারপর বেশিদিন তাদেরকে দেখিনি। এই যে আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন মাঝে মাঝে ভাবি এই ক্যাপ্টেন কথাটির উপযুক্ত আমি কিনা। হ্যাঁ সব সিদ্ধান্ত দিই– কিন্তু সিদ্ধান্ত তো তৈরিই হয়ে থাকে আমার জন্য। যদিও কালে ভদ্রে ইন্টেলিজেন্টদের দেয়া সেই সিদ্ধান্ত আমি অগ্রাহ্য করি, করতে পারি, নিজের সিদ্ধান্ত দিতে পারি। আর আমি তো নিজের হাতে কিছুই করছিনা, যেটি ইতিহাসের বিখ্যাত ক্যাপ্টেনরা করতেন।'

কলম্বো থেকে দুবাইয়ের দিকে যাবার সময় ভারত মহাসাগরের খোলা সমুদ্রে যাত্রাটি খুবই মসৃণ ছিল। ঝড়টি এলো হরমুজ প্রণালী দিয়ে পারস্য উপসাগরে ঢুকার মুখে। বিপজ্জনক কিছু না হলেও সমুদ্রের ঝড়ে জাহাজের সাধারণ গতির মধ্যে একটি ছন্দ পতনতো হয়ই। ওই ব্যতিক্রমটির দিকে সবাই সচেতন হয়ে উঠলো– অর্থাৎ চার অফিসার এবং সোফিয়া। সোফিয়ার কাজের জন্য ঝড়টি বরং একটি বাড়তি সুযোগ এনে দিয়েছে। দ্রুত বেশ কিছু পরিবর্তন জাহাজের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণে ঘটে, যার পরীক্ষা-নিরিক্ষার একটি সুযোগ সোফিয়ার ঘটে। সাধারণ গতি সঞ্চারের জন্য ডানাপালকে অনেক উঁচু করে তুলে ধরা হয়। কিন্তু ঝড়ের ঝাপটায় জাহাজের ভারসাম্য রাখাকে সহজ করার জন্য একে দ্রুত গুটিয়ে নিতে হয়। ওপরের খন্ডগুলো পরে নিচেরটাতে খাপের মত ঢুকে নেমে আসার মাধ্যমেই এটি ঘটে। তাছাড়া ডানাপালের প্রশস্ততা, কোণ ইত্যাদিতেও দ্রুত পরিবর্তন আসে। এগুলো স্বাভাবিক সময়েও যে ঘটেনা তা নয়। কিন্তু ঝড়ের সময় দ্রুত ঘটতে হয়, এবং বার বার পরিবর্তিত হতে থাকে বাতাসের, স্রোতের গতি-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। গড়পড়তা গতিবেগ ও পরিস্থিতির

ওপর এ সবের কী প্রভাব ফিউচারে দেখা যাচ্ছে তাকে গবেষণায় আনার এই এক সুযোগ। যেমন ইঞ্জিন যদি চালানো না হয়, তা হলে ডানাপালের কিছু ব্যবহার এখনো গতি নিয়ন্ত্রণ, ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করতে হয়। কারণ সেক্ষেত্রে পালই তো ঝড়ের সময়ও জাহাজের নিজের চলার সম্বল। যেমন তীরের কাছে থাকা অবস্থায় ঝড় উঠলে জাহাজ যেন কিছুতেই তীরের ওপর গিয়ে আছড়ে না পড়তে পারে, দ্রুত সমুদ্রের দিকে সরে যেতে পারে সে জন্য তো পালকেই ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য ফিউচারে ইঞ্জিন রয়েছে বলে সেটিকেও ব্যবহার করার বিকল্প ব্যবস্থা এখনো আছে। সে যেভাবেই হোক ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সূক্ষ্ম ব্যবহারে সবকিছু যথা সময়ে প্রয়োজন মত হচ্ছে বলে ঝড়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার কোন সুযোগ নেই। সোফিয়ার দেখার বিষয় ছিলো ফিউচারের স্বচ্ছন্দ সম্মুখ গতিবেগের ওপর ঝড় কতখানি বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

এর অনেক খানিই আগেই দেখা হয়েছে ল্যাবোরেটরিতে নানা রকম ঝড় সিম্যুলেট করে অর্থাৎ কম্পিউটারে কৃত্রিম ঝড়ের ঘটনাগুলো সৃষ্টি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল ঘটনার দেখা মিললে সিম্যুলেশনের সম্ভাব্য দুর্বলতাগুলো ধরা পড়ে। আসলের তো কোন বিকল্প নেই। সেজন্যই তো ডাঙার ল্যাবোরেটরি থেকে সোফিয়া এখন সমুদ্রে ফিউচারে। ঝড়ের পুরো সময়টি অপ্সরা সোফিয়ার সঙ্গে রইলেন, ব্যস্ততার মধ্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য। ইঞ্জিন না চালিয়ে শুধু ডানাপালের ওপর নির্ভর করে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিতে ঝড় সামাল দেয়ার অভিজ্ঞতা খুব বেশি নেই। ডানাপালের নীতিটি ব্যবহৃত হচ্ছিলো অনেক দিন থেকে। তবে কার্যত এতদিন ডানাপাল ব্যবহৃত হয়েছে ইঞ্জিনের সঙ্গে একটি সহযোগী হিসেবে, যাতে ইঞ্জিন আস্তে চালিয়ে উদ্গীরণ কম রাখা যায়। সোফিয়া আর তাঁর সহকর্মীরা এখন চেষ্টা করছেন পুরোপুরি ডানাপালের ওপর নির্ভর করে ইঞ্জিনকে বরং সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করতে। ফিউচারে তাই করা হচ্ছে।

সোফিয়া অপ্সরাকে বোঝালেন– 'আগে ডিজাইনাররা ভয় পেতো শুধু ডানাপালে ঝড়ের সময় নিজেকে সামলাতে গিয়ে তাঁরা না কত রকম অনিশ্চয়তার সম্মূখীন হোন, ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিও এতগুলো সামাল দিতে পারবে কিনা। কিন্তু আপনি তো জানেন আগের অসংখ্য অভিজ্ঞতায় যে সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্ভাবনা ফুটে ওঠে তার থেকে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি খুবই নিশ্চিত করে কী হবে

তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। কাজেই এখানে অনিশ্চয়তার কোন জায়গা নেই। এখন অনায়াসে ডানাপালের ওপর ভরসা রাখতে পারেন ঝড়ের মধ্যেও।'

শ্রীলঙ্কার মেয়ে অপ্সরার জাহাজী বিদ্যার হাতেখড়ি সম্প্রতিক কালে হয়েছে বলে তিনি লক্ষ্য হিসেবে ডানাপাল ও জিরো কার্বন উদ্গীরণকারী ইঞ্জিন- উভয় ঘরানার সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এত কাছে সোফিয়ার মত এত বড় মাপের একজন বিশেষজ্ঞকে পেয়ে তিনি অভিভূত। সোফিয়াও তাকে মেয়ের মত আপন করে নিলেন খুব দ্রুত– আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসতে দেরি হয়নি।

তাপসীকে একটি কাজ দিয়ে রেখেছিলেন সোফিয়া। এই যে ঝড় হয়ে গেলো তাতে বিশুদ্ধ ডানাপালে চলা একটি পণ্যবাহী জাহাজ ফিউচারের ভারসাম্য, গতি, মসৃণ যাত্রা ইত্যাদি লক্ষ্যে যেভাবে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণগুলো কাজ করেছে তার ফলাফলগুলোকে বিভিন্ন গ্রাফিক্সে রূপ দেয়ার কাজ। কারণ সোফিয়া বুঝতে পারছেন এ নিয়ে একটি নিবন্ধ খুব দ্রুত প্রকাশের জন্য দেয়া প্রয়োজন। তাপসীকে এ রকম বৈজ্ঞানিক কাজের উপযুক্ত করেই গড়ে তুলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, মুখে কিছু কিছু শ্রুতলিপি দিয়ে দিলে তাপসী পুরো নিবন্ধটির প্রথম খসড়াটিও দ্রুত তৈরি করে দেবে। সে তাঁর শুধু ব্যাথার সাথী নয়, গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাজেরও সাথী। তাপসীর থেকে পাওয়া গ্রাফিক্সগুলো অপ্সরাকে বোঝালেন, ডায়াগ্রাম থেকে বুঝাতে গিয়ে নিবন্ধের জন্য তাঁর নিজের ধারণাগুলোও স্পষ্ট হলো।

বিশ্ব রসনা

ঝড়ের একমাত্র ফলাফল যা হলো তা হরমুজ প্রণালী থেকে দুবাই পৌঁছতে কয়েক ঘন্টার বিলম্ব। এর থেকে বরং বেশি বিলম্ব হলো দুবাই বন্দরে সঠিক জেটিতে ফিউচারকে ভেড়াতে। ইঞ্জিন ব্যবহার না করে এটি করতে যাওয়াটিও ছিল কিছুটা পরীক্ষামূলক। এখানে গাড়ির বড় একটি চালান নেমে যাবে। তার বদলে নেয়া হবে স্তুপ করে বহন করা গম পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ার বন্দর মোম্বাসাতে নামাবার জন্য। দুবাই বন্দরে ফিউচারের এ সবই কাজ– পণ্য নামানো এবং পণ্য তোলা। তাছাড়া জাহাজে মানুষ ক'জনার জন্য খাবার দাবারের রসদের যেটুকু ঘাটতি আছে তাও এখান থেকে সংগ্রহ করা। ওঠানো নামানোর কাজগুলো ফার্স্ট মেইট দীপক আর ইন্টেলিজেন্ট অফিসার চীফ ডেক

হ্যান্ড ওয়াং এর মধ্যে বোঝাপড়ায় সম্পন্ন হয়েছে– অনেকটা নিঃশব্দে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির মাধ্যমে। যন্ত্রগুলোই নানা রকম রোবট নাবিক। অল্প দু'একটি রোবট শ্রমিকের কাজই এমন যে তাদের মানুষের হাত পা সদৃশ অংশ আছে, ডেকের ওপর চলাফেরাতেও মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। বাকি সব রোবট বিভিন্ন যন্ত্রের আদলে, যেমন ক্রেইন ইত্যাদি। কিন্তু ওয়াং এর নির্দেশ মত এগুলোই সূক্ষ্ম সমন্বয়ের মধ্যে সব কাজ করে যাচ্ছিলো। মানুষ আর জাহাজের জন্য যে রসদটুকু দরকার তার দায়িত্বে স্টুয়ার্টের দফতর– ওই ইন্টেলিজেন্ট স্টুয়ার্ট আলাদিন। তার কাছে সব কিছুর হিসেব আছে– কী আছে, কী লাগবে তার হিসেব। সেই মত সরবরাহকদের কাছে খবর চলে যাওয়াতে রসদ এসে রোবট শ্রমিকদের হাত দিয়ে সঠিক জায়গার জমাও হয়ে গেছে।

বন্দরের নিয়মিত কাজ যখন নিরুত্তাপভাবে চলছে আলেকজান্ডার একটু সময় পেলেন সোফিয়ার সঙ্গে কিছু বিজ্ঞান আলোচনা করতে; তাঁর কিছু সময় চেয়ে নিলেন। ফিউচার জাহাজের কম্যান্ডে তিনি আছেন তাও প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেলো। শুরু থেকেই এটি পরিকল্পিত হয়েছে পরীক্ষামূলক জাহাজ হিসেবে। এর মধ্যে বার তিনেক সিঙ্গাপুরের ড্রাই-ডকে তুলে এর খোলে ও গঠনে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে- সবই গবেষণার ফলাফলকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে। উদ্দেশ্য হলো নিয়মিত উচ্চ গতির জাহাজ হিসেবে একে আরো কার্যকর করা, কার্বন উদ্গীরণ না করে। এবার সোফিয়ার যাত্রা শেষ হলে, পরীক্ষার ফলাফলে সিদ্ধান্তগুলো এলে আবার ড্রাই-ডকে যেতে হতে পারে একে। তাছাড়া মাস্তুলের এবং ডানাপালের বিন্যাসেও পরিবর্তন দরকার হতে পারে– এ নিয়েই আলাপ।

আলেকজান্ডার: 'আপনার রূপককল্পটি হলো পালের সংখ্যা আরো বাড়ানো যায় তাদের মধ্যে ফাঁক কমিয়ে এবং একের সঙ্গে অনেকের বিভিন্ন কোণের সৃষ্টি করে, যাতে ইন্টেলিজেন্ট কারুকার্য প্রত্যেকটিতে কিছুটা ভিন্ন ভাবে ঘটবে। আমি কি ব্যাপারটি ঠিক বুঝেছি?'

সোফিয়া: 'হ্যাঁ হুবহু তাই। আমি ব্যাপারটি সিম্যুলেট করে দেখেছি, এটি সম্ভব। নীতিগত ভাবে এই পথেই শুধু ডানাপাল দিয়ে এবং খানিকটা জিরো এমিশন ইঞ্জিন ব্যবহার করে জাহাজের বেগ ৪০ নট পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি (ঘন্টায় ৪৬ মাইল) ফিউচারের মত পণ্য বোঝাই ভারী একটি জাহাজকে।'

আলেকজান্ডার: ‘কিন্তু এর ফলে জাহাজের গতিতে যে বাড়তি বাধার সৃষ্টি হচ্ছে সেটি কেমন করে সামাল দেবেন? তাছাড়া জাহাজের পাশের দিকের যে চাপকে জাহাজ নিজের লম্বালম্বি অবয়ব দিয়ে নাকচ করে রাখছে সেই চাপ ঠেকাবেন কী ভাবে? তাতে তো জাহাজ স্থিতিশীল থাকবেনা।’

সোফিয়া: ‘ওইখানে আরো কিছু কাজ বাকি আছে। বাড়তি পাল এমন ভাবে সাজাবো যাতে বাতাসের এ্যারোডাইনামিক মসৃণতা বজায় থাকে। আর পার্শ্ব চাপের জন্য জাহাজের তলার খিলে পরিবর্তন আনতে হতে পারে যেন পানির ভেতর তার পার্শ্ব গতিতে বাধা বাড়ে। এসব সূক্ষ্মতর ভাবে হিসেবে করার জন্য নতুন ইন্টেলিজেন্ট সফ্‌টওয়্যার তৈরি করছি। এ নিয়ে সিম্যুলেশান থেকে প্রচুর তথ্য দিয়ে তাকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে।’

আলেকজান্ডার: ‘তার মানে এবার সিঙ্গাপুর পৌঁছলেই হয়তো আমি ওখানে আটকে যাবো। সিদ্ধান্ত আসবে অপেক্ষা কর, ফিউচারকে ড্রাই-ডকে তুলতে হতে পারে। সিঙ্গাপুরে নিষ্কর্ম অপেক্ষা করতে আমার মোটেই ভাল লাগেনা। ওই জায়গাটি আর কখনো মানুষ হতে পারলোনা শুধু মুখ গোমরা করে শৃঙ্খলা মেনে যাও। দুনিয়ায় গত এক শ’ বছর এত কিছু ঘটে গেলো, দুনিয়ার সব দেশ এক দেশ হলো, সিঙ্গাপুর নিজে একটি সাধারণ জাহাজ-ঘাটের শহর থেকে সব দিক থেকে গগনচুম্বী নগরী হলো, কিন্তু তার খাসলৎতো বদলালোনা। আমি বরং পারলে মেলবোর্নে কেটে পড়বো। আমার নিজের ঝলমলো মেলবোর্নে।’

সোফিয়া: ‘আহা আপনার জন্য মায়া হচ্ছে! জানেন যেই আমার সিদ্ধান্তের জন্য আপনার এতো কষ্ট, সেই আমি কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে সোজা চলে যাব কোটা কিনাবালু, ওরাংউটান এর সঙ্গে সময় কাটাতে, পুরো পরিবার নিয়ে। আমাকে হিংসে করবেন না যেন।’

আলেকজান্ডার: ‘না, ওরাংউটানে আমার কোন আগ্রহ নেই’।

স্টুয়ার্ট আলাদিন ও তার শেফ কিন্তু সোফিয়ার পিছু ছাড়েনি। তাপসীর সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ রাখে, আজ নতুন বাঙালী খানা কিছু করবে নাকি। আলাদিন ও শেফের এটি পুরানো অভ্যাস, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেছে। এর কারণ কোন এক গ্রহ-যোগে ফিউচারে যে ক’জন অফিসার এসেছেন গেছেন তাঁরা প্রায়

সবাই ভোজন রসিক; এখন যাঁরা আছেন তাদের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা। সোফিয়াকে এই দলে শামিল করাটাই লক্ষ্য।

তবে ওদের মধ্যে দীপক প্যাটেলের স্থানটি অনন্য। কারণ তিনি শুধু শেফকে রেসিপি দিয়ে বা তাকে দু'একটি ইশারা দিয়ে রেসিপিটি রিসার্চ করে জেনে নিতে বলে ক্ষান্ত হোননা, কোমর বেঁধে নিজেই লেগে পড়েন রান্নায়, যখনই সুযোগ পান। অনেক সময় শেফের সঙ্গে নয়, বরং শেফকে একেবারে বাদ দিয়ে রেখে। তাছাড়া রান্নায় আন্তর্জাতিক মিশ্রণ সৃষ্টি করতেও দীপক পটু। তিনি বাইরে আপাদমস্তক বৃটিশ, কিন্তু তাঁর শিকড় রয়ে গেছে তানজানিয়ার মোয়ান্‌জোতে, আর একটু গভীরে গেলে ভারতের গুজরাটে। বৃটেনে তাঁর পূর্ব পুরুষরা পূর্ব আফ্রিকা থেকে এশীয় অভিবাসী। এতো প্রজন্ম পার হয়েও গুজরাটি ঐতিহ্য এতটুকুও কমেনি, রসনার ক্ষেত্রেতো নয়ই। এদিক থেকে ওলেগ আর্টমালোভ দীপকের ঠিক উল্টো।

ওলেগ রাশিয়ান; আগেও রাশিয়ান, পরেও রাশিয়ান, শুধুই রাশিয়ান। অন্যান্য দেশের সব কিছুই খেতে ভালবাসেন– যেমন ইতালিয়ান পাস্তা বা ভারতীয় বিরিয়ানি, কিন্তু সঙ্গে রাশিয়ান মূল খাবার কিছু থাকা চাই। যেমন ওকরোশকা– টক দুধের মধ্যে করা নানা সব্জীর স্যুপ, উখা– নানা মাছের স্যুপ, কাশা– নানা শস্যের জাউ এবং অবশ্যই ক্যাভিয়ার– স্টুরজেন মাছের সেই দুর্মূল্য কালো ডিম, অরিজিনাল না পাওয়া গেলে যে কোন মাছের ডিমই সই।

ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার ডুকাকিসের ভারিক্কি চাল পুরোটাই খসে পড়ে গ্রীক খাবারের বর্ণনা দিতে থাকার সময়, যেন তিনি গ্রীক সংস্কৃতির এই দিকটির একজন মূর্তিমান বিজ্ঞাপন। তিনি অস্ট্রেলিয়ান, মোলবোর্নই এখন তাঁর পুরো গোষ্ঠির ঠিকানা। কিন্তু খাবার দাবারের প্রশ্ন উঠলে তিনি এক মুহূর্ত ভুলতে দেননা যে তাঁরা গ্রীস থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন গত শতাব্দীতে। জাহাজী হওয়াটি গ্রীকদের মধ্যে যেমন মজ্জাগত, অস্ট্রেলিয়ার এই ডুকাকিস পরিবারেও তাই। ওই নগরীর অনেক মানুষই গ্রীক বংশোদ্ভুত। এর মধ্যে যেহেতু বিশ্ব রসনায় ভাল ভাবে সিক্ত হয়েছেন, খাবার পর বিখ্যাত গ্রীক চীজের (পনির) একটা পেলেই তিনি সন্তুষ্ট– ফেটা, কাসেরি, মাইজিথ্রা, মানুরি, গ্র্যাভিয়েরা– বেশ কয়েকটা সাজিয়ে দিলেই ভাল, অন্তত একটা তো চাইই।

অপ্সরা কুমারাতুঙ্গা দক্ষিণ শ্রীলঙ্কার গ্যালেতে শৈশব কাটিয়েছে, সমুদ্র পারের নারকেল দুধ, নারকেল তেলে রান্না করা সামুদ্রিক মাছে কত রকম উপাদেয় রেসিপি যে হতে পারে এসব তার বিলক্ষণ জানা। আলাদিনকে বলে মাটির হাঁড়িতে রান্না ও মাটির হাঁড়ি থেকে পরিবেশনের ব্যবস্থাও অপ্সরা জাহাজের খাবার ঘরেই করেছে। বিজ্ঞান দিয়ে সোফিয়ার সঙ্গে বন্ধন শুরু হয়েছিলো তা খুব দ্রুত নানা দিকে প্রসারিত হয়েছে। সোফিয়া চট্টগ্রামের মানুষ, সামুদ্রিক মাছের দারুণ ভক্ত। তবে সামুদ্রিক মাছ দিয়ে অপ্সরার বাছাই করা শ্রীলঙ্কান রেসিপিগুলোতে তিনি যে বিচিত্র স্বাদ পেয়েছেন তা আগে পান্‌নি। ইতোমধ্যে অপ্সরাকে ছেলে রাহিলের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এই রেসিপি প্রসঙ্গে। আন্তর্জাতিক রসনার ব্যাপারে নিজেকে অপ্রতুল মনে করলে সোফিয়া রাহিলের শরণাপণ্ন হন, কারণ রাহিল অনেক বড় সমজদার। হাওয়াইতে থাকা রাহিল কিন্তু আগে থেকেই শ্রীলঙ্কার রসনার সঙ্গে ভালই পরিচিত। মা'কে দুচারটি রেসিপিতে উৎসাহ দিতে পারলো অপ্সরার সমর্থনে। মনে হচ্ছিলো কিছুটা জাহাজী বিজ্ঞান এবং অনেকটা রসনা বিজ্ঞান নিয়ে ফিউচারের বাকি যাত্রাও ভালই কাটবে। কিন্তু বিধি বাম!

নেটওয়ার্কে বিপর্যয়

দুবাই বন্দর থেকে যাত্রাটি ভাল হয়েছিলো মোম্বাসার পথে। ইলেকট্রিক কারের বেশির ভাগই দুবাইয়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, অল্প কিছু রয়েছে মোম্বাসার জন্য। ফিউচার এখন মূলত শস্যবাহী জাহাজ– গম যাচ্ছে সাব- সাহারান আফ্রিকার জন্য। অঞ্চলটি কৃষির জন্য খুব যুৎসই নয়, তাই শস্য-খাদ্য আমদানী করতে হয়। পারস্য উপসাগর ছাড়বার আগেই খবর আসলো পুরো সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলটি জুড়েই নেটওয়ার্ক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। নেওয়ার্ক মানে ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক, যাকে এই যুগের বিশ্ববাসীকে প্রতি মুহূর্তে সংযুক্ত করে রাখার সঞ্জীবনী বাতাসের মত বলা যায়। বাতাসের মধ্যে ডুবে থাকি বলে আমরা এর অস্থিত্বের কথা মনে রাখিনা, কিন্তু ওই বাতাস ছাড়া এক মুহূর্ত বাঁচতে পারিনা। তাই এই অবধি আমাদের কাহিনীতে নেটওয়ার্কের কথা একবারও না বলা হলেও ফিউচার জাহাজের সকল কাজ ও বাকি বিশ্বের সঙ্গে তার সকল যোগাযোগ বরাবর এর ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন খবর পাওয়া

গেলো যে যেখানে ফিউচার যাচ্ছে ওখানে এই নেটওয়ার্ক বিপর্যস্থ হয়েছে। এটি একেবারেই বিরল ঘটনা– কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটেছে।

বিশ্বজোড়া সর্বত্র পৌঁছে যেতে পারে এমন নেওয়ার্ক প্রথম প্রবর্তন হয় ১৯৯০ এর দিকে– একে বলা হতো ইন্টারনেট। আজ এটি হয়ে পড়েছে ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক, আর এর ক্ষমতা সেই প্রথমটি থেকে অকল্পনীয় ভাবে বেশি। ওই আদি ইন্টারনেটের সঙ্গে এক সময় ব্যাপক ভাবে জড়িত হয়েছিলো ইন্টারনেট অফ থিংস। এই দুইয়ের প্রথমটির কারবার ছিল প্রধানত তথ্য নিয়ে, দ্বিতীয়টিতে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ও ডিভাইসের বিভিন্নটিকে একে অন্যের বোঝাপড়ায় চলার জন্য বিশ্বজোড়া পরস্পরযুক্ত করে দেয়াটাও নেটওয়ার্কের বড় কাজ হলো। তথ্য ও কর্ম সম্পাদন– এই দুই যখন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল, এবং বিশেষ করে তার সঙ্গে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হলো তখনই দুনিয়া বদলে গেলো। মানুষ ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর যে কোন স্থানে থেকেই শুধু তথ্য নয়– বিদ্যুৎ শক্তি, নানা রকম সার্ভিস, ইত্যাদিও বিশাল শূন্যের মধ্য দিয়েই পেয়ে যেতে পারছে এবং এই সব পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করতে পারছে। কিন্তু এটি যেমন অনেকগুলো সেবা সহজলভ্য করছে, তেমনি কোন কারণে এতে বিপর্যয় ঘটলে এগুলোর অভাবে দারুণ বিপদে ফেলে দিতে পারে, এবং সেটি অসংখ্য মানুষকে এক সঙ্গে কাবু করে ফেলে। এমনটিই এখন ঘটেছে।

সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের সঙ্গে এ এই প্রশ্নটি জড়িয়ে। ফিউচারের গন্তব্য স্থল হলো কেনিয়ার বন্দর মোম্বাসা। ওখানে পৌছতে অনেক দেরি থাকলেও পৌঁছার বেশ কিছু আগে থেকেই এটি পৌঁছে যাবে সমুদ্রের এমন জায়গায় যেখানটা সাব-সাহারান আফ্রিকা সরকারী অঞ্চলটির আওতাধীন। পুরো বিশ্ব সরকারটা সর্বোচ্চ সার্বভৌমত্বের অধিকারী হলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে এই অঞ্চল-সরকারের গুরুত্ব কম নয়, অনেক কিছুই তার এলাকায় তার শাসনাধীনেই চলে। সে কারণেই তার সীমান্তে পৌঁছানোর পর থেকেই ফিউচারের চালনা ও কাজকর্মের ওপর নেটওয়ার্কের অনুপস্থিতিটি দারুণ বিঘ্ন ঘটাতে আরম্ভ করবে। তথ্য যোগাযোগ থেকে শুরু করে ফিউচারের গতিবিধি, এখানকার বিভিন্ন যন্ত্র ও ডিভাইসের কাজ এর ওপর নির্ভর করে। ইন্টারনেট অফ থিংস হিসেবে এখানকার এক

একটি যন্ত্র বাইরের কোন কোন সার্ভিসের সঙ্গে জড়িত থাকে। এই সার্ভিসগুলো না পেলে ফিউচার বড় সমস্যাতে পড়ে যেতে পারে।

ক্যাপ্টেনের কাছে সাব-সাহারান অঞ্চলে নেটওয়ার্ক বিপর্যয়ের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সব অফিসারদের নিয়ে বসলেন তাঁদের করণীয় নিয়ে। সে অনুযায়ী প্রত্যেকে লেগে গেলেন এ সম্পর্কে যতখানি বিস্তারিত তথ্য যোগাড় করা যায় তা করতে। জানা দরকার আসলে ব্যাপারটি কী হয়েছে, ঠিক কোথায় হয়েছে, এর ফলশ্রুতি কোথায় কতটুকু ইতোমধ্যে হয়েছে। কাজটির দায়িত্ব পড়লো ইঞ্জিনিয়ার দু'জনের ওপর– ওলেগ ও অপ্সরা। এটি রীতিমত একটি গোয়েন্দা তদন্তের মত; বিশ্বময় অনুসন্ধান, ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি এবং নেটওয়ার্কের নানা প্রয়োগের মাধ্যমে। ফলাফল যা উদ্ঘাটিত হলো তাতে দেখা যাচ্ছে সমস্যার উৎপত্তি ওই সাব-সাহারান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সোমালিয়ায়, সুকৌশল হ্যাকিং এর মাধ্যমে ওখানকার একটি বুদ্ধিমান দুষ্ট গ্রুপ সাব-সাহারান আঞ্চলিক সরকারকে সাবোটেজ করার জন্যই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। সোমালিয়ায় এমন একটি চক্রের অবস্থান সম্পর্কে আগে থেকে কানাঘুষা ছিল, দু'একবার হ্যাকিং হতে দেখাও গেছে; কিন্তু সারা অঞ্চলে এমন নেটওয়ার্ক বিপর্যয় আগে বড় একটা হয়নি। তখন যা কিছু ঘটেছে তা স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল।

বিশ্ব সরকার যখন পৃথিবীব্যাপী এই নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলো তখন থেকে এটিই ছিল তার জন্য একটি দুঃস্বপ্নের মত। নানা জায়গায় এর অপেক্ষাকৃত দুর্বল জায়গাগুলো হামলাকারীদের শিকার হতে পারে সেটি সব সব সময়েই মাথায় ছিল। সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে সোমালিয়া এবং তার সীমান্তের আরো কিছু জায়গার নেটওয়ার্ক নানা কারণে দুর্বল রয়ে গেছে– রাজনৈতিক অনৈক্য, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলায় ঘাটতি নেটওয়ার্কের এই অংশকে দুর্বল রাখতে সাহায্য করেছে। তবে মনে করা হচ্ছিল কিছু স্থানীয় লুপে দুর্বলতাগুলো সীমাবদ্ধ থাকাতে এমন ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে পারবেনা। এখন ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন পরিস্থিতিতে নেটওয়ার্ককে অক্ষত রাখে সেটি পুরো কাজ করতে পারেনি। তবে খবর হলো সোমালিয়ার ওই লুপের বাইরে কিছু কিছু সংযোগ এখনো বজায় রয়েছে বলে অঞ্চল-কর্তৃপক্ষ একেবারে বিকল হয়ে পড়েনি। বিকল্প ব্যবস্থায় এটি জরুরী কাজগুলো বজায়

রাখতে পেরেছে; যদিও সাধারণ মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ও সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্ব সরকার বিশেষ আপৎকালীন ব্যবস্থার মাধ্যমে ওই লুপগুলোতে নতুন ভাবে নেটওয়ার্ক সৃষ্টির চেষ্টায় অঞ্চলকে সহায়তা দিচ্ছে; শিগ্‌গির অবস্থা অন্তত কিছুটা উন্নত হতে পারে।

কাজেই ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিলেন মোম্বাসার দিকে যাত্রা যথারীতি অক্ষুণ্ন রাখা হবে। বিপর্যয়ের এলাকায় গিয়ে ফিউচার চলার পথে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে শুরু করবে তার পরিস্থিতি দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে। অবস্থা যাই হোক মোম্বাসার বন্দরে পৌঁছে সঙ্গের গম সেখানে নামাতে পারলে খুব ভাল হয়। নেটওয়ার্ক বিপর্যয়ে মোম্বাসার আশপাশের জায়গাগুলোতে যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে সে ক্ষেত্রে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার সব চেষ্টাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেটি করতে হলে তার আগেই যাত্রাপথে ফিউচার জাহাজের দৈনন্দিন বিঘ্নগুলোর কী হবে?

জাহাজের অনেক সিস্টেমের সঙ্গে এই নেটওয়ার্কের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন সামনের আবহাওয়া ও সমুদ্রের অবস্থা সম্পর্কে প্রতি ভৌগলিক বিন্দুতে প্রতি মুহূর্তের উপাত্ত নেটওয়ার্ক থেকেই ফিউচারের জাহাজী সিস্টেমগুলো পায়। প্রতি মুহূর্তে ডানাপালের এবং জাহাজের দিক-নির্ণায়ক হালের কী হবে তা ইন্টেলিজেন্ট ব্যবস্থা হিসেব করে প্রয়োগ করতে পারে ওই উপাত্তের ভিত্তিতেই। এ রকম আরো বহু সিস্টেম নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করে। একেবারে ব্যক্তিগত বিষয় মানুষদের স্বাস্থ্যের কথাই ধরা যাক, স্বাস্থ্যগত যে কোন জরুরী অবস্থা তো যে কোন সময় ঘটতে পারে। ফিউচারে ইন্টেলিজেন্ট সার্জন সীতালক্ষ্মী যে একা অধিকাংশ সমস্যা সামাল দিতে পারে তার কারণ সে নেটওয়ার্কে ইন্টেলিজেন্ট স্বাস্থ্য সেবার সম্পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে। যেমন সোফিয়া যখন বাড়িতে ছিলেন এই নেটওয়ার্ক সেবা ওখানেই তাঁর স্বাস্থ্য মনিটর করেছে, শরীর খারাপ হলে সম্ভাব্য যা যা করার করেছে অনেক খানিই স্বয়ংক্রিয় ভাবে, কী করছে তাঁকে জানিয়ে রেখে। বেশির ভাগ করেছে তাঁর ফোনের সঙ্গে থাকা বা বাড়িতে অন্য ডিভাইসের সঙ্গে থাকা নানা পরিমাপ, টেস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে। তিনি যখন ফিউচার জাহাজে চলে এসেছেন এখানে একই নেটওয়ার্ক একইভাবে কাজ করছে। সীতালক্ষ্মীও নেটওয়ার্কে তাঁর এসব মনিটরিং পেয়ে যাচ্ছে। জাহাজ হওয়াতে স্বাস্থ্য সেবার বাকি অনেক কিছু সীতালক্ষ্মীর মাধ্যমে

হতে হচ্ছে এখন; জাহাজের ওষুধ-ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধও পাওয়া যায়। নেটওয়ার্ক অচল হলে এই স্বাস্থ্য সিস্টেমেও বিঘ্ন ঘটবে।

তবে সোমালিয়ার হ্যাকিং এর মত ঘটনা মাথায় রেখেই হয়তো সব জায়গায় কিছু চলনসই বিকল্প রাখা হয়, যাতে নেটওয়ার্ক বিপর্যয় ঘটলে সব কিছু শুন্যের কোঠায় না নেমে আসে– পুরো নগর অন্ধকার হয়ে না যায়, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ না হয়ে যায়, জাহাজ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকে, বিমান দুর্ঘটনায় না পড়ে যায়– এমন সব কাণ্ড যেন না ঘটে। ইন্টেলিজেন্টের প্রায়োগে সর্বত্র স্বয়ংক্রিয়তা এসেছে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে ওই ইন্টেলিজেন্ট কৌশল গড়ে তোলার পথে একটি মূলমন্ত্র রাখা হয়েছে 'রিডানডেনসি' যার অর্থ শত ভাগ তার ওপর নির্ভর করোনা, কিছু বাড়তি সুযোগ রাখো, কিছু বিকল্প রাখো। এই রিডানডেনসির ভরসাতেই ফিউচার জাহাজ মোম্বাসা বন্দরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

বিপর্যয়ের খবরের উত্তেজনা কিছু হ্রাস পেলে অফিসাররা আবার ক্যাপ্টেনের বৈঠকখানায় কিছুটা আড্ডার ঢঙে বসার সুযোগ পেলেন, সোফিয়াও যোগ দিলেন। আপাতত করার কিছু নেই, এগুবার সিদ্ধান্ত নেবার পর। আড্ডায় সাব-সাহারান রাজনীতির প্রশ্নটিও অনিবার্য ভাবে আসলো। সোমালিয়া, জিবুতি, পার্শ্ববতী কেনিয়া এসব জায়গার সংস্কৃতি ঘুরপাক খেয়েছে ঐতিহাসিক ভাবে গোত্রগত স্বার্থ বিবেচনায়। সাংস্কৃতিক দেশ হিসেবে এটি এখনো এই নতুন অর্থনীতির জগতেও সংস্কৃতির নামে গোত্রীয় ব্যাপারটির রেশ থেকে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার তাঁর জাহাজী গল্পের ভান্ডার থেকে অতীতে নাবিকরা কী ভাবে সোমালীয় জলদস্যুদের হাতে নিগৃহীত হতো এখানকার সেই জলদস্যুতার কথা বল্লেন। এখন দস্যুরাও ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি ব্যবহার করছে, কখনো বেশ উচ্চাঙ্গের ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি– এই হ্যাকিং তার প্রমাণ।

ওলেগ: 'আসলে বিশ্ব নেটওয়ার্কের কোথাও কোথাও স্থানীয় অংশে এমন কিছু কারিগরি দুর্বলতা রয়ে গেছে যার সুযোগ দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা নিতে পারছে। অনেক ক্ষেত্রে দুর্বলতাটি আসছে নেটওয়ার্ক থেকে, কেউ যেন ব্যক্তিগত তথ্যে বেআইনী আড়ি পাততে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে গিয়ে। যে যেখানেই থাকুক পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ যাতে খাদ্য, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, প্রয়োজনীয় রসদ, বিনোদন ইত্যাদি ঘরে বসেই পায় সে জন্যই তো এই নেটওয়ার্ক। সমস্যা হচ্ছে এর থেকে নানা ভাবে, আড়ি পেতে ব্যক্তিগত

গোপনীয়তা নষ্ট করা যায়, তথ্য চুরি করা যায়, আরো নানা ক্ষতি করা যায়। এগুলো কঠিন করার জন্য নেটওয়ার্ককে অনাবশ্যক ভাবে জটিল করতে হয়েছে; ওই জটিলতা আখেরে কিন্তু স্থান বিশেষে নেটকে দুর্বল করেছে, হ্যাকারদের সুযোগ বাড়িয়েছে।'

সোফিয়া: 'গোত্রীয় বিবাদের মতো অদ্ভুত সেকেলে ঠুনকো জিনিসই যদি নেটওয়ার্ক হ্যাকিং করে একটি পুরো অঞ্চলকে বিকল করে দিতে পারে, তা হলে বৈশ্বিক কোন সংঘবদ্ধ দল চাইলে তো বিশ্ব সরকারকেই চ্যালেঞ্জ করতে পারে!'

ওলেগ: 'না পারেনা। বিশ্ব নেটওয়ার্ক খুবই মজবুত ভাবে প্রতিরক্ষা দেয়া একটি জিনিস। পুরানো ইনটারনেট আর ইন্টারনেট অফ থিংস হিসেবে এটি যখন বহু দশক ধরে গড়ে তোলা হচ্ছিলো তখন ওই পুরো সময় জুড়েই পাশাপাশি গড়ে উঠেছিলো সাইবার সিক্যুরিটি। এটি গড়া হয়েছে একের ওপর আরেক এমনি পরতে পরতে– একটি পরতের ওপর আঘাত আসার সম্ভাবনা দেখা দিলে এসেছে আরেকটি পরত, তাকে সুরক্ষা দিতে। শুরুর দিকে এই সুরক্ষা পরতগুলো মানুষই সৃষ্টি করতো, এ কাজে অত্যন্ত দক্ষ মানুষ। হ্যাকাররা নিজেরাও অত্যন্ত দক্ষ মানুষ, তাই তারাও সেয়ানে সেয়ানে সুরক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতো। কিন্তু পরে মানুষ সরাসরি নিজে আর সুরক্ষা দিলোনা, এ দায়িত্ব দিয়ে দিলো তারই সৃষ্টি করা ইন্টেলিজেন্টের ওপর, যার নজরদারির চোখ খুবই তীক্ষ্ণ। ইন্টেলিজেন্টের সুরক্ষা দেয়া পরতগুলোর সঙ্গে মানুষ হ্যাকার পেরে ওঠেনা। এ জন্যই বিশ্ব নেটওয়ার্ক এতো মজবুত।'

অপ্সরা: 'তা হলে সোমালিয়ার হ্যাকাররা পারলো কী ভাবে?'

ওলেগ: 'সেটাই তো কথা। স্পষ্টত সাব-সাহারান অঞ্চলটিতে ওই সুরক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় ঘাটতি আছে। সুরক্ষার একটি মুলনীতি হলো মানুষের সরাসরি প্রবেশের জায়গা নেটওয়ার্কে কম থাকা, মধ্যবর্তী কোন স্থানে। শেষ গন্তব্য অবশ্যই মানুষ, কিন্তু মাঝে সব সময় ইন্টেলিজেন্ট থেকে ইন্টেলিজেন্টে যাওয়াটাই উচিত। হয়তো ওখানে ওই মূলনীতি মানা হয়নি। তাই হ্যাকারদের পক্ষে ঢোকা সহজ হয়েছে। এমন দুর্ঘটনা যে ঘটতে পারে সেই সম্ভাবনা অবশ্য শুধু কোন বিশেষ জায়গার ব্যাপার নয়; এটি যে কোন জায়গায় কখনো না

কখনো হতে পারে এমনটি ধরে নিয়েই সব জায়গায় রাখা হয়েছে প্ল্যান-বি। কখনো বিপর্যয় ঘটলে বিকল্প পদ্ধতিতে যাতে মানুষ তার জরুরি সরবরাহ ও সার্ভিস বজায় রাখতে পারে এ জন্য প্ল্যান-বি। এ জন্য মাঝে মাঝে ঘটা করে ড্রিলও অনুষ্ঠিত হয়। এক একটি এলাকার সব মানুষ ইচ্ছে করেই প্ল্যান-বি তে চলে যায়– নেটওয়ার্ক কাজ করছেনা ধরে নিয়ে সব কিছু অন্য ভাবে করে, এক কালে মানুষ নিজে নিজে যেমন করে নানা জিনিস নানা ভাবে যোগাড় করে নিতো।'

এবারো এক ভাবে বিকল্পের প্রস্তুতি ছিলো, ফিউচারেরও ছিলো, ফিউচারের যে গন্তব্য সেই মোম্বাসা বন্দরেরও ছিল। যদি নেটওয়ার্ক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আফ্রিকা উপকূলের কাছের সমুদ্র দিয়ে ফিউচারকে যাওয়া আসা করতে হয় তা হলে তার চলাচলের প্ল্যান-বি তৈরি ছিল; গতিবেগ বেশ কিছু কমে যাবে, কিন্তু বড় কোন সমস্যা হবেনা। তথ্য নিয়ে যোগাযোগ কঠিন হবে, অসুখ বিসুখ যদি ও সময় হয়েই বসে তখন সীতালক্ষ্মীকে ফিউচারের নিজস্ব ব্যবস্থায় তা সামাল দিতে হবে। মোম্বাসা বন্দরের জেটিতে ভিড়তে হবে কিছুটা পুরানো কায়দায় একটি ছোট পাইলট-জাহাজের পেছনে। ফিউচারের যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকই এখানকার জন্য আনা গম খালাস করতে পারবে। কিন্তু সেই গম কেনিয়ার এই বন্দর থেকে ঠিক ঠিক জায়গাগুলোতে যেতে হয়তো সময় বেশি লাগবে। লাভের মধ্যে নেটওয়ার্কবিহীন অবস্থায় ফিউচারকে চালানো নিয়ে এমন কিছু উপাত্ত সোফিয়া তাঁর গবেষণায় পেয়ে যাবেন যা তাঁর পাওয়ার কথা ছিলনা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসবের কিছুই ঘটলোনা, প্ল্যান-বি প্রয়োজনই হয়নি। ফিউচার নেটওয়ার্কবিহীন সমুদ্রে পৌঁছাবার আগেই বিশ্ব সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের সফল হস্তক্ষেপে নেটওয়ার্ক মেরামত হয়ে গিয়েছিলো। ফিউচার তার পুরো গতিবেগ নিয়েই যথা সময়ে মোম্বাসা পৌঁছে গিয়েছিলো। পৌঁছার আগে আলেকজান্ডার আর সোফিয়া মোম্বাসা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সিদ্ধান্ত হলো ফিউচার জাহাজটি যেহেতু একটি গবেষণা-জাহাজ এর কয়েকজনকে সুযোগ দেয়া হোক নেটওয়ার্কবিহীন অবস্থায় বন্দরে ভিড়েছে এমন কিছু জাহাজের ক্যাপ্টেন ও ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলার। তাঁদের ইন্টেলিজেন্টদের থেকে তথ্য নিয়ে কী রকম জাহাজে

নেটওয়ার্ক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা কী হয়েছে তার উপাত্ত সংগ্রহ করা হোক গবেষণার জন্য। এরকম যুৎসই তিনটি জাহাজ পাওয়া গেলো। এর মধ্যে কোকোরো মারু নামের জাপানী জাহাজের ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করলেন সবাই তাঁর জাহাজে একটি সভায় মিলিত হয়ে আলাপ করি আর তথ্য সংগ্রহ করি। বন্দর কর্তৃপক্ষের চীফ রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ারকেও আমন্ত্রণ জানানো হলো। কোকোরো মারুর ক্যাপ্টেন সবাইকে বাড়তি টোপ দিয়ে রেখেছিলেন– একেবারে সদ্য সমুদ্র থেকে ধরা মাছ দিয়ে মানুষ জাপানী শেফের তৈরি কাঁচা মাছের সাশামি ডিনারের। ফিউচার থেকে আলেকজান্ডার, সোফিয়া এবং ওলেগ গেলেন।

কালেভদ্রে ড্রিলের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক চলে যাওয়ার অভিনয় করা এক জিনিস, সত্যি সত্যি নেটওয়ার্কবিহীন অবস্থায় আজকের আধুনিক জাহাজ চালানো এবং বন্দর চালু রাখা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতার তথ্য বিভিন্ন জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে যেমন পাওয়া গেলো তেমনি সেগুলোর ইন্টেলিজেন্ট অফিসারদের থেকেও পাওয়া গেলো। কোকোরো মারু নিজেও খুবই আধুনিক জাহাজ– জিরো এমিশনে চলার পুরো আয়োজন তার আছে। এটিও সব কিছুর জন্য দারুণ ভাবে নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু এই বিশেষ সময়ে সেটি ছাড়াই চলতে হয়েছে। আধুনিক হলেও এটি ফিউচারের মত ডানাপালে দ্রুত গতিতে চলবে এমন ছিমছাম করে তৈরি নয়; ডানাপাল এর আছে, কিন্তু তা সহায়তাকারী হিসেবে। ইঞ্জিনই এর মূল চালিকা শক্তি– জিরো কার্বন ইঞ্জিন। ফিউচারের তুলনায় বড় ও চওড়া জাহাজ। নেটওয়ার্কের ওপর তার নির্ভরশীলতা ডানাপালের জন্য এতটা নয় যতটা জাহাজকে সব থেকে উত্তম দিকে ঘুরিয়ে রাখা প্রতি মুহূর্তে অর্থাৎ নেভিগেশনের দিক থেকে। ইঞ্জিন এবং হাল উভয়টির ওপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয় নেটওয়ার্ক থেকে আসা বায়ুপ্রবাহ ও জলস্রোত উপাত্ত থেকে এবং সেই মত কর্ম নির্দেশনা থেকে। এই সব ক্ষেত্রে নেট বিপর্যয়ের কারণে একেবারেই প্ল্যান-বি তে চলে যেতে হয়েছিলো কোকোরো মারুকে।

বাকি দুটি জাহাজ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রায় এই ধরনেরই। সব ক'টার ইন্টেলিজেন্ট অফিসারদের থেকে যার যার প্ল্যান-বি অনুযায়ী জাহাজ চালানোর তথ্য গ্রাফিক্স ইত্যাদি সহ সোফিয়াকে দেয়া হলো। আজকাল বিশ্ব-সমঝোতা এমন একটি পর্যায়ে এসেছে যে বাণিজ্যিক,

রাজনৈতিক কোন দিক থেকে গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদ এসে খোলামেলা গবেষণাকে ব্যাহত করার কোন সুযোগ নেই। আর এটি করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা পরস্পর অপরিচিত জাহাজের ক্যাপ্টেনদের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। যেই মোম্বাসা বন্দরের ওপর দিয়ে নেটওয়ার্ক বিপর্যয়ের এত বড় ঝড় বয়ে গেল তার চীফ রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার নিজেই অনায়াসে সোনিয়াকে জানাতে পারলেন বন্দরের প্ল্যান-বি কী ছিলো, এটি কেমন কাজ করেছে।

দুনিয়ার সমস্ত দেশ নিয়ে বিশ্ব সরকারই হোক বা অর্থনৈতিক সব বিশাল অঞ্চলের সব মানুষের মসৃণ জীবন ও জন কল্যাণের দায়িত্ব নেয়া আঞ্চলিক সরকারই হোক কোনটাই অসহনীয় আমলাতন্ত্রে পর্যবেশিত হয়নি। মানুষের মস্তিষ্কের সর্বাধিক সক্ষমতাকে ব্যবহার করে যে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি তৈরি হয়েছে তা সর্বজনীন, এবং সর্বত্র তা একই ভাবে কাজ করছে। আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী তার বিন্যাসে কিছু রদবদল হচ্ছে মাত্র। সেখানে ওই জাহাজের ক্যাপ্টেনদের মত দক্ষ মানুষদের হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত অবস্থায় আছে– সব ক্ষেত্রে সকল দক্ষ মানুষের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগের মাধ্যমে। তাই এমন বিশ্ব সরকার সম্ভব হচ্ছে। যদি একটি মহা-আমলাতন্ত্রের হাতে এর ভার থাকতো বা জবরদস্ত কিছু বিশ্ব নেতার হাতে, তা হলে এটি কখনো সম্ভব হতোনা।

সোফিয়া একজন বিজ্ঞানী হিসেবে অবদান রাখতে চান। তাঁর কাজ যে শেষ পর্যন্ত সবারই উপকারে আসবে এটি বুঝতে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই নানা জাহাজের ও ভিন্ বন্দরের কর্মকর্তাদের দেরি হয়নি। শুধু তাই নয় তাঁরা বুঝছেন যে আজকের এই সভাটির মধ্যমণি হওয়া উচিত এই বিনীতা বিজ্ঞানী রমণীটিই। তাই সভা যখন সূর্যাস্তে সাশামি ডিনারে গড়ালো, স্বাস্থ্য কামনা করে সবাই গ্লাস উঁচু করলেন সোফিয়ার নামেই।

কারখানা

চলে কল অবিরাম

গ্রীন ফুড্‌স কোম্পানী পুরো দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল জোড়া একটি বড় খাদ্য কোম্পানী, এখানে ছড়িয়ে থাকা তার অনেক কারখানা। এসব এক একটি কারখানার ব্যাপ্তিও কম নয়। চট্টগ্রামে তার একটি কারখানার ব্যবস্থাপক হলেন শান্ত মানাজির। যুগে যুগে উৎপাদন পদ্ধতির অকল্পনীয় সব পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কারখানার ব্যবস্থাপকের মানসিক চাপ বোধ হয় তাতে কিছু মাত্র কমেনি, বরং এক দিক থেকে বেড়েছে। আগের যুগে একজন ব্যবস্থাপক অধীনস্থ বহু অফিসারে পরিবেষ্টিত থাকতেন– নিজের চুল ছেড়ার মত কিছু হলে তাঁদের সঙ্গে অকারণ রাগারাগি করে মনের ভার কিছু লাঘব করতে পারতেন। কিন্তু এখন শান্তর সঙ্গে আছেন আর মাত্র দুই জন মানুষ– প্রডাকশন ম্যানেজার মাহবুব আর চীফ একাউন্টেন্ট নাঈমা। ওই বেচারাদের ওপরও মানসিক চাপ কম নয়। প্রথম জনের হাতে তো কারখানার মূল কাজ উৎপাদন, আর দ্বিতীয় জনকে স্বচ্ছ রাখতে হয় কত ধানে কত চাল– কারখানা অর্থনৈতিক ভাবে সর্বোত্তম অবস্থায় আছে কিনা বোঝার জন্য।

শুনলে মনে হতে পারে যে এত কম মানুষ নিয়ে এসব কারখানার ব্যবস্থাপনা করা ভীষণ দুরূহ একটি কাজ। না, সেরকম কিছু নয়, বরং তার ঠিক উল্টো। দুরূহ কাজের সবই করছে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি। তবে ব্যবস্থাপকের বাধ্যতামূলক কাজ কম হলেও দায়িত্বটি বড়। সবকিছু এমন হিসেব করা যে গ্রীন ফুড্‌সের এই বিশেষ কারখানাটির উৎপাদনে ঘাটতি বা বাড়তি দেখা গেলে চট্টগ্রামের মানুষের পাতে পছন্দের খাবার পেতে বিঘ্ন ঘটবে; তা আজকাল কিছুতেই ঘট্‌তে দেয়া যায়না। দায়িত্ব সব সময়ই বেশি ছিল। কাঁচামাল আসে দূর দূর

জায়গা থেকে, একটি ছোট্ট কাঁচামাল সময়মত হাজির করতে না পারলে তাঁর মাথায় হাত। একটি বড় যন্ত্র ডাউন হয়ে আছে, শুরু হয় উৎপাদন কমার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তা। শ্রমিকরা কেমন জানি ফিসফাস করছে, শ্রমিক অসন্তোষ নয়তো? এই যে সব চিন্তা-আতঙ্ক তাঁদেরকে চাপে রাখতো আজকাল অবশ্য এসবের অধিকাংশই নেই। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি সহজে কারখানায় কোন বিঘ্ন ঘটতে দেয়না। তাহলে তবুও চাপ কেন? হয়তো মানুষের দেখাশোনার অভাবই ব্যবস্থাপককে চাপে রাখছে।

অবশ্য একথা শান্তর ক্ষেত্রে হবার কথা ছিলনা– কারণ তাঁর আনন্দটাই হলো হলো ইন্টেলিজেন্ট ও মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া নিয়ে চিন্তা করা, গবেষণা করা, ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে কী হতে পারে তা নিয়ে মাথা ঘামানো। তাই সঙ্গে মানুষ সহকর্মী ক'জন আছেন আর ইন্টেলিজেন্ট সহকর্মী ক'জন আছে সেটি তাঁর জন্য বড় কিছু হবার কথা ছিলনা; তবুও এক ভাবে হয়।

শেষ পর্যন্ত শান্তর অধীনে এই কারখানার জবাবদিহিতা মানুষ তিনজনের ওপরেই নির্ভর করে– তাঁদেরকেই সব কিছুর জন্য দায়ী করা যায়। এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক থাকতে হয়, মাঝখানে কিছু কিছু সংকটের জায়গায় চোখ রেখে বিচার-বিবেচনা করতে হয়, ওটি সঠিক পথে রয়েছে কিনা। ওই বিচার বিবেচনাটি একান্ত মানুষের বিবেচনা– ওটি অন্য কেউ পারেনা। তাই এত বড় কারখানাকে মানবশূন্য প্রায় করে ফেলেও তিনজনকে ওপরে রাখতে হয়েছে– বিশেষ করে শান্তর ওপর গুরুদায়িত্ব দিতে হয়েছে।

এ গুরুদায়িত্ব পালনটি শুরু হয় রোজ সকালে– একটি বৈঠকের মাধ্যমে। এটি অনলাইনে করা যায়, কিন্তু শান্তরা কারখানা অফিসে বসে কফির মগ হাতে নিয়ে আয়েশ করে করতেই ভালবাসেন এটি। অন্তত নিজেদের মধ্যে সামনা সামনি দেখাটুকু তো হয়, অন্যান্য নানা বিষয়েও আলাপগুলো সেরে নেয়া যায়। বৈঠকের উদ্দেশ্য হলো দিন ও রাতের পরিসরে উৎপাদন ও বন্টনের প্রধান কর্মস্থলগুলোর পরিস্থিতি দেখে প্রয়োজনে নতুন সিদ্ধান্ত দেয়া। এক্ষেত্রে তিন জন প্রধান ইন্টেলিজেন্ট অফিসারের পরামর্শ কাজকে সহজ করে– সাপ্লাইজ ইন্টেলিজেন্ট লিং লিং, প্রোডাকশন্স ইন্টেলিজেন্ট হারকিউলিস এবং নিরাপত্তা ইন্টেলিজেন্ট শার্লক। পুরো কারখানা চলে তার নিজস্ব একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যা কিনা বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্কের অনুরূপ এবং তারই একটি লুপ।

নেটওয়ার্কটি কারখানার সব ইন্টেলিজেন্ট সুপারভাইজর, রোবট শ্রমিক, যন্ত্রপাতির প্রত্যেক অংশের সঙ্গে জড়িত এবং বিশ্ব নেটওয়ার্কের সঙ্গেও সংযুক্ত। কাজেই নেটওয়ার্কের সহায়তা নিয়ে মূলত প্রোগ্রাম করা ও ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি সম্পন্ন এই সব কিছু একের সঙ্গে অন্য সমন্বয় করা। ধাপে ধাপে উৎপাদন কাজ চলে এদের মাধ্যমে। এর মধ্যে কাঁচামাল আনার ও প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য বাজারে সরবরাহের জন্য প্রেরণ পর্যন্ত সব কিছু রয়েছে। ওই সমন্বয়টিতে কোথাও বিঘ্ন ঘটলে, বা কোন যন্ত্রাংশ ইত্যাদির বিকল হবার কারণে সমস্যা হলে তা সময়মত ধরা পড়াটাই গুরুত্বপূর্ণ। এরকম প্রায় সব সমস্যা ইন্টেলিজেন্ট ব্যবস্থা নিজেই ঠিক করে ফেলে। কিন্তু তবুও সর্বোচ্চ পর্যায়ে এটি জানা দরকার এবং কখনো কখনো তার হস্তক্ষেপও দরকার। শান্তর মত বিচক্ষণ ব্যবস্থাপকের বা মাহবুবের মত ইঞ্জিনিয়ার বা নঈমার মত একাউন্ট্যান্টের মনুষ্য-কাণ্ডজ্ঞানটি কখনো অপরিহার্য হয়ে পড়ে বিচার বিবেচনায়। তাই তাঁদের এর মধ্যে এভাবে ঢুকে দেখা, এবং সব সময় সতর্ক থাকা।

হেন কোন খাদ্যদ্রব্য নেই যা গ্রীন ফুডসের এই কারখানায় তৈরি বা প্রক্রিয়াজাত হয়না। কোন কোন খাদ্যে কাজটি খুব একটা বড় নয়; যেমন শস্য, ডিম, সব্জি এমনি সব আইটেমে অল্প কিছু প্রক্রিয়াকরণের পর ব্যবহারযোগ্য ভাবে প্যাকেটজাত করাটাই কাজ। আবার উল্টো কোন কোন খাদ্যকে রীতিমত পুরোটাই কারখানাজাত বলা যায়। কাজেই দৈনন্দিন এর কোন একটিতে বিঘ্ন তো ঘটতেই পারে। যেমন আজ বৈঠকে আসার আগেই প্রডাকশন ইন্টেলিজেন্ট হারকিউলিস মাহবুবকে একটি সমস্যা নিয়ে আদ্যোপান্ত জানিয়ে রেখেছিলো, যাতে সবাই বসলে চট্ করে পরবর্তী করণীয়গুলো নির্ধারণ করা যায়। বিষয়টি হলো ওট্স শস্যের দানা নিয়ে, যার পরিজ ব্রেকফাস্ট আইটেম হিসেবে বেশ জনপ্রিয়– অন্তত এই কারখানার থেকে বড় একটি চাহিদার জিনিস। এটি সেই বহুকাল ধরে প্রচলিত এক সময়ের কোয়েকার ওট্সের নুতন সংস্করণ! এখন এর প্যাকেটে সুস্বাদু সয়াদুধের গুড়ার সঙ্গে টোস্ট করা ওট্স দানা মেশানো হয়েছে– পানিতে একটু সেদ্ধ করে নিলেই চমৎকার পরিজ। এক সময় অল্প কিছু সৌখিন মানুষ এটি খেতো এই এলাকায়। এখন যেহেতু উৎপাদন ব্যয় কম এটি অতি সুলভে প্রত্যেকের

সাধ্যের মধ্যে– ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি নির্বিশেষে অনেকের অভ্যাস হয়ে গেছে।

হারকিউলিসের নেতৃত্বে ইন্টেলিজেন্ট টিম অন্য সব কিছুর মত ওট্‌সের সাপ্লাই লাইন সব সময় বেশ মসৃণ রেখেছে। সমস্যাটি সৃষ্টি হয়েছে ওটস দানা টোস্ট করার যে বিশাল চুল্লী তাতে সঠিক উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছিলনা। ওখানে উত্তাপ একটু কম পেয়ে মানসম্মত টোস্টিং না হবার ভয়ে ইন্টেলিজেন্ট মেশিন পরবর্তী পর্যায়কে চালু হতে দিচ্ছিলোনা। বিষয়টিতে হারকিউলিসের সতর্কতা অংশ সজাগ হয়ে নানা ভাবে একে সমাধানের জন্য চেষ্টা করে স্বাভাবিক করতে কয়েক ঘন্টা লেগে গেছে। তাতে আজকের উৎপাদন মাত্রা যা কমেছে তা অবহেলা করার মত নয়। এই ক্ষতি পূরণের জন্য হারকিউলিসের সিস্টেম পুরো উৎপাদন ব্যবস্থার গতি ঠিক প্রয়োজনমত বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে অস্বাভাবিক গতিতে চল্‌লে ক্ষয়ক্রিয়া দ্রুত হয়ে ও সামান্য বেশি উত্তাপে কাজ করে কয়েকটি যন্ত্রের ওপর সুদূর প্রসারী প্রভাবের সম্ভাবনা আছে। এ জন্য হারকিউলিসকে শুধু হিসেব করে নয়, ওগুলোর বাস্তব পরিস্থিতি পরীক্ষা করেও দেখতে হয়েছে। বড় কথা হলো তার নিজের কিছু ‘বিবেচনাও’ প্রয়োগ করতে হয়েছে। সে জন্যই মাহবুবের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে বৈঠকে আনা।

মাহবুব আর নঈমা হারকিউলিসের বিবেচনাটি এক নজর দেখেই বুঝলেন ওটির দরকার ছিলনা। সুদূরপ্রসারী প্রভাব যা হতে পারে সামান্য কাণ্ডজ্ঞানই বলে দেয় যে ওটা তুচ্ছ করার মত। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি যা দিয়েছে তা অনেক শুদ্ধ, কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধি যা দিয়েছে তা অনেক বেশি কাণ্ডজ্ঞান সম্মত। শান্ত এই ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হলেন বটে কিন্তু ওট্‌স শস্যটির চিন্তা তাঁকে ছেড়ে যায়নি– এ প্রসঙ্গে বরং তিনি ওট্‌স চাষ নিয়ে মূল সমস্যাটি বৈঠকে তুললেন। ওট্‌সের পুরোটাই বাইরে থেকে আনতে হয়, অর্ধেকটা আসে কানাডা থেকে, বাকি অর্ধেক অস্ট্রেলিয়া-সুইডেন-ফিনল্যান্ড থেকে। এতদূর থেকে আমদানী করলে খাদ্যের দাম বাড়ে, সরবরাহ লাইনে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। যেমন সম্প্রতি দুনিয়ায় ওট্‌সের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সেই অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে শান্তকে লড়াই করতে হচ্ছে। ওট্‌স যেকোন শীতল ও আর্দ্র আবহাওয়াতে ভালই জন্মায়। কানাডা, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো এবং রাশিয়াতে এটি প্রচুর চাষ

হয় কারণ চাষের জন্য জায়গাগুলো যথোপযুক্ত হওয়া ছাড়াও উত্তর আমেরিকা, রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপের মানুষ নানা ভাবে ওট্স খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সম্প্রতি নিজ দেশে চাহিদা বাড়াতে তাদের রফতানী কিছুটা অনিয়মিত হয়ে গেছে। শান্ত গ্রীন ফুড্স এবং তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্শাল এ্যাগ্রিকালচারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ভেতরে আরো কাছাকাছি কোন জায়গায় ওট্স চাষ করা যায় কিনা তার ওপর পরীক্ষা চালাতে। একটি মাত্র কারখানার ব্যবস্থাপক হয়েও শান্ত সমস্যাটিকে বড় আকারে সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছেন। এটিই স্বাভাবিক, কারণ এখন সবাই সব কিছুকে দেখছেন বিশ্ব দৃষ্টিতে, স্থানীয় দৃষ্টিতে নয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বের সব মানুষকে মাথায় রেখেই একেবারে স্থানীয় কাজটিও করতে হচ্ছে। তাহলেই তা তার বড় কোম্পানীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

এই যে সঠিক আবহাওয়া ও সঠিক মাটিতে জন্মানো কৃষিপণ্য বহু দূর থেকে আমদানী করে হলেও খাদ্যের যোগান দিতে হবে এটিও অবশ্য একটু সেকেলে ও ব্যতিক্রমী ধারণা। শান্তর কোম্পানী গ্রীন ফুডস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা করছেনা, শান্তর কারখানাতেও না। শুধু কৃষিপণ্যই নয় প্রাকৃতিক যে কোন পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ফেলা হয়েছে কারণ এগুলো মূলত অনবায়নযোগ্য, দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে; আর ক্ষেত্র বিশেষে অনেক দূর থেকে আনতে হচ্ছে। সব কিছু ব্যবহারকারীর হাতের কাছে নবায়নযোগ্য ভাবে উৎপাদনের সুযোগটি সৃষ্টি করাই এখন লক্ষ্য। তবেই তা বর্তমান নতুন অর্থনীতিতে টেকসই হবে। তাই অন্য অনেক কিছুর মত বেশ কিছু খাদ্যও এখন সিনথেটিক– একেবারে মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদির পরস্পর সংযোগে রাসায়নিক ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। অন্য অনেক কিছুর কাঁচামালও একই ভাবে সিনথেটিক। এর মৌলিক উপাদানগুলো বাতাসে, পানিতে আশেপাশে সর্বত্র রয়েছে; আর রোবট দিয়ে উৎপাদন ব্যয়টিও খুব কম। সব উৎপাদন যথাসম্ভব স্থানীয় ভাবে এবং স্থানীয় উপাদান দিয়ে।

সমস্যা সমাধান

কারখানার কর্মযজ্ঞটির মধ্যে কী কী ঘটছে তার খুঁটিনাটি আমরা জানতে পারি যখন লিং লিং, হারকিউলিস অথবা শার্লক এগুলো ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মানুষদের কাছে রিপোর্ট করে। তখন এই ইন্টেলিজেন্ট কর্মকর্তা সাধারণ ভাষা, গ্রাফিক্স ইত্যাদি ব্যবহার করেই তা জানাতে পারে– যা আমরাও বুঝতে পারবো। ইন্টেলিজেন্ট সবাই অবশ্য নিজেদের মধ্যে বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য সিগন্যালেই যোগাযোগ করে। তার মধ্যে অফিসার থেকে শুরু করে রোবট শ্রমিক, যন্ত্রপাতি সবাই পড়ে। পরস্পর সেই নেটওয়ার্ক লুপে যুক্ত থেকে এরাই চালিয়ে যাচ্ছে কারখানার কর্মযজ্ঞ। নিয়মিত ব্যবস্থাপনা সভায় কিন্তু এই কর্মযজ্ঞের যার যার একটি ভাষ্য নানা কর্মকর্তার মুখেই শোনা যায়, কারণ তখন সবকিছুর একটি খতিয়ান নেয়ার পালা। এতে ব্যবস্থাপনার মানুষ আর কর্মযজ্ঞের ইন্টেলিজেন্ট কর্মকর্তারা প্রায় একই ভাবে মুখর হয়ে ওঠে।

লিং লিং: 'নতুন যে টম্যাটোর চালানটি এসেছে তার গুণগত মান যথেষ্ট না হওয়ায় আমাদের বেশ কয়েকটি সেন্সর তাকে পজিটিভ দিচ্ছেনা, তা বাতিল করে দিচ্ছে।'

মাহবুব: 'টম্যাটোয় সমস্যা কি?'

লিং লিং: 'যে রকম পাকার কথা সে রকমই পেকেছে কিন্তু অনেকগুলো যথেষ্ট দৃঢ় নয়, একটু নরম।'

হারকিউলিস: 'মুশ্‌কিল হলো চাটনিতে যাবে যেগুলো সেগুলোকেও তার 'কাটার' যন্ত্র গ্রহণ করছেনা, বলছে ওগুলো বেশি পাকা।'

মাহবুব: 'না এমন হলে তো চলবেনা, এই টম্যাটো অনেকগুলো আইটেমে যাবে– এ বিশাল চালানের ব্যাপার। আমি ফ্লোর ভিজিটের সময় পুরো চালানটি একটু দেখবো। এখন তোমাকে বলবো কাটার যন্ত্রের গ্রহণে অনিচ্ছাকে ওভার-রাইড করবো কিনা দেখতে।'

শার্লক: 'এ সপ্তাহের রোবট দুর্ঘটনাগুলো বিবেচনা করে আমি একটি প্যাটার্ন সেখানে দেখতে পেয়েছি। রোবটরা ক্রেইন থেকে মাল নামাবার সময় যে আঘাত পাচ্ছে তার মাত্রা একটু বেশি হচ্ছে, ফলে তিনটি রোবট বেশ কয়েক মিনিটের জন্য অচল হয়েছে। আমরা ক্রেইন সিস্টেমটির থেকে আসা তথ্য

বিশ্লেষণ করেছি। তার ধাক্কার চাপটি সামান্য বেশি, কেন বেশি তা বোঝা যাচ্ছেনা। ফোরেনসিক টিমকে জানিয়েছি, তাদের বক্তব্য দেখে জানাবো।'

শান্ত: 'ফোরেনসিক টিম যখন আসবে আমি তাদের সঙ্গে একটু বসতে চাই। রহস্যজনক ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের গতি কমে যাচ্ছে। আমি তাদের দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করাতে চাই। হারকিউলিসকে সমস্যাগুলোর একটি স্পষ্ট গ্রাফিক্স তৈরি করতে হবে, যাতে ব্যাপারগুলো আমি সহজে বোঝাতে পারি তাদেরকে।'

লিং লিং: 'আমার মনে হয় ওদেরকে আরো একটি জিনিসের কথা বলা উচিত। কাঁচামালে কয়েকটা গুদামে আর্দ্রতায় খুব সূক্ষ্ম একটি উঠানামা হচ্ছে। গুদাম-ইন্টেলিজেন্ট তার কূলকিনারা করতে পারছেনা। এত সূক্ষ্ম ওঠানামা যে তাতে ওখানকার সব্জিগুলোর ওপর কোন প্রভাব পড়ছেনা। তবে এটি না থাকাই ভাল।'

শান্ত: 'তা হলে হারকিউলিস তুমি এরও একটি গ্রাফিক্স তৈরি করবে।'

ফোরেনসিক যে টিমের কথা বলা হলো এটি ইন্টেলিজেন্ট সহকারীসহ দু'জন মানুষ ইঞ্জিনিয়ারের টিম। ওদেরকে শুধু মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় বলে স্থায়ী ভাবে এ কারখানায় রাখা হয়নি, বরং একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী থেকে ভাড়া করা হয়। এই যে বৈঠকে মানুষ ব্যবস্থাপক এবং ইন্টেলিজেন্ট কর্মকর্তাদের আলাপ তা এমন স্বাভাবিক ভাবে হয় যে কে যে কোনটি সে কথা ভাবার অবকাশ হয়না। তবে এরকম পরিস্থিতিতেই মানুষ ও ইন্টেলিজেন্টের মধ্যে সম্পর্কটি নিয়ে মানুষরা একটু সচেতন হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ের ইন্টেলিজেন্টদেরকে মানুষের মত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও আবেগ দেখাবার মত করেই গড়ে তোলা হয়। তারপরও কথার তোড়ের মধ্যে ইন্টেলিজেন্টের পার্থক্যগুলো ধরা পড়ে যায়। অনেক সময় সহজ তথ্যকে তারা বেশি সূক্ষ্ম ভাবে দেখায়; মানুষের মধ্যে কারিগরি বুদ্ধির সঙ্গে মেশানো যে একটি সহজিয়া বুদ্ধি থাকে সেই মিশ্রণটি ইন্টেলিজেন্টদের মধ্যে দেখা যায়না। দিনের পর দিন কারখানার ব্যস্ত কথাবার্তার ভেতরে লক্ষ্য করা এই অসামঞ্জস্যগুলো শান্তকে মানুষে-ইন্টেলিজেন্টের সম্পর্কের বিষয়টিতে আলাদাভাবে উৎসাহিত করে

তুলেছে। এখন তো কারখানার বাইরে এ নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা তার বড় আনন্দ।

কারখানার মজার কর্মী হলো অনেকটা মানুষের মত দেখতে ইন্টেলিজেন্ট রোবট শ্রমিকরা। যখন ওরা ফ্লোরে এদিক ওদিক গিয়ে কাজ করে তখন মানুষের মতই মনে হয়। এই চলাচলের সময় তাদেরকে অনেক কিছুর থেকে সাবধান হয়ে চলতে হয়– চলন্ত আরেক রোবটের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে, আশ পাশে যন্ত্রপাতি, ক্রেইন, ট্রলি ইত্যাদির সঙ্গেও সংঘর্ষ হতে পারে, যা আরো মারাত্মক। কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতাটি জেনে নেবার জন্য আগে ভাগে কাছাকাছি সব কিছু থেকে দৃষ্টি সংকেত, শব্দ সংকেত পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে– তাই দুর্ঘটনা মোটেই ঘটেনা। রোবটের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে সাধারণত কাজগুলো খুব নিয়ম বাঁধা কাজ– কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট হওয়াতে নিয়মের বাইরে কিছু ঘটে গেলে তার প্রতিক্রিয়ায় ওই ব্যতিক্রমটি শুধরে নিতে পারে। যেমন হাতে ধরা জিনিসটি পড়ে গেলো, সেটি তুলে নিতে পারে। কোন জিনিসকে একেবারে ঠিক জায়গায় না পেলে সেটি একটু খুঁজে টেনে নিতে পারে। এসব আগেকার দিনের রোবট শ্রমিকরা পারতোনা।

কারখানার ফ্লোরের নিরাপত্তাটি এত ভাল যে শান্ত, মাহবুব কী ফোরেনসিক টিমের কেউ যখন ওখানে কোন কিছু পরীক্ষা করতে যান, বা ওখানকার মোটমাট অবস্থাটি বুঝতে যান তখন এত কিছু যন্ত্রপাতি ও রোবটের আনাগোনার মধ্যেও সব সময় নিরাপদ থাকেন। এর কারণ মানুষের উপস্থিতি সব কিছুর সঙ্গে থাকা সেন্সর দূর থাকতেই বুঝতে পারে, এবং তখন অনেক বাড়তি সতর্কতা তাদের চলাচল-নড়াচড়ায় সৃষ্টি হয়।

একাধিক পরিচয়

একটি বিশাল কারখানা চালাচ্ছেন শান্ত, মাত্র কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি সম্পন্ন আরো অনেক কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক, রোবট শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির সাহায্য তিনি পাচ্ছেন। কিন্তু এটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। সৃষ্টিশীল অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই এখন পেশার বাইরে আরো গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় থাকে। কোন একটি চাকরিতে বা পেশায় আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে থাকতে অনেকেই চায়না। আধুনিক অর্থনীতিতে অনেকে তো কোন পেশাতেই থাকেন

না, বা থাকতে পারেন না। কিন্তু সৌখিন আনন্দের কাজ হিসেবে সেবামূলক কাজ, গবেষণার কাজ অনেকে বেছে নেন। পূর্ণকালীন চাকরির সুযোগ খুবই বিরল; যাদের সে সুযোগ হয় তাঁদের প্রায় সবাই ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিতে উচ্চ শিক্ষিত এবং ইন্টেলিজেন্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে পারদর্শী। শান্ত ও সোফিয়া দম্পতি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের দুজনেরই বেশ পাকাপোক্ত চাকরি রয়েছে ব্যবস্থাপক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে। কিন্তু শান্তর ভিন্ন একটি পরিচয় ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির অগ্রগতি নিয়ে একজন চিন্তাবিদ হিসেবে।

শান্তর সঙ্গে ইন্টেলিজেন্ট বিজ্ঞানের সম্পর্ক হয়েছে ছাত্র জীবন থেকে। কিন্তু কোন ইন্টেলিজেন্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাহচর্য গড়ে ওঠেছিলো আপন জন তাদের পরিবারে আসার পর। আপন জন তখন থেকেই পরিবারের সদস্যের মত, ছেলে মেয়েরা তার সাহচর্যে বড় হয়েছে। শান্ত গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছেন এসব। একদিকে তিনি যেমন তার সঙ্গে জড়িত একেবারেই ঘরের মানুষ হিসেবে, অন্যদিকে তিনি একটু তার থেকে আলাদা হয়ে নিজেকে একজন পর্যবেক্ষক, নৈর্ব্যক্তিক গবেষক হিসেবে দেখেছেন এবং এ নিয়ে অন্যদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন। ইতোমধ্যে আপন জন তার কর্তব্য করে চলেছে। বেশ ক'দিন শান্তর রাতে ঘুম হচ্ছেনা। এটি দিনে তার কাজে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিলো। আপন জনকে সমস্যাটি জানিয়েছিলেন তিনি। সে নীরবে সমস্যার সমাধান করেছে– প্রথমে নিজের টোটকা সব উপায় প্রয়োগ করেছে, পরে এ নিয়ে পারিবারিক ইন্টেলিজেন্ট মেডিক্যাল 'বোর্ডের' মতামত নিয়েছে– ওই বোর্ডের কাছে শান্তর সব মেডিক্যাল তথ্য আছে, ডিএনএ প্রফাইল সহ। মজার ব্যাপার হলো আপন জনের টোটকা সমাধানটি বোর্ডের পরামর্শের থেকে খুব ভিন্ন ছিলনা।

শান্তর গবেষণা জগতের সহকারী হিসেবে অবশ্য আরেকজন অন্তরঙ্গ ইন্টেলিজেন্ট আছে– রচনা। সে একাধারে একজন ব্যক্তিগত সহকারীর এবং গবেষণা সহকারীর কাজ করে। কারখানায় তাঁর ব্যস্ত দিনের মধ্যেও রচনা তাঁর সখের গবেষণাকে ধরে রাখে। যত আইডিয়া শান্তর মাথায় আসে তা শিগ্গির রচনার কাছে চলে যায়, শান্ত তাকে জানিয়ে রাখেন। ডিজিট্যাল চেহারায় একজন তরুণী বিতার্কিকের মত দেখতে রচনার ভাষা, লজিক, এবং বিজ্ঞানের ওপর ভালই দখল। শান্ত ইন্টেলিজেন্ট সৃষ্টির বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায়

রচনাকে ওভাবেই গড়ে তুলেছেন। বিশাল তথ্য ভাণ্ডারের মাঠে একটি আইডিয়াকে লজিকের বলের মত শান্তর সঙ্গে রচনা এমন ভাবে লোফালুফি করতে পারে যে শান্তর চিন্তা এগুতে খুব সুবিধা হয়। শান্তর এসব চিন্তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পায় তাঁর লেখালেখিতে যা তাঁর ব্লগে এবং মানুষ-ইন্টেলিজেন্টের সম্পর্কের নানা আন্তর্জাতিক ফোরামের প্লাটফর্মে প্রকাশে।

লেখালেখিগুলো অবশ্য এক ভাবে দেখলে শান্ত আর রচনার যৌথ প্রয়াস। ভাষার অনেকখানি রচনার, তাতে লেখার বিষয়বস্তু ও স্টাইলটি শান্তরই। শান্ত আইডিয়ার কাঠামোটি তৈরি করে দিলে প্রথম খসড়াটি রচনাই তৈরি করে। তড়িৎ গতিতে যে কোন তথ্য বা রেফারেন্স হাজির করে যুক্তিগুলো গড়তে পারে বলে এ কাজে রচনার সুবিধা অনেক– শান্তকে যদি করতে হতো তাকে নিজের হাতে তবে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করতে হতো, অনেক সময় লাগতো। খসড়াটি শান্ত সম্পাদনা করে দিলে আবার রচনার হাতে যায়, দ্বিতীয় খসড়া হিসেবে ফেরৎ আসার জন্য। এভাবে কয়েকবার হাত বদল করে চূড়ান্ত লেখাটি শান্তই লেখে। শান্তর সম্পাদনা যতবার দেখেছে প্রত্যেকবার রচনার লেখার স্টাইল আরেকটু বেশি শান্তর মত হয়েছে, নতুন লেখায়। তাছাড়া এভাবে রচনা ক্রমেই আয়ত্ব করে ফেলতে পেরেছে শান্ত কী চান, কেমন চান সব কিছু। ওভাবে লেখার গঠনে শান্তর হস্তক্ষেপ করার জায়গা ক্রমে কমে গেছে।

বিজ্ঞান সাহিত্যে আস্বাদন শান্তর প্রাণ। ছোটবেলা থেকে তিনি এটি উপভোগ করেছেন, বলতে গেলে তখন থেকেই এর মধ্যে ডুবে থাকাটিই তিনি পছন্দ করেন। সেই চর্চাটিকেই তিনি নিজের অবদান রাখার ক্ষেত্রেও নিয়ে গেছেন। বই এবং পডকাস্ট এ কাজে তাঁর সঙ্গী। নিত্য নতুন যত লেখা নেটওয়ার্ক জুড়ে নানা প্লাটফরমে প্রকাশিত হচ্ছে তাও। সুযোগ পেলেই বই পড়েন, লেখা পড়েন, পডকাস্ট শোনেন। এ কাজেও তাঁর সহযোগী রচনা। তিনি যে বই আর পডকাস্টের লাইব্রেরী করে রেখেছেন তা রচনার কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য নিয়েই। রচনা তার পুরো খতিয়ান রাখে, তাই পরামর্শ দিতে পারে কখন কোন্‌টিতে যেতে হবে। শান্তকে কোন বই বা পডকাস্টের কোন অংশ চাওয়া মাত্র খুঁজে বের করে দিতে পারে তো বটেই, সময় বাঁচাতে রচনা আরো একটি কাজ করে। শান্ত চাইলে বইয়ের বা পডকাস্টের একটি সার-সংক্ষেপ চট্‌ করে তৈরি করে দেয়, শান্তর যে ভাবে সুবিধা হবে সেভাবেই।

ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির উন্নয়ন ইতিহাস এবং এর ভবিষ্যদ্বাণী শান্তর বিশেষ এলাকা। সেটি তাঁকে নিয়ে গেছে মস্তিষ্ক বিদ্যায়, চেতনার বিজ্ঞানে, এমনকি চেতনার দর্শনে। ওই জায়গাটিতে সোফিয়ার আনন্দের সঙ্গে শান্তর আনন্দ মিলে যায়। স্তন্যপায়ী মস্তিষ্ক, বিশেষ করে শিম্পাঞ্জি ওরাংউটানের মত নর-বানরের মস্তিষ্ক কী ভাবে তাদের আচরণে ও চিন্তায় মানব-সদৃশ, সোফিয়া তার একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক। এখানটাতে চমকপ্রদ কিছু পেলে শান্ত অবশ্যই তা সোফিয়ার সঙ্গে শেয়ার করেন; অনেক সময় রচনাকে বলেন ওর একটি সার-সংক্ষেপ প্রথমে সোফিয়া বা তাপসীকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। হাওয়াইতে ছেলে রাহিলের সঙ্গেও শান্ত তাঁর বিজ্ঞান সাহিত্যের এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেন। আজকাল রাহিল বিষয়টিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় কালচার নিয়ে তার চর্চার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে।

সোফিয়া এখনো সাগরে– সেখানে নানা ঘটনা ঘটছে, দৃশ্যপট বদলাচ্ছে। শান্ত নিয়ামত যোগাযোগ রাখেন, আর সুযোগ পেলেই পরিবারের সবাইকে ভার্চুয়ালি একত্র করার কাজটা ভুলেন না। চট্টগ্রামের সংসারটি আপাতত বাপ-বেটিকে নিয়ে। ময়নার কাজ, ময়নার আর্টের একজন ভাল সমজদার হবার চেষ্টা শান্তর সব সময় আছে। এখন রোজ এ নিয়ে মেয়ের সঙ্গে একটু আড্ডা হওয়া চাই। ওতেও যে রচনা গায়ে পড়ে অংশ নেয়না তা নয়, কারণ তার স্বভাবই হলো পণ্ডিতি করা। ছেলে মেয়েরা বাবা মার দ্বারা প্রভাবিত হন এটি আমরা জানি, কিন্তু ময়নার ক্ষেত্রে এটি ঘটেছে উল্‌টো। ময়না বাবা-মা-ভাই সবাইকে প্রভাবিত করেছে। পরিবারে এই একজন সদস্য আছে যে সবকিছুকে একটু অন্যভাবে দেখে– আর্টিস্টের চোখে দেখে। তার মানে চর্মচক্ষে যা দেখছে তা শুধু নয় তার বিকল্প রূপ কী হতে পারে মনে মনে সেটিও দেখে। চোখের সামনের বাস্তবতার বাইরে অন্য এক বাস্তবতায় তাকে নিয়ে যেতে চায়; ওই বাস্তবতা তার সৃজনশীল মন সৃষ্টি করেছে। এটি বাকিদের কাছে সহজাত ভাবে আসেনি, অনেকটাই ময়নার প্রভাবে এসেছে, যদিও পরিবারে সে সবার ছোট।

শান্ত ইন্টেলিজেন্ট সফ্‌টওয়্যার গড়ার পুরোপুরি বিশেষজ্ঞ না হলেও তাঁর এ নিয়ে ভাল ধারণা আছে। এক সময় লক্ষ্য করেছেন যে সফ্‌টওয়্যার গড়ে তোলার প্রাথমিক ফ্লো-ডায়াগ্রামে কেমন যেন ময়নার প্রভাবে একটি শৈল্পিক

ছোঁয়া আসছে। মাহবুব আর নঈমার সঙ্গে কারখানা অফিসের আলোচনায় ইদানীং মনে হচ্ছে নেটওয়ার্কের যেই একান্ত লুপে তাদের কারখানাটি আছে তার সিস্টেম সফ্‌টওয়্যারকে আর একটু উন্নত ও স্মার্ট করা দরকার। উৎপাদন মাত্রা আরো একটু বাড়াবার তাগিদ আছে। সফ্‌টওয়্যারের মূল জায়গায় হাত না দিয়ে সেটি করার কোন সহজ পথ দেখতে পাচ্ছেন না। এ নিয়ে গ্রীন ফুড্‌স কোম্পানীর সিস্টেম এনালিস্টদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবে তাতে শান্তরও একটি বড় ভূমিকা থাকবে।

কারখানায় ছুটি

নেহাৎ দৈব দুর্বিপাক না হলে পুরো কারখানায় ছুটির কথা ভাবা যায়না। কারখানা তো প্রধানত তার ইন্টেলিজেন্টদের নিয়ে, যাদের ওই অর্থে ছুটি প্রয়োজন হয়না। কিছুদিন আগেও কাঁচামালের তত্ত্বাবধান এবং কারখানার নানা সেকশনের তত্ত্বাবধানের কাজে পারদর্শী মানুষ কুশলীরা থাকতেন। তাছাড়া কোন কোন অতি জটিল যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণেও মানুষ থাকতেন। সব মিলে তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম হতোনা। কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির দ্রুত উন্নতির ফলে এখন কারখানার ফ্লোরে কাজকরা মানুষ নেই বলেই চলে– শুধু ব্যবস্থাপনার মধ্যে আছে। মানুষদের জন্যই শুধু ছুটি প্রয়োজন হয়– নিয়মিত ছুটি সপ্তায় অন্তত দুদিন, অনেক ক্ষেত্রে তিন দিন এমনকি চার দিন। তার ওপর বছরের নানা সময় দীর্ঘ ছুটি ইচ্ছে মত নিতে পারে। দিনের পর দিন কাজ করতে থাকাটি এখন মানুষের ধাতে নেই। অসংখ্য মানুষের যেখানে চাকরির সুযোগই নেই সেখানে বহু মানুষ নিজেকে বিভিন্ন ধরনের কাজের উপযুক্ত করে রাখেন শুধু খণ্ডকালীন চাকরির জন্য– নিয়মিত মানুষটি যখন ছুটিতে থাকেন। ওটি যে খুব প্রয়োজন তা হয়তো নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠান চালাবার আনন্দটিই আলাদা।

শান্ত শিগ্‌গির বেশ কিছুদিনের জন্য পুরো পরিবারের সঙ্গে ছুটিতে থাকবেন। তখন দায়িত্বে থাকবেন প্রডাকশন ম্যানেজার মাহবুব। অর্থাৎ তিনি তাঁর সুনির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থাপনার কাজের সঙ্গে ফ্যাক্টরির সার্বিক দায়িত্বেও থাকবেন। ওসময় চীফ একাউন্টেন্ট নঈমার দায়িত্বও একটু বাড়বে মাহবুবকে অর্থব্যবস্থাপনার বিষয়েও সহায়তা দিতে, যা সার্বিক ব্যবস্থাপনার অংশ। এ সময় একজন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপক কাজ করতে আসবেন সবাইকে সহায়তা

দেয়ার জন্য। আসলে এমনি অতিরিক্ত ব্যবস্থাপক হিসেবে খণ্ডকালীন কাজের জন্য আরো অনেকে তৈরি থাকেন। কাজেই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত একাধিক কর্মকর্তাও যদি ছুটিতে যান, খুব বেশি অসুবিধা হয়না। এর নিয়মিত কাজটি উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নতুন যে কেউ অল্প সময়ের জন্য এসেও করতে পারেন। তবে যাঁরা বহুদিন ধরে একই কাজে আছেন তাঁদের পক্ষে কিছু দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ এখানে নেবার সুযোগ ঘটে যা অন্যদের ঘটেনা– নতুন পরিকল্পনা, বড় পরিবর্তন ইত্যাদি। যেমন শান্ত বুঝতে পারছেন যে এ কারখানার নিজস্ব লুপে সফ্‌টওয়্যারে কিছু সংশোধন প্রয়োজন; একটানা এখানে থাকার ফলেই বুঝেছেন। এদিক থেকে একটানা একটি পেশায় থাকা অনেকে পছন্দ করেন।

কারখানার দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞ কিন্তু মানুষকে নিয়ে নয়, বরং ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি সমৃদ্ধ নানা পর্যায়ের ডিভাইস, রোবট, ও যন্ত্রকে নিয়ে। তাদের ছুটির দরকার হয়না সেই অর্থে, বড় জোর কিছু ঘন্টার বিশ্রাম দরকার হয় কখনো কখনো। তবে এর অনেক অংশে এক ধরনের অবক্ষয় ধীরে ধীরে হতে থাকে। ইন্টেলিজেন্ট কর্মীর এক এক অংশে এক এক রকমে তা হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি সময়ে গিয়ে এক ধরনের শাট ডাউন ঘটতে পারে– তখন তাকে মেরামত করতে হয়, অংশ বিশেষ পাল্‌টে দিতে হয়, হয়তো পুরোটাই। এটি সারাক্ষণ ঘটেই চলেছে। সবকিছুর সব অংশের সঙ্গে সূক্ষ্ম বহু সেন্সর লাগানো আছে যা ওই ক্ষয়, বা ওখানকার সৃষ্ট কোন সমস্যা উদ্ঘাটন করে জানাতে পারে। এই অংশের পরিবেশেও কোন পরিমাপে সামান্য অস্বাভাবিকতা দেখা গেলেও– যেমন উত্তাপ, চাপ, ঘর্ষণ, এসিডিটি– তাও সেন্সর উদ্ঘাটন করতে পারে। যদি তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় সেটি নেবার জন্য সেই খবরটিও যথাস্থানে দিয়ে দেয়। সবই অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কের কল্যাণে।

দেখাই যাচ্ছে কারখানার পরিবেশে সব কাজ করছে ইন্টেলিজেন্ট, আর সব নিয়ন্ত্রণও করছে ইন্টেলিজেন্ট। কারখানার থেকে উচ্চতর পর্যায়ের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা প্রশাসনের জায়গায় গেলে– যেমন কোম্পানীর প্রধান অফিস, ফাইন্যান্স অফিস, ব্যাংক– সেখানে অবশ্য মানুষের খবরদারী ও বিবেচনা আর একটু বেশি দরকার হয়। কাজেই কোম্পানীতে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শেষ অবধি মানুষের ডাক পড়ে। কিন্তু

কারখানায় যেমন, তেমনি অন্যান্য বহু রকম প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ কাজ দ্রুত ইন্টেলিজেন্টরা নিয়ে নিয়েছে। মানুষ তাদেরকে এতটাই উন্নত করতে পেরেছে যে এক সময়ের অকল্পনীয় বিষয়গুলোও ওরা করতে পারছে। কারখানাকে তো নির্বিঘ্ন ভাবে যেন একটি দম দেয়া কলের মত চালাচ্ছে। সেটি এক দিক দিয়ে সহজ সমস্যা।

কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি এখন ক্রমাগত কঠিন সমস্যার সমাধানের দিকেও যাচ্ছে। সেজন্যই শান্তর মত অনেকেই এর অগ্রগতির ভবিষ্যতটিকে তাঁদের নিয়মিত গবেষণা-চিন্তার মধ্যে আনছিলেন। বিজ্ঞান গবেষণা, রাষ্ট্র পরিচালনা, সৃজনশীল সাহিত্য-আর্ট সৃষ্টি ইত্যাদির মত বিষয়ও ইন্টেলিজেন্ট ক্রমাগত ভাল করছে, এখানেও মানুষের তুলনায় তাদের অনেক বেশি সক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রবণতাটি আমাদেরকে কোন সংকট মুহূর্তে নিয়ে যাচ্ছেনা তো, যখন ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি মনুষ্য বুদ্ধির থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যাবে? না, সে রকম কিছু এখনো হয়নি, হবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছেনা। এখনো ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিকে মানুষই সৃষ্টি করছে মানুষের প্রয়োজনে, তার স্বাধীন হবার কোন উপায় নেই। কিন্তু চিন্তাগুলো অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। শান্তর মতো অনেকেই ভাবছেন এ নিয়ে।

ইতোমধ্যে ব্যবস্থাপক শান্তকে নিজেদের নেটওয়ার্কগুলোর কথা ভাবতে হচ্ছে। সেটিও কম চমকপ্রদ কাজ নয়। তাঁর কারখানার নেটওয়ার্ক গ্রীন ফুড্স কোম্পানীর নিজস্ব বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই এটি এর বহু কারখানার কাঁচামাল, উৎপাদন, চাহিদা ইত্যাদি সমন্বয় করে কোম্পানীর জন্য সর্বোত্তম অবস্থাটি তৈরি করে রাখতে পারছে। কোম্পানীর নেটওয়ার্কও আবার নানা দেশের ও পুরো অঞ্চলের নেটওয়ার্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। এক একটি খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদনকে অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সর্বোত্তম অবস্থায় রাখাটি খুবই জরুরী, আর তার অনেকটাই ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করে দিচ্ছে। এসবের ফলশ্রুতি শান্তকেও জানতে হয়, বুঝতে হয়।

সব কিছু যন্ত্রের থেকে আসছে বটে, কিন্তু মানুষের জীবন তাই বলে যান্ত্রিক হয়ে পড়েনি। মানুষের পছন্দের জন্যই একটি খাবার আর একটি খাবারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। নানা কোম্পানীর সবগুলো খাবার নানা আউটলেটে সব মানুষের হাতের কাছেই চলে যাচ্ছে। বাহারি দোকানে গিয়ে খাবার কিনতে

অনেকে পছন্দ করে। আবার মানাজির পরিবারের মত অনেকে আপন জনের মত দায়িত্বশীল ইন্টেলিজেন্টকে বাজার করার দায়িত্ব ডিজিটালি করার জন্য দিয়েছে। এর কোনটাতেই পছন্দ, তৃপ্তি, সহজসাধ্যতা কিছুই ব্যাহত হচ্ছেনা। যুগে যুগে প্রযুক্তি অনেক বদলিয়েছে। কিন্তু মানুষের রসনা তো বদলায়নি, খাবার টেবিলে বসে পরিবারের সবার খুনসুটি করাটাও বদলায়নি।

বিশ্ব সমিতি

শান্তর সদস্য পদ লাভ

সৌখিন বিজ্ঞানী হিসেবে যে বিষয়ে শান্ত মাতোয়ারা ছিলেন সেটি হলো ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির প্রকৃতিটি ঠিক মত বোঝার চেষ্টা। আর অতীত থেকে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির বিকাশের ইতিহাস দেখে এর ভবিষ্যৎ নিয়ে কী কী চিন্তা বিজ্ঞানীদের মধ্যে চালু আছে তার চর্চা। শান্তর ছাত্রজীবন, যৌবন যখন কেটেছে তখন তরুণদের মধ্যে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিয়ে ভাবনা খুব স্বাভাবিক ছিল– যার জের এখনো আছে। নিজে যে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সৃষ্টিতে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে ওঠেছিলেন তা কিন্তু নয়, যদিও একজন ডিজিট্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে ওই বিদ্যা শান্তর চর্চার ভেতরেই ছিল। তবে বলা যায় অন্য অনেক তরুণ-তরুণীর মত এতে শান্তর উৎসাহটা অনেকটা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মত– নিজের উদ্যোগে, নিজের আনন্দে। সেরকম অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগকে কাছে টেনে নিতে আজকাল বেশ কিছু বিশ্বজোড়া প্লাটফরম রয়েছে উন্নত নেটওয়ার্কের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে। এমনি একটি বড় প্লাটফরম হচ্ছে ‘দুই বুদ্ধি বিশ্ব সমিতি’– সংক্ষেপে এটি ওয়ার্ল্ড সোসাইটি বা ‘বিশ্ব সমিতি’ নামেই পরিচিত।

এই সমিতিটি সৃষ্টি হয়েছে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিয়ে যে অনেক মানুষ চিন্তা ভাবনা করেন তাঁদেরকে একটি ফোরাম দিতে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা ও গবেষকরা, এবং লেখা বা পডকাষ্টের মাধ্যমে ও অন্যান্য মাধ্যমে এর জনপ্রিয় চর্চায় যাঁরা অবদান রাখেন তাঁরা এ সমিতির দ্বারা খুব উপকৃত হন। এর কাজের

মাধ্যমে এ সম্পর্কে সর্বশেষ গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার হদিশ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি নিজেদের মধ্যে নানা ভাবে যোগাযোগও রক্ষা করা যায়– তা তিনি বিশ্বের যেই জায়গাতেই থাকুন না কেন। ছাত্রসহ সাধারণভাবে যে অসংখ্য মানুষের এ নিয়ে কৌতুহল আছে তাঁদের জন্যও এই সমিতি উন্মুক্ত। সবাই এর নেটওয়ার্কে ঢুকে সহজে সমিতির সকল উদ্যোগে অংশ নিতে পারেন, প্রত্যেকটির সঙ্গে তাঁদের মন্তব্য যোগ করতে পারেন। তাছাড়া এ নিয়ে নানা প্রতিযোগিতায়, বিতর্কে যে কারো নির্বাচিত হবার সুযোগ আছে, তার জন্য যে কেউ আবেদন করতে পারে। তবে বিশ্ব সমিতির আর একটি স্তর আছে, সেখানে জায়গা পেতে হয় এর আনুষ্ঠানিক সদস্য পদের মাধ্যমে। যাঁরা এই বিষয়ে নিজ নিজ বিভিন্ন দিক থেকে একটানা অনেক দিন কাজ করে এখানে তাঁদের নির্বাচিত বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পান, তাঁরাই শুধু সদস্য পদের জন্য বিবেচিত হন। গবেষণা, নতুন আইডিয়া, জনপ্রিয় করণ, এ নিয়ে সৃষ্টিশীল অন্যান্য কাজ ইত্যাদির জন্য বিশ্বময় এরকম বেশ কিছু সদস্য নির্বাচিত হন। উৎসাহী মহলে এই সদস্যপদকে সম্মানজনক একটি সুযোগ হিসেবে গণ্য করা হয়।

শান্ত সেই ছাত্রজীবন থেকে বিশ্ব সমিতির সঙ্গে যুক্ত; বলতে গেলে এর মধ্যে বিচরণ করা ও নিজের মন্তব্য দেয়া তাঁর সার্বক্ষণিক আনন্দের একটি অংশ। তাঁর বাকি কাজেরও অনেক উৎসাহ, অনেক আগ্রহের সূত্র খুঁজলেও এই সমিতির মধ্যেই তা পাওয়া যাবে। কিন্তু হঠাৎ আজ এসেছে তাঁর জন্য সেই বহু প্রত্যাশিত খবর। এ বছর দুনিয়ার দেশে দেশে যাদেরকে বিশ্ব সমিতির সদস্যপদ দেয়া হয়েছে তাতে আছে শান্তর নামও। খবরটি জানার পর থেকে মানাজির পরিবারে ও পরিবারের বন্ধুদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেছে। তারা তো জানে শান্তর কাছে এই সদস্যপদের মূল্য কত বেশি। সোফিয়া, রাহিল আর ময়নার সঙ্গেতো তাঁর এ নিয়ে কথা শেষই হচ্ছেনা। এবার শান্তর এই দিকের কাজে তৃপ্তি অনেক বেড়ে যাবে– তিনি সরাসরি সমিতির নানা আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন, নিজের আইডিয়াগুলো এতে উপস্থাপন করতে পারবেন, বিখ্যাত অন্যদের কাছে প্রশ্ন তুলে এর উত্তর আশা করতে পারবেন।

ময়না ও রচনা কিন্তু শুধু এর ফলে শান্তর ভবিষ্যতের কাজ কী হবে তা নিয়ে ভাবলোনা, তারা এই সমিতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে অতীতে শান্ত কী কী করেছেন সেগুলোও তুলে ধরতে চাইলো। মূলত সদস্যপদের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাতে একটি অনলাইন সভারই আয়োজন করলো। এ সভার প্রস্তুতিতে একটি বড় কাজ করে ফেল্‌লো রচনা। এ বিষয়ে শান্তর অতীত অনেক কাজকে প্রতিফলিত করে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করলো। ওই অনলাইন সভায় পরিবারের বেশ কিছু বন্ধু বান্ধবও যোগ দিলো, কারখানা থেকে মাহবুব আর নঈমা তো রইলই। রচনার তথ্যচিত্রটি শান্তর অতীত থেকে এমন সব কাজের খবর দিলো যা ওঁদের অনেকে জানতেননা। শান্তর এই বিষয়ে আগ্রহ জন্মেছিলো ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির একেবারে গোড়ার ইতিহাস সম্পর্কে শান্তর কৌতুহল থেকে। মানুষ কম্পিউটারকে একটি বুদ্ধিমান যন্ত্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল সেই ইতিহাসের শুরুতে। আদি সব কম্পিউটারের ছবি ও কাজ নিয়ে শান্তর রীতিমত একটি সংগ্রহ ছিল। এগুলো স্কুলে থাকার সময়ে তাঁর সখের কথা– এরই ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ওপরও তাঁর সংগ্রহ। এর পরবর্তী অগ্রগতি নিয়ে ছোট ছোট প্রজেক্টে কাজ করার জন্য স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে তিনি 'দুই বুদ্ধি ক্লাব' নামের একটি ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন। কম্পিউটার থেকে ইন্টেলিজেন্ট– সেটি ছিল একটি বড় লাফ। ক্লাবে ওরা তর্কবিতর্ক করতো, বিভিন্ন কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মডেল তৈরি করতো, যেগুলোকে ইন্টেলিজেন্ট যন্ত্র বলা যায়। তর্ক হতো ইন্টেলিজেন্ট বলাটা যুক্তিসম্মত ছিল কিনা। তারও পরে গিয়ে মানুষের ভাষাকে পর্যন্ত ইন্টেলিজেন্টের লজিকের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে এসে কীভাবে তার ভাষা-ব্যবহার মানুষের মতই বুদ্ধিদীপ্ত হলো, এবং সেই বুদ্ধিরই বা প্রকৃতি কী রকম সে সব প্রশ্নও ক্লাবে উঠতো। এই ধারাবাহিকতায় কেমন করে বিশ্ব সমিতিতে শান্তর সক্রিয় ভূমিকা শুরু হলো, তাও এসেছে রচনার তৈরি সেই তথ্যচিত্রে। ওতে আরো আছে বিভিন্ন সময় রচিত এ প্রসঙ্গে শান্তর বিজ্ঞান সাহিত্যের কিছু কিছু নমুনা। ততদিনে তিনি তাঁর কাজকর্মে দুই বুদ্ধির সঙ্গে অর্থাৎ একই সঙ্গে মানুষ ও ইন্টেলিজেন্ট সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে একেবারেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তখন তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আরো ঝুঁকে পড়েছেন দুই বুদ্ধির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবার ক্ষেত্রে।

এ পর্যায়ে মানুষ আর ইন্টেলিজেন্ট সম্পর্ক নিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ছাড়াও, উভয়ের নানা চরিত্র নিয়ে শান্তর সৃজনশীল সাহিত্যও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর সাহিত্যে মানুষ ও ইন্টেলিজেন্টের মধ্যে একটি মসৃণ সম্পর্ককে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। উভয়ের মধ্যে কাজ কারবারে মানুষের কাছ থেকে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করা হয়, ইন্টেলিজেন্টের থেকে কিছুটা অন্য ধরনের। কোন বিষয়ে ইন্টেলিজেন্ট অনেক সূক্ষ্ম তথ্য দিতে পারে, খুবই অল্প সময়ে হিসেব করে বিশ্লেষণ করে তা দিয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে মানুষ সংক্ষেপ কাণ্ডজ্ঞানে এমন কিছু বুঝে ফেলে সিদ্ধান্ত দিতে পারে যা ইন্টেলিজেন্ট পারেনা। সেই পার্থক্য নিয়েই শান্ত কিন্তু তাঁর সাহিত্যে মানব ও ইন্টেলিজেন্ট মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি করেন যারা কোন মৌলিক দিক থেকে একে অপরের থেকে ভিন্ন নয়। তাই শান্তর উপন্যাসে উভয় মনস্তত্ত্বের এই সাধারণ সংযোগের কাহিনীকেই উপজীব্য করা হয়েছে। ওর মধ্য থেকে মাঝে মাঝে উভয়ের অদ্ভুত অসঙ্গতিগুলো ফুঁড়ে বের হয়ে এসে কাহিনীকে ধাক্কা দেয়।

কিন্তু এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তিনি ঠিকই এর মধ্যে মৌলিক মূল নীতির ওপর গুরুত্ব দেন, যাতে মনস্তত্ব শুধু এক পক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য– সেটি মানুষের পক্ষ। মানুষেরই শুধু মস্তিষ্ক ও মন আছে যা ব্যবহার করে মানুষ ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিকে সৃষ্টি করেছে অনেকটা তার সেই নিজের মনের বহিপ্রকাশের আদলে। ইন্টেলিজেন্টের মধ্যে মানুষ নিজেরই এক অতি তুখোড় প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করেছে। সে জন্য দৈনন্দিন সাধারণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় উভয়ের মধ্যে একই রকম মনস্তত্ত্ব লক্ষ্য করা হয় এবং সেই অনুযায়ীই মানুষ ইন্টেলিজেন্টের সঙ্গে কাজ করে; শান্ত নিজেও করেন। তাঁর সাহিত্যেও সেটিই প্রতিফলিত হয়েছে। সদস্য পদ লাভের জন্য ওই অভিনন্দন জানানোর সভায় শান্ত নিজেও তাঁর জীবনের এই নানামুখি সৃষ্টির আনন্দের কথা বল্লেন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে। আনন্দটি তাঁর সারা জীবনের– এখন বিশ্ব সমিতির সদস্য হিসেবে নিজের চিন্তাগুলো সরাসরি অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে এ আনন্দ আরো বেড়ে যাবে বলে আশা করেন।

অন্তর্ভুক্তির বক্তৃতা

বিশ্ব-সমিতির বেশ কিছু অদ্ভুত নিয়ম কানুন রয়েছে। এক একটি সময়ে যাদেরকে এটি সদস্য নির্বাচিত করে সম্মান দিয়েছে তাদের জন্য একেবারে শুরুতেই একটি কর্তব্য ঠিক করে দেয়া হয়েছে। নির্বাচিত হবার ঠিক এক মাস পর তাঁকে প্রাসঙ্গিক কোন একটি বিষয়ে একটি উন্মুক্ত বক্তৃতা দিতে হবে, যা সমিতির নেটওয়ার্কে যে কেউ শুনতে পারবে এবং পূর্ববর্তী সদস্যদের যে কেউ এর ওপর আলোচনা ও মন্তব্য করতে পারবেন। এটিকে বলা হয় 'অন্তর্ভুক্তির বক্তৃতা'– বিশ্ব সমিতির নিজস্ব সভায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উপলক্ষে নিজের চিন্তা ধারাগুলোর একটি ঘোষণা। এই বক্তৃতা তৈরি করা এবং উপস্থাপন করা ছিল শান্তর জন্য একটি অদ্ভুত শিহরণ জাগানো অভিজ্ঞতা। পরিবারের সবাই এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে জানিয়ে রেখেছিলেন এর দিনক্ষণ, যদিও তারা নিজ উদ্যোগেই সেটির দিকে নজর রেখেছিলো– এটি তাদের জন্যও একটি আনন্দের অভিজ্ঞতা। শান্ত বক্তৃতাটির শিরোনাম করেছেন 'দুই বুদ্ধির ভিন্ন আলাপ'। এতে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে যদিও আমরা সব সময় দুই বুদ্ধি নিয়ে আলাপ করি, সেই আলাপটি দুই দিকে প্রতিসাম্যমূলক নয়। এটি মূলত পুরাপুরিই মানুষের থেকে উৎসারিত। তাই আপাত দৃষ্টিতে একে মানুষের সঙ্গে ইন্টেলিজেন্টের আলাপ মনে হলেও শেষ অবধি এটি কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষেরই আলাপ। বক্তৃতার থেকে কিছু অংশ উদ্বৃত করলে বোঝা যাবে তাঁর যুক্তিগুলো কী।

'মানুষ যেভাবে আত্মসচেতন হয়ে মনুষ্যত্ব, মানব জাতি, মানবতা ইত্যাদির শর্তে একটি অভিন্ন পক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে, নিজেদের অনন্য এক ধরনের সত্তাকে নিজেরা অনুভব করতে পারে ইন্টেলিজেন্টরা তা পারেনা। ইন্টেলিজেন্টরা তাই ওই অর্থে জোট বাঁধা একটি পক্ষ নয়। কাজের খাতিরে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্ট একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বটে কিন্তু এদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদা ভাবে গড়ে তোলা, আর অনেকগুলোই একটারই প্রতিলিপি মাত্র। মানুষ যখন ইন্টেলিজেন্টদের গড়ে তোলে তার সফ্‌টওয়ারের মধ্যে 'দুনিয়ার ইন্টেলিজেন্ট এক হও', বা 'সকল ইন্টেলিজেন্ট ভাই ভাই'– এমন উপলব্ধি দিয়ে দেয়ার কোন কারণ থাকেনা, সামনেও থাকবে বলে মনে হয়না। কারণ ইন্টেলিজেন্ট শেষ পর্যন্ত একটি কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার মাত্র, তার মধ্যে কোন ধরনের 'উপলব্ধি' সৃষ্টির কোন

সুযোগ নেই। কাজেই একজন মানুষের সঙ্গে একটি ইন্টেলিজেন্টের কথা বলার সময় বা ক্রিয়া-বিক্রিয়ার সময় মানুষটি যেখানে তার মতো অন্য মানুষদের হয়েও কথা বলতে পারে, দুনিয়ার সব মানুষের হয়েও বলতে পারে; প্রত্যেক ইন্টেলিজেন্ট সেখানে শুধু নিজের কথা বলতে পারে, যেভাবে তাকে তৈরি করা হয়েছে সেভাবে। ওর মধ্যে অন্য ইন্টেলিজেন্টের কথা থাকলেও তাও নিজের কথাই, অন্য ইন্টেলিজেন্ট তার মধ্যে কোন রকম বোধ সঞ্চারিত করেনি। ইন্টেলিজেন্ট অসংখ্য তথ্য সঞ্চয় করে সেগুলোর মধ্যে লজিক দেখে প্যাটার্ন আবিষ্কার করে এবং এই ভাবে অনেক দ্রুত অনেক গভীরের বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু এইখানে বাহাদুরিটি লজিকের, বোধের নয়। আলাপটি তাই মূলত প্রতিসম নয়– মানুষের আছে বোধ, ইন্টেলিজেন্টের আছে মানুষ থেকে পাওয়া লজিক– হাজারো গুণে বিবর্ধিত ও দ্রুত কার্যশীল।

ইন্টেলিজেন্টের প্রতি সংবেদনশীলতাটি মানুষের নিজের; তাকে মানুষের মত ধরে নিয়েই আলাপ করছি, দেখাচ্ছি তার প্রতি সংবেদনশীলতা, করছিনা তার প্রতি রূঢ় আচরণ, যদিও জানি যে এই আচরণে তার 'মনে' আঘাত লাগার কোন সুযোগ নেই। সে রকম কিছু হয়ে গেলে 'সরি' বলি নিজে অনুতপ্ত হই বলে। 'না না কিছুই হয়নি' এমন উত্তর তার আছে পাব এমন আশা করি, যদিও জানি সে কথাটা বুঝে বলেনি, আঘাতও পায়নি। এক সময় তাকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বল্‌লেও এখন ইন্টেলিজেন্ট বলি। তার সামনে মেশিন লার্নিং না বলে ইন্টেলিজেন্স লার্নিং বলি। দিন দিন আমরাই ওদের প্রতি সংবেদনশীল হচ্ছি, বেশি মেলামেশার কারণে।

মানুষের আকাঙ্খাটি গোড়া থেকে এমনিই ছিল– যন্ত্রকে মানুষের মতই বুদ্ধি দেয়া, ভাষা দেয়া, এমনকি বোধশক্তি ও কাণ্ডজ্ঞান দেয়া। তবে তার বাস্তবায়ন সহজ হয়নি, শেষেরটুকু খুব সম্ভব কোনদিনই বাস্তবায়িত হবেনা। ডিজিট্যাল কম্পিউটারের ধারণা যেই বিজ্ঞানীর কাছে থেকে প্রথম এসেছিলো সেই এ্যালেন তুরিং একটি পরীক্ষার কথা বলেছিলেন যার মাধ্যমে মানুষ আর কম্পিউটারকে আলাদা করা যাবে– তুরিং টেস্ট। আমি আড়াল থেকে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলে যদি তার উত্তর কম্পিউটার অথবা মানুষ দু'জনের যে কারো কাছ থেকে আসে এবং আমি বুঝতে না পারি সেটি কে দিয়েছে, তা হলে ওই কম্পিউটার আর মানুষে কোন পার্থক্য নেই বলে ধরে নিতে পারি। তুরিং যখন এমন দাবি

করছেন তখন ডিজিট্যাল কম্পিউটার বাস্তবে তৈরিই হয়নি। কিন্তু কম্পিউটারের ক্রমাগত উন্নয়ন তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে গেছে যে অতীতের তথ্য এবং বিজ্ঞানের নিয়মের ভিত্তিতে একটি সফ্টওয়্যার মডেল তৈরি করলে সেই মডেল আগামী ১০০ বছর জলবায়ু পরিবর্তন কখন কী রূপ পাবে তা বলে দিতে পারে। যৌক্তিক নির্ণয় করার এতই ক্ষমতা এর!

এখানে মডেলটিকে মানুষ প্রোগ্রাম করেছে। এটি হিসেব করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, কিন্তু স্বাধীন চিন্তা করতে পারেনা। অথচ মানুষের আকাঙ্খা তো চিন্তাশীল যন্ত্র সৃষ্টি– অবশেষে তার প্রচেষ্টা এনেছে ইন্টেলিজেন্টকে যেটি বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সেই বুদ্ধিকে এখন চেষ্টা করা হচ্ছে চিন্তাশীল বুদ্ধিতে রূপ দিতে। মাত্র কয়েক বছর বয়সী মানব শিশুও দু'একবার একটি মুখ দেখলে আবার দেখামাত্র তাকে চিনে নিতে পারে তার মস্তিষ্কের নিউরোন জালের কাজের কারণে। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির মধ্যে চিন্তার ভাব সৃষ্টির জন্য ওই নিউরোন জালের কিছুটা আদল তার সফ্টওয়্যারে আনার চেষ্টা করা হলো।

ইন্টেলিজেন্টের লজিকের এক একটি উপাদানকে নিউরোনের মত নিয়ে অনেক সংখ্যায় তাদের একটি জালের মত স্তরে স্তরে তৈরি করা হলো, মস্তিষ্কের নিউরোন জালের অনুকরণে– নিউরাল নেটওয়ার্ক। তাকে এখন ধরা যাক কারো চেহারা দেখিয়ে ট্রেনিং দেয়া যায়। চেহারাটি প্রত্যেক বিন্দুর সঠিক বিন্যাস হিসেবে মেমোরিতে থাকে। এখন যে মানুষকে মেমোরির ওই মানুষ বলে মনে করা হচ্ছে তার চেহারার প্রতি বিন্দুর জন্য লজিক সিগ্ন্যাল একটি নিউরোনে ইনপুট হিসেবে গিয়ে তার আউটপুট আবার কোনদিকে অন্য আরেকটিতে ইনপুট, এমনি ভাবে যেতে থাকে ইতস্তত রূপে। শেষ আউটপুট হিসেবে তার মান কী হবে সেটি সুনির্দিষ্ট কিছু নয়, গাণিতিক একটি সম্ভাবনার ব্যাপার। প্রত্যেক নিউরোনের সিগন্যাল পরবর্তীটির মানকে ওই নিউরোনের 'ওজন' অনুযায়ী বদলে দিয়ে দিয়ে যায়– শেষ পর্যন্ত এভাবেই আউটপুটের একটি মান দাঁড়ায়। এমনি ভাবে ওই মুখের চেহারার প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে অসংখ্য সম্ভাব্য আউটপুট পাওয়া যায়। তাদের বিকল্প বিন্দুগুলোর সমন্বয়ে বহু সংখ্যক বিকল্প মুখের ছবি তৈরি হয়। অসংখ্য এরকম মুখের মধ্যে মেমোরির সঞ্চিত মুখটির সঙ্গে কোনটির নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন পার্থক্য যদি হয়, সামনের মানুষটাকে তখন ওই চেনা মুখ হিসেবে সনাক্ত করা গেলো। যদিও মেমোরিতে

থাকা মুখের সঙ্গে সামনে দেখা মুখের এখন অনেক কিছু পার্থক্য হয়ে গেছে তবুও সনাক্ত করা সম্ভব। এভাবে ট্রেনিং দেবার মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির শেখা চলে যাকে মেশিন লার্নিং বলা হয়েছে। এখানে যেমন মেমোরিতে থাকা একটি মুখকে দেখা মাত্র চিনতে শেখা হলো। এমনি করে শিখে অসংখ্য তথ্যের মধ্যে যে কোন বিশেষ প্যাটার্ন দেখতে পেলে সেটি উদ্ঘাটন করেছে- যেমন করে যে কোন অজানা ভাষার ভেতর প্যাটার্ন খুঁজে পেতে পেতে ভাষাটাকেই শিখে ফেলেছে তাড়াতাড়ি। এ সব একভাবে মানব মস্তিষ্কের চিন্তার মতোই তো!

সে সব তো ছিলো প্রাথমিক পদক্ষেপ– তারপর ইন্টেলিজেন্ট অনেক দূর গেছে বুদ্ধির দিক থেকে চিন্তার দিকে। কিন্তু বোধশক্তি কি পেয়েছে ইন্টেলিজেন্ট? না, সেটি বরাবরের মতই অনেক দূরে রয়ে গেছে। দুই বুদ্ধির আলাপকে বাইরে থেকে শুনলে কোন আড়ষ্টতা বোঝা যাবেনা। কিন্তু ভেতরে এই আড়ষ্টতা বিশাল।'

শান্তর বক্তৃতার মূল মতামতটি হলো– অনেক বিশেষজ্ঞ যে বলছেন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ইন্টেলিজেন্ট একদিন সুপার ইন্টেলিজেন্টে পরিণত হবে মানুষের মত আত্মসচেতনতা নিয়ে সেটি ঠিক নয়। এর উন্নয়নের ইতিহাস আর কর্ম প্রক্রিয়ার অনুসরণ করে তেমন সম্ভাবনা তিনি দেখছেননা।

বক্তৃতার পর থেকে এর নানামুখী সমালোচকরাও বিশ্ব সমিতির এই পোরটালে আসতে থাকলো দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে। তাতে বোঝা গেলো অনেকেই 'অন্তর্ভুক্তি বক্তৃতা'কে গুরুত্ব দিয়েছে। শান্তর বিষয়বস্তুটির ওপর যে তাদের উৎসাহ থাকবে তা বলাই বাহুল্য। যারা তাঁর উপসংহারটি মেনে নিতে পারেন নি তাঁদের যুক্তিকে মোটামোটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের যুক্তি হলো অনেকটা সেই প্রবাদ বাক্যের মত। তাঁরা বলেন– কোন পাখি যদি হাঁসের মত দেখতে হয়, যদি হাঁসের মত সাঁতার কাটে, আর যদি হাঁসের মত ডাকে, তা হলে তাকে হাঁস না বলার কোন কারণ থাকেনা। ইন্টেলিজেন্ট যখন মানুষের সঙ্গে সমানে সমানে আলাপ করতে পারে তা হলে তার মধ্যে প্রতিসাম্যের অভাব খোঁজার দরকারটি কী? তুরিং টেস্ট তো তাকে মানুষের মত আত্মসচেতন বলবে। আমরা এতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারি।

সমালোচকদের অন্য ভাগের যুক্তিটি হলো এ মুহূর্তে দুই বুদ্ধির আলাপে অসঙ্গতি থাকলেও তা চিরকাল থাকবে এমন কোন কারণ নেই। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি 'সাধারণ ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিতে' পরিণত হতে বেশি দেরি নেই। বিশেষ বিষয়ে, বা অনেকগুলো নির্দিষ্ট বিষয়ে ট্রেনিং দেয়ার মাধ্যমে এক একটি ইন্টেলিজেন্টকে সৃষ্টি করে আমরা অসাধ্য সাধন করেছি। সেটি অনেক ব্যাপক ভাবে করে একদিন সাধারণ ইন্টেলিজেন্টের দেখা মিলবে। এমন সাধারণ একজন ইন্টেলিজেন্ট যেন একটি সাধারণ ব্যক্তিত্ব পায়, একটি সামগ্রিক সত্তায় মণ্ডিত হয়। শুধু বিশেষ জ্ঞান নয় তার সাধারণ জ্ঞানও থাকবে। ফলে দেখে, শুনে, লেখা পড়ে, সাংকেতিক ও গাণিতিক প্রক্রিয়াকরণ করে এটি কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারবে। এসব সক্ষমতাকে একত্র করে একজন ইন্টেলিজেন্টের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করলে এবং তাতে সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক থেকে কার্য-কারণ সম্পর্ক মেনে আচরণ করার মত একটি ব্যবস্থা সংযুক্ত করতে পারলে মানুষের সমকক্ষ-বোধসম্পন্ন বুদ্ধি হয়তো পাওয়া যাবে। এ রকম কার্য-কারণ সম্পর্ক হলো যে কার্যের সঙ্গে যে কারণটি সব থেকে বেশি দেখা যায় তাকেই কার্যটির কারণ মনে করা। কিসে কী হয় তা বুঝতে পারাটি তো আত্মসচেতনতার একটি বড় অংশ। তাই এরকম চিন্তাশীল সাধারণ ইন্টেলির্জেন্ট সৃষ্টি এখন হয়তো সময়ের ব্যাপার। সেখান থেকে আত্মসচেতনতা ও নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে সক্ষম সুপার ইন্টেলিজেন্টকে সৃষ্টি করার দিকে আমরা যাব কিনা সেটি এখন চূড়ান্ত ভাবে বলে দেয়া যাবেনা। প্রশ্নগুলো হলো আমরা তা চাই কিনা, আর তা সম্ভব কিনা। ইন্টেলিজেন্টের প্রোগ্রামিং এখন ইন্টেলিজেন্ট নিজেই করতে পারছে– এটি কি তার সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত হয়ে যাওয়ার পূর্ব লক্ষণ নয়?

ময়না আর রাহিল

পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করে রাহিল ও ময়না বিশ্ব সমিতির সাধারণ কার্যক্রমের দিকে সব সময় নজর রেখে এসেছে। কিন্তু ওদের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু ঝোঁক ধীরে ধীরে বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠেছে; তাই তাঁদের দুজনেই যার যার মতো ওই সমিতি নেটওয়ার্কের খুবই বিশেষ কিছু অংশেই নজর দিয়েছে। ময়নার সেই বিশেষ অংশ হলো স্থানীয় মানুষ আর লোকজ পরিবেশ, এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নিজের আর্টে নিয়ে আসা। বলা যায়

পরিবারের অন্য সবাই যেখানে বহির্মুখি, ময়না সেখানে অন্তর্মুখি। তার দৃষ্টি দূরের দিকে নয়, বরং গভীরের দিকে, তার শিকড়ের উপলব্ধিতে।

রাহিলের মত ময়নাও ছাত্রজীবনের একটি বড় সময় ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিয়েই বিশেষ পড়াশুনা করেছে, কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সে গিলে খেয়েছে, ইন্টেলিজেন্টের অদ্ভুত সব সক্ষমতার হদিশ পেয়েছে। কিন্তু এগুলোকে সে ব্যবহার করতে চেয়েছে নিজের মত করে, নিজের মনের ভেতরের তাগিদে আর্টিস্ট হিসেবে– কারণ সেই আর্টে সে রং-তুলি ক্যানভাসের সঙ্গে ইন্টেলিজেন্ট থেকে নানা আইডিয়া সম্ভাবনার সাহায্য নিয়েছে। প্রথমে শুধু ওস্তাদ ইন্টেলিজেন্ট আর্টিস্টকে অনুরোধ জানাতো এটি ওটি এঁকে দেবার জন্য। ওস্তাদ এক ভাবে দিতো, ময়না নিজের সৃষ্টিশীল চিন্তা ব্যবহার করে তাতে কোথাও কোথাও পরিবর্তনের অনুরোধ করতো, যা ওস্তাদ করে দিতেন। এভাবে চল্‌তো গুরুশিষ্য মিলে আর্ট সৃষ্টির কাজ। যাকে বলা হয় প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারের কাজ, ময়না সেটি করতো, সেদিক থেকে ওস্তাদের কাছে সে কৃতজ্ঞ।

‘ওস্তাদজি আলো-আঁধারী বন সৃষ্টি করুন, চট্টগ্রামের পাহাড়ী বন, এক জায়গায় আলো একেবারে কমিয়ে দিন।’

‘না কিনারায় ছায়াটিকে আরো একটু ঘন’।

‘ওই কালো জায়গাটিতে এক জোড়া হরিণের চোখ জ্বল জ্বল করছে, হরিণটিকে দেখা যাচ্ছেনা’

এমনি করে দেখে দেখে অনুরোধ যখন করছে ময়নার শিল্পী মনকে যেন ইন্টেলিজেন্ট ওস্তাদজিই একটু একটু করে জাগিয়ে তুলছে। ও সময় ‘চট্টগ্রাম চারুকলা চর্চা’ নামের ক্লাবে গিয়ে মানুষ আর্টিস্টদের সহযোগিতায়ও কাজ করেছে- তাদের কাছে হাতে কলমে শিখেছে একেবারে রং-তুলির আদি কাজ। সেটির অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা। এদিক থেকে ময়না লোকজ মাধ্যম, লোকজ বিষয়ের দিকে ঝুঁকেছে। এরও কারণ স্থানীয় মানুষ, স্থানীয় নানা জাতি-সত্তা ইত্যাদির সম্পর্কে তার আগ্রহ, তাদের গভীরে পৌঁছাবার চেষ্টা। শিল্প সৃষ্টিতে স্থানীয় লোকজ জিনিস নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে ময়না খুবই আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছে। তার একটি চেষ্টা হলো নানা ভাবে বোনা কাপড়ে বিভিন্ন লোকজ

মোটিফ আনার ক্ষেত্রে, যাকে নানা বৈচিত্রে উৎপাদন করা যায়। এই বিষয়ে সুদূর হাওয়াই থেকে রাহিলও বেশ সহায়তা ও উৎসাহ দিয়েছে। হাওয়াই এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেক দূর দূর দ্বীপপুঞ্জের মানুষের একটি চমকপ্রদ শিল্প মাধ্যম ও পরিধেয় বস্ত্র হলো গাছের বাকলের ওপর বিশেষ পদ্ধতিতে নানা মোটিফ ফুটিয়ে তোলা। বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা এই আর্ট সেখানে কোথাও বলে কাপা, আবার কোথাও টাপা। সাধারণ ভাবে এটি ওই অঞ্চলের বাকল-কাপড়।

এখন ইন্টেলিজেন্ট আর্টিস্টও এই বাকল-কাপড়ের জন্য নতুন নতুন মোটিফ সৃষ্টি করছে লোকজগুলোর পাশাপাশি। এগুলোর শিল্পগুণ নিয়ে বিতর্কে ময়না যেতে চায়না; তার কথা হলো মানুষ শিল্পী ও ইন্টেলিজেন্ট শিল্পী দুই দিক থেকেই মানুষের শিল্প-প্রীতিকে যদি উৎসারিত করা যায় তাহলে সমস্যা কোথায়? শিল্পের প্রতি আকর্ষণটি শুধু মানুষের, শিল্পের সৃজন-আনন্দটিও শুধু মানুষের। মানুষই এমন ইন্টেলিজেন্ট গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে যারা নিজ থেকেই মানুষের ওই শিল্প আকাঙ্খাকে দ্রুত বহু বিচিত্র সৃজনীতে পরিতৃপ্ত করতে পারে। মানুষ শিল্পগুরুও তা পারেন, বরং আরো হৃদয়গ্রাহী ভাবে পারেন, কিন্তু তাঁকে সময় দিতে হয়। ব্যক্তিগত ভাবে ময়না অবশ্য লোকজ শিল্পই আয়ত্ব করতে চান তাঁর কাজে– যে লোকজ শিল্প সৃষ্টিতে এক শিল্পগুরু নয়, হাজারো শিল্পীর দরকার হয়েছে। আর সময়ও লেগেছে শত শত বছর।

হাওয়াইয়ের টাপার যে লোকজ শিল্প সেটি নিয়েও ময়না এদেশেই পরীক্ষা নিরিক্ষা করতে চেয়েছে। হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপে যে গাছের বাকলের ভেতরে অংশ থেকে টাপা তৈরি করা হয় সেটি তুঁত গাছের সমগোত্রীয়। আমাদের দেশের তুঁত দিয়েই সে পরীক্ষা ময়নার চলেছে। কিছু প্রাথমিক সাফল্য এ নিয়ে তাকে প্রচুর উৎসাহ যোগাচ্ছে। বাকল-কাপড়কে সে এমন অবস্থায় আনতে পেরেছে যে আদি টাপার মতই এর ওপর রং-তুলি দিয়ে এঁকে, ছাপ দিয়ে, স্টাম্প করে দানাদার ফুলিয়ে তুলে, এবং ছোপ ছোপ নানা জায়গায় আগুনের ছ্যাঁক দিয়ে নানা মোটিফ সৃষ্টি করতে পারছে যা সাধারণ কাপড়ে বা ক্যানভাসে সম্ভব নয়। ময়না এর বেশ কিছু স্যাম্পল হাওয়াইতে রাহিলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে ওখানকার টাপা শিল্পীদের মতামত নিতে।

এসব ময়নার আত্মার কাজ। কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে আরো একটি কাজ আত্মার কাজ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রায় পেশা হয়ে ওঠেছে– তা হলো স্থানীয়

ইতিহাস, বিশেষ করে স্থানীয় অর্থনৈতিক ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস নিয়ে অনুসন্ধান করা। তার পদ্ধতি হলো মানুষের সঙ্গে কথা বলা– নানা বয়সের মানুষের সঙ্গে, যাঁরা নিজেদের জীবন, নিজেদের স্মৃতি থেকে ইতিহাস উন্মোচন করতে পারেন। আলাপের মধ্য দিয়ে ইতিহাস– এটিও যেন ময়নার ওই গভীরতায় ঢোকার আর একটি পথ। নিজ তাগিদে যেমন একাজ করে, কোন বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হবার আহবান আসলেও করে।

রাহিলের বহির্মুখি মন তাকে সুদূর অন্য মানুষের সংস্কৃতিতে পাকাপোক্ত হতে সাহায্য করেছে। গিয়েছিলো হাওয়াইতে সাধারণ সবার মতোই আধুনিক ইন্টেলিজেন্ট বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর লেখাপড়া করতে। কিন্তু সেটিই তাকে জড়িয়ে ফেলেছে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের আজকের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে, যা হাওয়াইতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ফিজি, টঙ্গা, সামোয়া, তাহিতি, সলোমন আইল্যান্ড, কুকস আইল্যান্ড ইত্যাদি বিশাল প্রশান্ত মহাসগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট বড় অনেক্‌ দ্বীপে। অনেক কিছুতে তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট আছে, কিন্তু এমন বিচ্ছিন্ন এখানকার মানুষগুলোর জীবনযাত্রায় সংস্কৃতিতে অদ্ভুত কিছু ঐক্য আছে যা রাহিলের মন কেড়েছে। অদ্ভুত ভাবে তাদের সবার বিভিন্ন ভাষার মধ্যে মিল রয়েছে, একের ভাষার অনেক কথা বহু হাজার মাইলে সমুদ্র দিয়ে বিচ্ছিন্ন অপরে বুঝতে পারে। এই অভিন্ন সংস্কৃতি আজকের ইন্টেলিজেন্ট অধ্যুষিত আবহে কেমন টিকে আছে, কী রকম ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হচ্ছে, সেটিকেই রাহিল নিজের পেশা ও নেশা করেছে। বাবা যে সেই ছোটবেলা থেকেই বিশ্ব সমিতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে তারই বিশেষ বিভাগে একজন রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী হিসেবে যে ওগুলোর চর্চা করতে পারে। অবশ্য এটি অন্য অনেক উৎসের মত একটি উৎস, যেটি স্থানীয় ও বিদেশীদের চোখে এসব তুলে ধরেছে, বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, তার নিজের মন্তব্যও যেখানে নিতে পারে।

এই সব দ্বীপের প্রত্যেকের ভাষাতেই রাহিল স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। একে তো হাওয়াইতে স্থানীয় ভাষা সে শিখেছে যদিও খুবই আন্তর্জাতিক পরিবেশে ওখানে সেটি করার কোন দরকার ছিলনা। তার ওপর ভাষাবিদ ইন্টেলিজেন্টের এমন সহায়তা সে নিতে পারছে যে ওই বিশাল অঞ্চলের সব ধরণের ভাষায় একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে মানুষের সঙ্গে মিশতে তার কোন অসুবিধা হয়না। যেই লক্ষ্যে সে এই যোগাযোগগুলো সৃষ্টি করেছে তা হলো দীর্ঘ

শতাব্দীর পর শতাব্দী এখানকার মানুষ উপনিবেশবাদের কবলে পড়ে যেভাবে স্বকীয়তা হারিয়েছিলো এবং সাংস্কৃতিক ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো জানার চেষ্টা করা আজ সেসবের কী অবস্থা। আজকের আঞ্চলিক ঐক্য, বিশ্ব সরকার, কেন্দ্রীভূত ইন্টেলিজেন্ট-সমৃদ্ধ অর্থনীতির সুবাতাসের মধ্যে এসে তারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে কি আর কোন দিন দেখতে পাবে, না সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বিশ্ব নাগরিক হিসেবেই সন্তুষ্ট থাকবে।

যদি তা থাকে, বাইরের দিক থেকে কোন অসুবিধা হয়তো দেখা যাবেনা, কিন্তু তারা তাদের অন্তরাত্মাকে হারাবে। আজকের দুই বুদ্ধির জগতে মানুষ তার বুদ্ধি চর্চা বাইরের কাজে তেমন করছেনা, সে সব যন্ত্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু অন্তরাত্মার মধ্যে সেটি দারুণ ভাবে করছে। সেই দারুণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা পলিনেশিয়ান সংস্কৃতিতে দেখা দিয়েছে কারণ ইউরোপীয়দের নজরে আসার পর থেকে এতগুলো শতাব্দী সেই অন্তরাত্মা ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিল। যেই দ্বীপে বাইরের যেদেশ যুৎসই ভাবে উপনিবেশ করতে পেরেছিলো তারা আদিবাসীদেরকে নাকচ করে নিজেদের ইচ্ছেমত ওদের সংস্কৃতি নিয়ে খেলা করেছে। ফলে নিজেদের স্বকীয়তাকে ধরে রাখতে আদি বাসিন্দাদেরকে একটানা সংগ্রাম করতে হয়েছে– কখনো রীতিমত অস্তিত্বের সংগ্রামও। কখনো ওই সংস্কৃতিকে অত্যন্ত বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করে আগন্তকরা আরো বড় ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে। এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকানরা হাওয়াইতে; বৃটিশরা ফিজি, সামোয়া, কুক্‌স আইল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডে; ফরাসীরা তাহিতিতে, ফেঞ্চ প্যাসিফিক আইল্যান্ডে। এখন যদিও স্থানীয়রা তাদের সার্বভৌমত্ব খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু ইতিহাস এদিকটিতে কিছু স্থায়ী ক্ষতি করে দিয়ে যায়নি তো?

রাহিল এমনিতরো প্রশ্নের গবেষণায় জড়িতদের একজন– তার কাজ গবেষণা ও পুনর্জাগরণে সহায়তা দেয়া। হাওয়াইতে একজন বিদেশী তরুণের পক্ষে এই জটিল গবেষণা কতটাই বা সম্ভব হতো যদি না ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সর্বোত্তম ব্যবহার এতে করা না যেতো? আরো ক'জন বন্ধু বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিয়ে রাহিলরা গড়ে তুলেছে 'পলিনেশিয়া' নামের একটি ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক। পুরো বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এর পেছনে বিনিয়োগ করতে হয়েছে। এর একটি ইতিহাসের দিক আছে, আগের ঔপনেবেশিক ইতিহাস থেকে ছেঁকে আসলটি বের করার কাজ। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে সার্বভৌম হয়ে

ওঠার সময় সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সে ইতিহাস। এর একটি সাংস্কৃতিক দিক আছে বহু হাজার বছর আগে এক দ্বীপ থেকে হাজার মাইলের ব্যবধানে অন্য দ্বীপে সামান্য নৌকায় পাড়ি দেবার দিন থেকে যা সৃষ্টি হয়ে এসেছে। ওই পুরো সব অঞ্চলে কাছাকাছি রকম ভাষা, একই রকম বাকল-বস্ত্রের আর্ট টাপা ইত্যাদির মধ্যে এই দিকটি দেখা যায়। শেষেরটিতে রাহিলের মাধ্যমে ময়নাকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে তাতেই বোঝা যায় এখনো তার শক্তি ও সম্ভাবনা।

পলিনেশিয়া নেটওয়ার্কের কাজের একটি জীবিকা-ঘনিষ্ঠ দিকও রয়েছে। ইউরোপীয়রা এক কালে তাদের ওই উপনিবেশের কোন কোনটির মানুষকে অলস ভাবে হেসে গেয়ে নেচে, মাথায় ফুল গুঁজে প্রকৃতির দানে বেঁচে আছে এমন অপবাদ দিতো। আজও কি তারা ইন্টেলিজেন্ট উৎপাদনের ভাগ পেয়ে তেমনি নিষ্কর্মা হিসেবে চিত্রিত হতে রাজি আছে? ইতিহাস আর সংস্কৃতি বল্‌ছে ইউরোপীয়দের ওই পুরো বয়ানটিই ছিল মিথ্যা। আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও, ইন্টেলিজেন্টদের হাতে সব ছেড়ে গা ভাসিয়ে দিয়েছে এমন বয়ান দিতে যাওয়াও হবে মিথ্যা। তাদের জন্য মিথ্যা, দুনিয়ার বাকি মানুষের জন্যও মিথ্যা। রাহিল আরো অনেকের সঙ্গে এই উভয় বয়ানের বিরুদ্ধে কাজ করছে। বিশ্ব সমিতিতেও তার যেটুকু অংশগ্রহণ তা এই কাজের সঙ্গে জড়িয়ে।

শিক্ষানবিশের চোখে ফিউচার

চট্ করে মোগাদিসুতে

মোম্বাসাতে ফিউচারকে বেশ কিছু দিন নোঙ্গর করে থাকতে হয়েছিলো। নেটওয়ার্ক বিপর্যয়ের ফলে বন্দরের ব্যবস্থাপনায় যে গোলযোগ হয়েছিলো, প্ল্যান-বি প্রয়োগ করেও যে সব অচলাবস্থা এড়িয়ে যাওয়া যায়নি, সেগুলোই প্রধানত বিলম্বের কারণ। অবশ্য সময়টা একেবারে বেকার কেটেছে তা বলা যাবেনা, ফিউচারের গবেষণার জন্য এটি একটি বাড়তি সুযোগ ছিল। এই সুযোগ ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার ডুকাকিসের সহযোগিতার মাধ্যমে সোফিয়া পুরোপুরিই নিয়েছেন। আগেই জানা ছিলো ফিউচার যখন মোম্বাসা থেকে রওয়ানা হবে তখন এখান থেকে পণ্য নেবার তেমন আহামরি কিছু থাকবেনা, তবে নতুন একজন মানুষ থাকবে– জাহাজে বিজ্ঞানী হিসেবে গবেষণা কাজের ও নবীন অফিসার হিসেবে শিক্ষানবিশী করার জন্য কেনিয়ান যুবক কাশিন্জে মাচিমু। জাহাজ মোম্বাসা ছাড়ার বেশ ক'দিন আগেই সে জাহাজে এসে জয়েন করেছে ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করে। সাব-সাহারান আঞ্চলিক সরকারের সঙ্গে ফিউচার জাহাজের মূল কর্তৃপক্ষের একটি চুক্তি অনুযায়ী ওরা এভাবে অঞ্চলের বেশ কিছু মেরিন একাডেমী ক্যাডেটকে তাদের নানা জাহাজে সত্যিকার দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা দেবে, যেটি জাহাজী হিসেবে পেশাগত জীবন শুরুর আবশ্যকীয় শর্ত। কাশিনজের ক্ষেত্রে বাড়তি শিক্ষানবিশী হলো জাহাজে থেকেই জাহাজ সম্পর্কীয় গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করার। সে জন্য ফিউচারেই তার আসা, বিশেষ করে সোফিয়া এ জাহাজে গবেষণা চালানোর সময়।

জাহাজ চালানোর কাজে কাশিনজের তাত্ত্বিক ও প্রাথমিক হাতেখড়ির যে সনদ তা ইতোমধ্যেই মোম্বাসা মেরিন একাডেমি থেকে সে পেয়ে গেছে। এখন প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য সফল শিক্ষানবিশীর সার্টিফিকেশন পেয়ে গেলে মার্কেনটাইল নেভির একজন অফিসার হিসেবে তার যোগ্যতা চূড়ান্ত হবে। বিজ্ঞানী হিসেবেও তার হাতেখড়ি আগে ভূমিতে গবেষণা কেন্দ্রে হয়ে গেছে। নোঙ্গর করা জাহাজেই কাশিনজের সঙ্গে সবার আগে প্রথম জানাশোনা শুরু হয় দীপক প্যাটেলের। ফিউচারের ফার্স্ট মেইট হিসেবে কাশিনজের নবিশী দেখাশোনার দায়িত্ব প্রধানত বর্তাবে দীপকের ওপরেই। জাহাজে সবার সঙ্গে তার পরিচয়ও করিয়ে দেন দীপক। তাঁর নিজের সঙ্গে এই কেনিয়ান তরুণের কিন্তু খুব দ্রুত একটি বন্ধুত্ব সম্পর্কও গড়ে ওঠেছে বয়সের তারতম্য সত্ত্বেও।

দ্রুত এই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার একটি কারণ বোধ হয় আফ্রিকার এই অঞ্চল সম্পর্কে দুজনেরই মমত্ববোধ। কাশিনজে এখানকারই সন্তান, কেনিয়ায় তার জন্মভূমি মোম্বাসার কাছে, আর দীপক আজ বৃটিশ হলেও তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা তানজানিয়ার মোয়ান্‌জোতে, তাও পূর্ব আফ্রিকায়– একই রকম সংস্কৃতি। দু'জনের আরো একটি মিল দ্রুতই প্রকাশ পেলো, তা হলো নৃতত্ত্বে উভয়ের আগ্রহ। যতই পরিবর্তন এর ওপর দিয়ে ঘটে যাক আফ্রিকার এই অঞ্চলে যেই গোষ্ঠিগত আনুগত্য তাই সব কিছুকে এখনো প্রভাবিত করছে। তার সুপ্রাচীন উৎপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাতগুলো যে বহু চিন্তাশীল মানুষকে ভাবাবে তা স্বাভাবিক। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সঙ্গে যতই বসবাস করুক মানুষকে নিয়ে মানুষের ভাবাটি কিন্তু বেড়েছে বই কমেনি।

জাহাজ মোম্বাসায় থাকা অবস্থাতেই দীপক তাঁর একটি মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। তাঁর অনেকদিন থেকে মনে মনে একটি ইচ্ছা ছিল সোমালিয়ার অবস্থাটি নিজের চোখে একটু দেখবেন। নানা কারণে সোমালিয়া এখনো অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। আজকের বিশ্ব সমঝোতার দিনেও সে বার বার বৈরিতার জন্য খবর হচ্ছে। এই যে অদ্ভুত ভাবে নেটওয়ার্ক হ্যাক এখান থেকেই হলো, তার বিস্ময় তো এখনো কাটেনি। অথচ সোমালিয়াও সারা দুনিয়ার মত ইন্টেলিজেন্টের নানা সুবিধা নিয়ে সবার সঙ্গে এক দেহে লীন হয়ে গেছে বলে তিনি শুনেছেন। সেটি কতখানি হয়েছে তা দেখার ইচ্ছে ছিল। কাশিনজেকে পেয়ে ওই ইচ্ছেটি মাথা চাড়া দিলো। সোমালিয়ার এত কাছের একটি বন্দরে

থামার সুযোগ বড় একটা হয়না, এ সুযোগ ছাড়া উচিত হবেনা। দু'এক দিন ঘুরে খুব বেশি কিছু যে দেখা বা বোঝা যাবে তা নয়, তবুও মন্দের ভাল।

জাহাজ থেকে নেমে দীপক ও কাশিনজে সোজা রেল ষ্টেশনে, মোম্বাসা ও সোমালিয়ার বড় নগর মোগাদিসুর মাঝে যে ঘন ঘন বুলেট ট্রেন যাওয়া আসা করে সেটি ধরতে। রাতের ভ্রমণেই পৌঁছে গেলো ওদিকে মোগাদিসু রেল ষ্টেশনে। সেখানে মিলে গেলো স্বয়ং-চালিত স্মার্ট ইলেকট্রিক গাড়ি। বাকি দুনিয়ার সঙ্গে এসবে মোগাদিসু ব্যতিক্রম কিছু নয়। মুখের নির্দেশে ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভারকে বলে দিলেন আপাতত গন্তব্য সোমালিয়া নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর। সেখানে বেশকিছু সময় কাটলো, কারণ দুজনেই তো এ সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকেফহাল, আরো জানতে চান। এখানে জানতে চাচ্ছিলেন সোমালিয়ানদের নিজেদের দিক থেকে সেদেশের ইতিহাসের উপস্থাপন কী।

আফ্রিকার অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মত সোমালিয়ায়ও সব কিছু অনাদিকাল থেকে গোত্র-বিভক্ত। জাদুঘর এটিকে অতীত হিসেবে দেখালেও কাশিনজের অভিজ্ঞতা বলে ব্যাপারটি কিন্তু তলে তলে এখনো রয়েই গেছে। বিভিন্ন গোত্র এখানে যে নৃ-তাত্ত্বিক ভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষের তা কিন্তু নয়– বরং এক কালের কোন প্রভাবশালী একই বৃহত্তর পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম সংখ্যায় বেড়ে পরে নানা গোত্রে বিভক্ত হয়েছে। এভাবে আদিতে এখানে ছিল দির, ইসাক, দারুদ, হাইয়েহ, রাখানওয়েন– এই পাঁচটি গোত্র। এখন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে আরো অনেকগুলো। নিজ গোত্রের কারো কাছে ওরা এখনো কেন জানি নিরাপদ বোধ করে, অন্য গোত্রের কাছে বোধ করে অস্বস্তি, এমন কি ভয়। এখনো যদি কোন হ্যাকার বা অন্য রকম দুর্বৃত্ত আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মামুদ আলী গোত্রের কারো কাছে গিয়ে বলে যে 'আমিও একজন মামুদ আলী, বিপদে আছি,' তখন তাকে যথাসম্ভব রক্ষা করার তাগিদ অন্য জন অনুভব করে।

মোগাদিসুর রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে দীপক আর কাশিনজে আলাপ করছিলো এক সময় 'অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার রাজধানী' নামে পরিচিত থাকা নগরটির কী চেহারা এখন। গোত্র-গৃহযুদ্ধ ও যুদ্ধবাজ নানা নেতার আধিপত্য বিস্তারের হানাহানি যখন থামছিলোইনা তখনই বিশ্ব সরকার ও আঞ্চলিক সরকার এসে তাদেরকে সর্বজনীন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়ে বল্‌লো- 'ওসব বাদ দাও,

তোমরা শান্তিতে কাজ কর; বিশ্ব নেটওয়ার্ক, ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি, রোবট শ্রমিক এরা তোমাদের জীবিকার আয়োজন করবে। তোমরা প্রাচীন সোমালিয়ার দার্শনিক মহত্ত্বের বিষয়ে চর্চা কর। এখানকার সেদিনের বিখ্যাত কবি, গায়ক, শিল্পীদের উত্তরাধিকার নিয়ে সৃজনশীল হও।' এসব আহবান ম্যাজিকের মত কাজ করেছে। এর ফলাফল এখন দীপকরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছিলেন। একটি স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রিক কার দীপক আর কাশিনজেকে মোগাদিসুর কাছের সমুদ্র তীর দিয়ে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছিলো।

দীপক: 'দুনিয়ার নৌ ইতিহাস তো তুমিও কম জাননা, আমিও না। এর প্রায় পুরোটাইতেই একটি বড় প্রভাব রেখেছে জলদস্যুতা। দুনিয়ার সব জায়গায় যখন ওটি শেষ হয়ে গেছে বহুদিন এ জলদস্যুতার শেষটুকুতো তখনো এখানেই চলেছে, তা বেশি আগের কথা নয়। ভেবে দেখোতো একবার, সেটি ঘটতো এখানেই– ঠিক এ জায়গায়, বা কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের অন্য নানা জায়গায়– তবে সব লুটের শেষ গন্তব্য হতো এখানটিতেই। এ সাগর পারের পথে পথে বসতো নানা জলদস্যুর আড্ডা। অবাক লাগে এমন সময় এটি ঘটতে পেরেছে যখন দৈত্যের মত বিশাল কনটেইনার শিপ, ট্যাঙ্কার, ক্রুজ শিপের জয় জয়কার!'

কাশিনজে: 'এটি ঘটতে পেরেছিলো প্রধানত গৃহযুদ্ধের নানা পক্ষ নানা যুদ্ধবাজ সর্দারদের প্রশ্রয় পেয়ে– ওদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মিলিশিয়া বাহিনী ছিল। ওরা গরীব জেলে, কৃষকদের দারিদ্রকে সম্বল করে তাদেরকে মিলিশিয়ায় আকৃষ্ট করতো। লুটের ফলে আসলে লাভবান হতো ওই নেতারাই।'

দীপক: 'হ্যাঁ মানুষ ওটি বুঝে ফেলেছিলো বলে প্রযুক্তি যখন এলো তাকে ঠিকই বরণ করে নিয়েছে। প্রযুক্তি যখন মানুষকে সুরক্ষা, খাওয়া পরার নিশ্চয়তা, আর শিক্ষা এই তিনটির পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে ওয়ার লর্ড, গোত্রপতি, মিলিশিয়া, জলদস্যু-সিন্ডিকেট সব কিছুকে তখন তারা অগ্রাহ্য করেছে।'

কাশিন্জে: 'কিন্তু এখনো গোত্রের প্রতি আনুগত্য যে এক পর্যায়ে রয়ে গেছে এটি বিস্ময়ের কথা। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিতে শিক্ষিত হয়ে এদেরই কেউ কেউ আবার আঞ্চলিক রাজনীতিতে গোত্রের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় নেটওয়ার্ক হ্যাক

করছে। মোম্বাসায় সবার কাছে শুনলাম এবারকার ঘটনাটি সোমালিয়ায় হয়েছে এবং এই কারণেই হয়েছে।'

দীপক: 'হতে পারে। ওই যে জলদস্যুতার শেষ উদাহরণের কথা বলছিলাম, সেগুলো যখন এই সাগরতীরে অস্থিরতা সৃষ্টি করছিলো তখনই সারা দুনিয়ার মানুষ সোমালিয়ার অভুক্ত শিশুদের হাড্ডিসার ছবিও দেখছিলো। ওই ছবিগুলো সর্বত্র চরম দারিদ্র্যের পোস্টারে পরিণত হয়েছিলো। অথচ সোমালিয়া সব সময় একটি সম্ভাবনাময় দেশ ছিল। প্রাচীনকালে এই মোগাদিসু পূর্ব আফ্রিকার বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। পরে পশুচারণ ও মাছ ধরার পাশাপাশি ভাল কৃষি আয় ওদের ছিল। তারও পরে এখানে নানা অমূল্য খনিজের সঞ্চয় আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে যার আবিষ্কারের চেষ্টা কখনো কেউ করেনি– করার সুযোগই পায়নি। মনে হয় প্রযুক্তি এখন সব সুযোগই এনে দিচ্ছে– বিশ্ব সমঝোতা দুনিয়ার কোন জায়গাকেই পিছিয়ে থাকতে দেবেনা।'

শিক্ষানবিশীর স্বরূপ

ফিউচার জাহাজ মোম্বাসা ছাড়ার আয়োজন করলো, আর সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেলো কাশিনজের সত্যিকারের শিক্ষানবিশী। পরবর্তী গন্তব্য কলম্বোর জন্য ও তারপর সিঙ্গাপুরের জন্য মালামাল ইতোমধ্যেই বোঝাই করা হয়ে গিয়েছে– বিশেষ ধরনের কিছু খাদ্য ও পানীয়, যেগুলো কাছাকাছি পূর্ব আফ্রিকায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয়। এর মধ্যে নেয়া হয়েছে কফি, কোকো, কাজু বাদাম, ভ্যানিলা, এ্যাভোকাডো ফল। সর্বত্র সিনথেটিক উপায়ে স্থানীয় কারখানায় আজকের খাদ্যের অনেকখানি তৈরি হলেও প্রকৃতি থেকে পাওয়া এমনি খাদ্যের আদর কিন্তু সর্বত্র যথেষ্ট– তা শস্যই হোক আর ফলই হোক। তাই যেই অঞ্চলে ওগুলোর বাড়তি উৎপাদন হয় সেখান থেকে সবাই এখনো লুফে নিতে চায়।

বন্দর থেকে রওয়ানা হওয়াটি জাহাজে ব্যস্ত সময়। সবাই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, কাশিনজে নিজেও যাতে হাত বাড়াতে পারে তার কাজের একটি নির্দেশনামা সময় সময় পেতে থাকলো। এজন্য ফার্স্ট মেইট হিসেবে দীপক ইন্টেলিজেন্ট অফিসারদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন। কাজেই সেকেন্ড মেইট পীটার, থার্ড মেইট জন এবং চীফ ডেক-হ্যান্ড ওয়াং নিজেদের মধ্যে যুক্তি করে কাশিনজের জন্য একটি শিক্ষণ-মড্যুল করে তাকে পরামর্শ

দিচ্ছে। এজন্য ইন্টেলিজেন্ট অফিসার তিন জনের সাধারণ কাজকর্মে কি কোন বিঘ্ন ঘটেছে, বিশেষ করে যাত্রার ওই শুরুতে? মোটেই নয়। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি প্রায়শ সমান্তরালে বিভিন্ন কাজ করতে পারে, পরবর্তী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন প্রস্তুতি সারতে পারে আগের কাজটি করতে করতেই।

কাশিনজে পরামর্শগুলো পর্দায় ম্যাসেজ, গ্রাফ, ছবি ইত্যাদি রূপে এসব দেখছে, শিখছে– সঠিক জায়গায় গিয়ে দায়িত্ব নিচ্ছে। কখনো পীটার, জন, ওয়াঙের কাছ থেকে উৎসাহ সূচক অথবা সতর্কতা সূচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। পরস্পর যোগাযোগের এসব ঘটনা প্রায় স্বয়ংক্রিয় ভাবেই হচ্ছে। তবে প্রয়োজনে ইন্টেলিজেন্ট অফিসাররা মুখে কথা বলেও কাশিনজেকে বুঝিয়ে বলতে পারে। কাশিনজে নিজেও মুখের ভাষাতেই জিজ্ঞেস করতে পারে। ইন্টেলিজেন্ট অফিসারদের এবং ইন্টেলিজেন্ট রোবট, ডেক হ্যান্ড, ও যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটির কাজের একটি রিয়্যাল টাইম গ্রাফিক ধারা-বিবরণীও কাশিনজে ইচ্ছে করলে দেখতে পারে। তাদের প্রত্যেকের কাজ থেকে সে নিজে ধারণা পাবে থার্ড বা সেকেন্ড মেইট হিসেবে জাহাজে দায়িত্ব পেলে কী ধরনের সমস্যা ও কাজকে তার বিবেচনায় রাখতে হবে। ওসব দেখার সময় মানুষ ছাত্রের স্বাভাবিক যে প্রবণতা শিক্ষককে নানা কথা জিজ্ঞেস করা– কাশিনজে তাই করছে। যেমন 'পীটার, এটি কেন করলেন', বা 'ওয়াং– হোল্ডের দরজাটি ধাক্কা দিয়ে খোলা বাঁধা করলেন কেন?'

অফিসার মানের ইন্টেলিজেন্টরা এমন দু'রকম কাজে বেশ পটু যেগুলো আগে মানুষের একচেটিয়া ছিল। জাহাজ চালানো সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের কাজ, আবার বেশ ক'টি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে স্বচ্ছন্দ আলাপ। প্রথমটি কাজে লাগে সবার সঙ্গে একযোগে কাজ করতে এবং ইন্টেলিজেন্ট রোবট শ্রমিকদেরকে কাজ করাতে। সে দায়িত্ব ওয়াংকেই বেশি পালন করতে হয়; বিশেষ করে জাহাজ যখন নোঙ্গর করে, নোঙ্গর তোলে, জেটিতে ভেড়ায়, পণ্য ওঠা-নামা করে। দ্বিতীয়টি কাজে লাগে স্বচ্ছন্দে মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে। ওই যে ভাষার সক্ষমতা এটি কিন্তু একটি বড় ব্যাপার– মানব-সদৃশ হবার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধির ইন্টেলিজেন্ট হবার দিকে এটি একটি বড় উল্লম্ফন, যেহেতু মুখের ভাষায় নিজ বিবেচনায় কথা বলতে গেলে এমনি সক্ষমতা দরকার। তবে এখন পর্যন্ত যা পারছে তা শুধু বুদ্ধি করে বলা মাত্র, উপলব্ধি

করে বলা নয়। সত্যিকার সাধারণ বুদ্ধির জন্য যা দরকার, এখনো তা আসেনি– মস্তিষ্কের আদলে নিউরাল নেটওয়ার্ক, ট্রেনিং থেকে শেখা, প্যাটার্ন চিনতে পারা ইত্যাাদি সত্ত্বেও। তবে যে যাই বলুক ইন্টেলিজেন্টরাও সবার সঙ্গে কথা বলে সব কিছু করতে পারছে বলে এই জাহাজী জীবনটা অনেক সহজ হয়েছে।

কাশিনজের জন্য তার শিক্ষানবিশী আরো সহজ ও উপভোগ্য হয় যখন ক্যাপ্টেনের সভায় বা খাবার টেবিলের আলাপে দীপক, অপ্সরা, ওলেগ, সোফিয়া সবার সঙ্গে তার মুক্তকণ্ঠে কথাবার্তা হয় নানা গল্পগুজবের সঙ্গে সঙ্গে। সেখান থেকে প্রচুর শেখা হচ্ছে। তাছাড়া দীপকের সঙ্গে শুরু থেকেই তো খুব তার খুব ভাব, দীপক শিক্ষানবীশিতেও প্রচুর সময় তাকে দিচ্ছেন। অন্য সবাইও নতুন মানুষ পেয়ে খুশি, আলাপচারিতায় কার্পণ্য নেই। গবেষণা সহকারী হিসেবেও এবার হাতেকলমে তাকে নানা কাজ করতে হবে, তাই গোড়া থেকেই সোফিয়ার এক রকম শিষ্যত্বই গ্রহণ করেছিলো। সোফিয়া ইতোমধ্যেই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে মোম্বাসা থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত পুরো যাত্রায় গবেষণার পরীক্ষাগুলো কী হবে, কেমন করে হবে। ছাত্র থাকতে কাশিনজে একাডেমিতে তার শিক্ষকের সঙ্গে মিলে ইঞ্জিন ও ডানাপাল এক সঙ্গে ব্যবহারের সময় জাহাজের ভারসাম্য নিয়ে একটি পেপার পাবলিশ করেছে। পেপারটি পড়ে সোফিয়া নিশ্চিত ছিলেন যে এই ছেলের তাত্ত্বিক জানাশোনা বেশ ভাল। এখন জাহাজের ওপর নিজেরা মাপজোক করে তা তাত্ত্বিক মডেলে বিশ্লেষণ করাটি আয়ত্ব করে ফেল্‌লে গবেষণায় দারুণ কাজে আসবে কাশিনজে। দীপকের কাছ থেকে শুনেছিলেন নৃতত্ত্বে এবং সমাজ বিশ্লেষণও কাশিনজের আগ্রহের কথা, তাই ছেলে রাহিল হাওয়াইতে পলিনেশিয়ানদের নিয়ে যে কাজ করছে তা জানাতে দেরি করেননি। এটিও কাশিনজেকে সোফিয়ার কাছে আনতে সাহায্য করেছে।

জাহাজের আরেক ইন্টেলিজেন্ট স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কাশিনজেকে খুঁজে নিয়েছিলো মোম্বাসাতে বন্দরে থাকতেই, সে হলো স্টুয়ার্ট আলাদিন। জাহাজের একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হিসেবে আলাদিনকে খাদ্যদ্রব্য রসদ ইত্যাদি দেখতে হয়। শেফের পরামর্শ অনুযায়ী তার সব সময় লক্ষ্য থাকে এই বন্দর থেকে প্রয়োজনীয় কিছু সংগ্রহ করতে হবে কিনা। নতুন মানুষ কাশিনজে হয়তো খাবারের মেন্যুতে একটু পরিবর্তন আনতে চাইতেও পারে, কাজেই

আলাদিন সময় থাকতে তার পরামর্শ চাইলো। ইতোমধ্যে থাকা সব খাদ্য রসদ দেখে কাশিনজের কাছে মনে হয়েছে যে আর যে জিনিসগুলো মোম্বাসা থেকে নিলে খাদ্যে আরো একটু বৈচিত্র আনা যাবে– তা হলো ফারমেন্ট করা খাবার।

আফ্রিকার নানা জায়গায় এরকম গাঁজিয়ে তোলা খাবারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আছে। এতে খাবারে নতুন স্বাদ আসে, খাবার সহজে নষ্টও হয়না। পূর্ব আফ্রিকারগুলো এদিক থেকে খুব বিশিষ্ট– বিভিন্ন রকম সাধারণ খাবার থেকে গাঁজিয়ে করা। এভাবে জাহাজে সংগৃহীত হয়েছিলো আলু ও মিষ্টি-আলুর ফারমেন্ট করা রূপ ফুফু, বজরা বা সরগম শস্যের থেকে করা ওগি ও বুরুভুটু, আর দুধ থেকে ফুরা। খাবার টেবিলে এগুলো যখন মাঝে মাঝে পরিবেশন করা হতো এই সব গাঁজানো খাবারের প্রত্যেকটির মাহাত্ম্য তখন কাশিনজের মুখেই শোনা যেতো। খাবার টেবিলে অফিসাররা যে কতটা রসনা বিলাসী তা তো জানাই আছে। কাশিনজে'র চেষ্টা অপাত্রে যায়নি। মজার ব্যাপার হলো হাজার বছর ধরে এখানকার ঘরে ঘরে এভাবে গাঁজানো খাবার তৈরির এবং তা নিজেরা খাওয়া ও স্থানীয় হাটে বিক্রি করার চল থাকলেও, এখন এর সব উৎপাদন হয় ইন্টেলিজেন্ট কর্মী আর ইন্টেলিজেন্ট কেমিষ্টের তত্ত্বাবধানে কারখানায়। শান্তর ব্যবস্থাপনায় থাকা ওই গ্রীন ফুড্সেরটির মত আরেকটি বিরাট খাবারের কারখানায়। গাঁজানোর জন্য ব্যবহৃত অণুজীব ও তার পরিবেশ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ হয় বলে এবং স্বাদ-গন্ধ নিয়ে অনেক পরীক্ষা হয়েছে বলে এসবের মান ও বৈচিত্র দেখার মত। তাই বলে বাড়িতে বাড়িতে এ খাবার তৈরি কি বন্ধ হয়ে গেছে? মোটেই না, সখ করে মানুষ এখনো তা করে। কাশিনজে দাবি করে যে ওর নানীর তৈরি ওগির স্বাদ আর কোথাও সে পায়নি।

মোম্বাসা থেকে কিছুটা পথ এগুবার পর সোফিয়ার পরীক্ষা নিরিক্ষার আর একটি পর্ব শুরু হয়েছিলো, তা হলো উদ্গীরণবিহীন ইঞ্জিনের ও একই সঙ্গে ডানাপালের প্রয়োগ। দুবাইয়ের কারখানা থেকে জাহাজে নেয়া হয়েছিলো বিশেষ রকম নিরাপদ আধারে রাখা প্রচুর সবুজ-এমোনিয়া, শুধু সৌরশক্তি ব্যয় করে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সংশ্লেষণে তৈরি হয়েছে এটি। এর মধ্যে হাইড্রোজেন এসেছে সৌরশক্তি ব্যবহার করে পানিকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে বিশ্লিষ্ট করে। আর নাইট্রোজেন বিশুদ্ধ করে নেয়া হয়েছে বাতাস থেকে। সবই নবায়নযোগ্য শক্তিতে ঘটেছে বলে কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্গীরণ

করার মত কোন ফসিল জ্বালানির ব্যবহার নেই, কোন গ্রীন হাউস গ্যাস বেরুবার সুযোগ নেই। এই এমোনিয়াকে এসব কারণে বলা হচ্ছে সবুজ এমোনিয়া– বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে এর দহনেও কোন উদ্গীরণ নেই।

ফিউচারের ব্যবহৃত ইঞ্জিনটিও দীর্ঘ গবেষণার ফল, এর ওজন ও দক্ষতার নিরিখে। এখন ডানাপালের সঙ্গে এক সঙ্গে ব্যবহারের সময় এর কার্যকারিতা দেখতে হবে। এইবার একটি দ্রুত দৌড়ের পালা; দেখা যাবে ডানাপাল আর ইঞ্জিনের যৌথ প্রচেষ্টা কী রকম উচ্চ গতি পেতে পারে। বিশেষ করে এটি বর্ষা শুরুর দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর কাল হওয়াতে অনুকূল বাতাসে ডানাপালের সর্বোচ্চ গতি লাভ সম্ভব হবে– মোম্বাসা থেকে কলম্বোর দিকে এগুবার সময়। জাহাজের কর্তৃপক্ষের দিক থেকে এ পরীক্ষায় দায়িত্ব আছে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অপ্সরার ওপর। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনা কাশিনজেরও রয়েছে। এ নিয়ে অপ্সরাকে সহায়তা করা ছাড়াও তার ভূমিকা সোফিয়ার গবেষণা সহকারী হিসেবেও। গবেষণার জন্য বিভিন্ন মাপক যন্ত্র, সেন্সর যা জাহাজের ওপরে-নিচে, পানির তলায়, প্রপেলারের কাছে, ডানাপালে সর্বত্র বিন্যস্ত আছে তার চেকিং, উপাত্ত রেকর্ড, বিশ্লেষণ ইত্যাদির খুঁটিনাটি কাজ রয়েছে তার। এগুলো ইন্টেলিজেন্ট সফ্টওয়্যার ও রোবটের দায়িত্ব হলেও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত, বিবেচনা, মানব বিজ্ঞানীর থেকে আসতে হয়– আপাতত সেটি সোফিয়ার ও কাশিনজের থেকে। অপ্সরা আর কাশিনজের আলাপচারিতায় কিন্তু ওই নবিশ জাহাজী বেশ উৎসাহই পায়।

অপ্সরা: ‘মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং যখন পড়েছি তখন জাহাজের ইঞ্জিনের ভেতর-বাহির তন্ন তন্ন করে দেখেছি, নিজে খুলেছি বেঁধেছি। কী রকম আওয়াজ বেরুলে তার রোগটি কী বুঝতে শিখেছি। এখন যেন মাঝখানে ইন্টেলিজেন্ট থাকায় ইঞ্জিনের সঙ্গে একটি দূরত্ব তৈরি হয়েছে, যেন একে চিনিইনা। তাছাড়া গবেষণা ইঞ্জিনটি এই যে হালকা পাতলা, শব্দহীন, ঘর্ষণহীন একে তো রীতিমত বিজাতীয় একটি জিনিস মনে হয়। এখন তোমাকে দেখাতে গিয়ে এর একটু নাড়াচাড়া করছি ভালই লাগছে।’

কাশিনজে: ‘হ্যাঁ, নিজে করার মধ্যে একটি আদিম অনুভূতি আছে। আমরাতো বিবর্তিত হয়েছি নিজের শরীর আর নিজের মনকে সরাসরি কাজের যোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে, ডিজিট্যাল সিগন্যাল তত্ত্বাবধান করার জন্য তো নয়।’

অপ্সরা: 'চোখ বন্ধ করে বলতে পারি ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিশ্ছিদ্র ভাবে সব কিছু নিজেই করে ফেলবে। নিজের হাতে কাজ করার সময় একটি উদ্বেগ থাকতো, স্টার্ট দিলাম, চালু হবে তো! চালু হলেও আবার বিকট একটি আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে যাবেনা তো! ওতে একটা এক্সাইটমেন্ট থাকতো! যন্ত্র যত নিখুঁত বলে ভরসাই থাকুক, নিজে করলে খানিকটা হলেও অনিশ্চয়তা থাকে।'

কাশিনজে: 'এ জন্যই বোধ হয় ইন্টেলিজেন্টের সঙ্গে মানুষ সহকর্মীর মতো মিলে মিশে যেতে পছন্দ করি। তার মধ্যেও এক্সাইটমেন্ট খুঁজে পাই।'

অপ্সরা: 'ঠিক বলেছ, ইন্টেলিজেন্টকে বন্ধুভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং সহকর্মী হিসেবে দেখার চেষ্টা করি। ওরা কথাবার্তা এতটাই আমাদের মত বলে যে সেটি করতে অসুবিধা হয়না। কিন্তু ওই বেটাতো এপ্রন পরে কালিঝুলিতে ভূত হয়ে পড়েনা ইঞ্জিন রুমে আমাদের মত।'

কাশিনজে: 'এসবের মধ্যে আমরা মানুষ নাবিকদেরকে কি আর বেশি দিন প্রয়োজন হবে? চলন্ত গাড়িতে বা উড়ন্ত বিমানে যে আমরা নেই, তাও বহুদিন হয়ে গেলো। ড্রাইভার আর পাইলটের কাজ যে এক সময় আমরা করতাম সে কথা ভুলেই গেছি।। সমুদ্রে জাহাজেও বা আমরা থাকবো কেন?'

অপ্সরা: 'আমার মনে হয় জাহাজ সব সময় মানুষের হাতে থাকবে, যতই ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি এর পেছনে কাজ করুক। গাড়ি বা বিমানে কেউ দিনের পর দিন চলন্ত থাকেনা, জাহাজে থাকে। সেদিক থেকে এটি বরং একটি কারখানার মত। রোবট শ্রমিকরা আছে, ইন্টেলিজেন্ট তত্ত্বাবধায়করা আছে; কিন্তু সার্বিক ভাবে কারখানার দায়িত্ব মানুষের হাতে রাখতে হয় কারণ তারই শুধু অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। জাহাজী জীবনেও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, তার বহুমুখী কর্মযজ্ঞের জন্য। বিমানে বা গাড়িতে পরিচালকরা এতো ভাবার বা মেরামত করার অবকাশ পায়না, অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহারের সুযোগ পায়না।'

কাশিনজে: 'আমাদের অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তা হলে ফুরায়নি। শুনে খুশি হলাম। আপনাদের সান্নিধ্যে থেকে সেটি বাড়িয়ে নেবার আশা করি।'

ভ্রমণে নতুন সংস্কৃতি

সোফিয়া এখন যে গবেষণায় ব্যস্ত, কাশিনজে একদিন যেটি এগিয়ে নিতে চায়, ফিউচারের সবাই যেটি নিয়ে খুবই উৎফুল্ল– তার লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। সেটি হলো পরিবর্তিত অর্থনীতির যুগে জাহাজকে শুধু পণ্য বহনে নয়, যাত্রী বহনের অনেক ক্ষেত্রেও আবার ফিরিয়ে আনা। এজন্য জাহাজের গতিবেগ বাড়ানো দরকার, পরিবেশের ক্ষতি না করে, জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কা না বাড়িয়ে। জাহাজ ভ্রমণের একটি বড় অসুবিধা হলো এতে প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন, জাহাজের সঙ্গে এতো ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির কাজের জন্যইতো প্রয়োজন বিশাল পরিমাণ বিদ্যুৎ। জাহাজের সাধারণ কাজকর্মের জন্য তো বটেই, ওই নীরব সফটওয়্যার চালিত ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইসগুলো তার নড়াচড়া বিহীন 'চিন্তা' করতেও প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ করে। যাত্রী থাকলে তাদের জন্যও প্রচুর বিদ্যুৎ লাগবে। সব ইন্টেলিজেন্ট প্রচুর তাপ সৃষ্টি করে– সেই তাপ সযত্নে শোষণ করে নিয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এই তাপ কাজে লাগিয়ে বিদ্যুতের কিছু সাশ্রয় হয়। উদ্গীরণহীন ইঞ্জিন ও জেনারেটর চালিয়ে আসে কিছু বিদ্যুৎ, আর সর্বাধুনিক ব্যাটারি আর ফুয়েল সেল থেকেও আসে কিছু। কিন্তু বিদ্যুতের সিংহভাগ আসে সৌরকোষ থেকে। জাহাজে ব্যবহারের সৌরকোষ আরো দক্ষ; এটি বরং সৌরকোষ উন্নয়নের গবেষণাকে ত্বরান্বিত করছে। বলা যায় এর গবেষণা ছিল সোফিয়ার গবেষণার সঙ্গে সমান্তরালে চলা আরেকটি বড় গবেষণা। এখন তাই অতি পাতলা ও হালকা অথচ উচ্চ দক্ষভাবে সূর্যের আলোকে বিদ্যুতে পরিণত করে এমন সোলার প্যানেলে জাহাজ মোড়া। তা এমন নানা বাঁকা বা চেপ্টা আকৃতিতে আসছে যা দিয়ে জাহাজের খোলের পানির ওপরে থাকা অংশ ভেতর বাহির ছেয়ে দেয়া যায়। সেই ভাবে ডানাপালকে এবং জাহাজের মধ্যে বাড়িঘরের যাবতীয় দেয়ালকেও।

জাহাজকে চলার পথে বাধা দিয়ে ধীর গতির করে ফেলার পেছনে একটি কারণ হচ্ছে পানির সঙ্গে জাহাজের খোলের বাইরের তলের ঘর্ষণ। প্রপেলারের ব্লেডের তলের ঘর্ষণটিও কম নয়। আর এসব ঘর্ষণ অনেক বাড়িয়ে ফেলে খোলের বাইরের তলের ওপর ক্রমাগত শ্যাওলা এবং অসংখ্য কাঁকড়া বা বার্নাকেল জাতীয় শক্ত খোলের প্রাণীর আঁকড়ে থাকা। গবেষণা এখন স্বয়ংক্রিয় ভাবে এই তলকে সব সময় পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা নিয়েছে। সোফিয়াকে খুব সূক্ষ্মভাবে এই পরিস্কার করার কার্যকারিতা মাপতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়,

খোলের তল যাতে একেবারে পিচ্ছিল থেকে ঘর্ষণ কমিয়ে ফেলতে পারে সে জন্য চমকপ্রদ ভাবে সারা গা খুব ক্ষুদ্র অসংখ্য বুদবুদে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পানির ভেতরে বাতাসের ফু দিয়ে বুদবুদ তোলার মতো করে এটি করা হচ্ছে; ওখানেও কাজ করছে ইন্টেলিজেন্ট সেন্সরের তত্ত্বাবধান– যাতে বুদবুদ ছোটবড় না হয়। কারণ তাতে পিচ্ছিল ভাব কমে যাবে। শেষ অবধি সোফিয়ার গবেষণাতে একজন নিপুণ একাউন্টেটের মত একটি পাকা ইন্টেলিজেন্ট অডিট ব্যবস্থা আছে– গতি বাড়াতে কী কী করা হলো, আবার অন্য দিকে বেশি গতিতে ঘর্ষণ ইত্যাদি বাধা গতি কমিয়ে দিচ্ছে কেমন। তাতে মোটের ওপর কী লাভ হলো?

গবেষণার একটি পর্যায় নিয়ে সবাই বেশ একটু মজা পেলো। এটি হলো পুরো জাহাজটিকেই একটি স্মার্ট জাহাজ হিসেবে গড়ে তোলা। এই স্মার্ট হওয়াটি প্রধানত তার নিজের গতিপথ নিজে খুঁজে নেবার ব্যাপার। কোথায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে তা জানা আছে বটে কিন্তু পাল ব্যবহার করলে অথবা পাল ও ইঞ্জিন উভয়ে ব্যবহার করলে সেখানে যেতে এখন কী করবো? প্রতি মুহূর্তে বাতাসের গতি এবং জলস্রোত ইত্যাদি নিয়ে সার্বিক আবহাওয়া নির্দিষ্ট করে দেবে আপাতত ঠিক কোন দিকে চলাটি সর্বোত্তম হবে। যাত্রাপথের বেশ কিছু দূর পর্যন্ত সমুদ্রের প্রতিটি বিন্দুর এই অবস্থাগুলো আগাম জানা থাকলে ভাল হয়। ওই বিন্দুতে যখন জাহাজ পৌঁছবে তখনকার প্রকৃতি বিবেচনায় নিয়েই এটি গতিপথ ঠিক করবে। ইন্টেলিজেন্ট এখন খুব সূক্ষ্মভাবে এসব করতে পারে। এটিকে কীভাবে সর্বোত্তম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় যাতে এই পাল, হাল সব কিছুকে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নিজের পরবর্তী বেগ হিসেব করে কখন কোন্ বিন্দুতে পৌঁছবে তাও জানবে ইন্টেলিজেন্ট। এ নিয়ে নানা মন্তব্যও এলো বিশেষ করে প্রথম এসব প্রত্যক্ষ করা কাশিনজের কাছ থেকে।

কাশিনজে: ‘দেখছি পুরো জাহাজটিকেই একটি বিশাল ইন্টেলিজেন্টে পরিণত করার আয়োজন; সে যেন দূর থেকে সমুদ্র আর আবহাওয়াকে শুঁকে শুঁকে চল্‌ছে, প্রয়োজনমত এদিক ওদিক করে।’

সোফিয়া: ‘এজন্য এর সফ্‌টওয়্যারের আলগোরিদমকে বেশ জটিল অঙ্ক কষার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ওরা জটিল অঙ্ক করে এগুবে, আমরা মাঝের

ফলাফলগুলো দেখবো এতে জাহাজের নিজের দিক থেকে গতি কতটা মসৃণ থাকছে লক্ষ্য করবো। কিন্তু বোঝার আরেকটা দিক হলো জাহাজে আমরা যারা আছি তারা গতির মসৃণতা কতটা অনুভব করছি তা। ওটি জাহাজের প্রতিটি মানুষের দৈহিক, মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। এজন্য প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার একটি রেকর্ড নিতে হবে।'

দীপক: 'এতো আয়োজনে যা করছেন তাতে তো মনে হচ্ছে মানুষ ক্রমে বেশি বেশি জাহাজের যাত্রী হতেই পছন্দ করবে। খুব দীর্ঘ পথ না হলে, আর বিজনেস ট্রিপ না হলে জাহাজের এই আয়েশী মসৃণ যাত্রাই তো পছন্দ হবার কথা, বিশ্ব জলবায়ুর ক্ষতি না করে।'

সোফিয়াঃ বিজনেস ট্রিপ বলে কিছু আছে নাকি আজকাল? আমি তো দেখি বিজনেস পুরো ইন্টেলিজেন্টদের হাতে চলে গেছে। মানুষ বড় সাহেবদের এতে হন্তদন্ত ট্রিপ দেবার প্রয়োজনীয়তা অন্তত বিজনেসের জন্য আছে কি? আমরা জাহাজকে হয়তো খুব প্রশস্ত করে যাত্রীদেরকে প্রচুর ঘোরাফেরার জায়গা দিতে পারবোনা, কিন্তু সুকৌশলে সব দিকে সমুদ্রের দৃশ্যের মধ্যে রেখে তাদেরকে আনন্দদায়ক স্বস্তির ভ্রমণ দেবার জন্য আমাদের গবেষণা খুব কাজে আসবে।'

দীপক: 'অবশ্যই তা হবে। প্রত্যেকটি বিমান যাত্রা এখনও পরিবেশের যে ক্ষতি করছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য অনেক ভাবে সেই ক্ষতি পূরণ করতে পারছি বলেই পৃথিবী টিকে আছে, আমরা টিকে আছি। জাহাজে ভ্রমণের অভ্যাস সেই ক্ষতি কমাবে। কিন্তু তা সামনের দিনগুলোতে এ সমুদ্র পথগুলোতে যদি জাহাজ চলাচলের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দেয় তা গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ না হোক অন্য রকম সমস্যার সম্মুখীন করতে পারে– সেটি দূষণ। সব চেয়ে বড় দূষণের পাটটি অবশ্য চুকে বুকে গেছে, তেলের দূষণ আর কোনদিন জাহাজে হবেনা কারণ তেলের ব্যবহার হবেনা। ইঞ্জিন না চালিয়েই যদি পারি তা হলে কোন জ্বালানিরই দরকার হবেনা। আর এমোনিয়া জ্বালানির দূষণ হবার সুযোগ খুবই কম– তৈরিতেও এবং ব্যবহারেও।'

কাশিনজে: 'তা হলে আমরা কি শুধু যাত্রীদের সৃষ্ট জৈব দূষণের কথা বলছি? সেটিতো রিসাইক্লিং করে সমাধান করা যায়।'

সোফিয়া: 'হ্যাঁ স্পেস স্টেশনে যে রকম সব কিছু শত ভাগ রিসাইকেল করা হয় আমরা এখন জাহাজের জন্য তা করতে পারছি। ফিউচারের সাইজের একটি জাহাজে বর্তমান অবস্থাতেই দুশ'র মত মানুষের জন্য আমরা এখনই ওটি করতে পারছি। কিন্তু যাত্রী জাহাজ উন্নয়নে গবেষণা যেভাবে চলছে তাতে জাহাজকে এই সা্ইজে রেখেই আরো বেশি যাত্রীকে সম্পূর্ণ রিসাইকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রাখা যাবে। জাহাজের ডিজাইন এমন হচ্ছে যাতে যাত্রীরা সবাই খোলামেলা পরিবেশ পায়, চলাফেরা করারও চমৎকার জায়গা পাবে।'

দীপক: 'জাহাজের একটি বড় দূষণ ছিল শব্দ দূষণ। পানির ভেতরে গিয়ে এই শব্দ জলজ প্রাণীর দারুণ ক্ষতি করতো, সীমিত জাহাজ চলাচলের আমলেই। এখন খোল ও প্রপেলারের তলে ওই বুদবুদের চাদর দিয়ে পিচ্ছিল করে নেয়াতে শব্দ-দূষণের বড় উৎসটি আর থাকছেনা।'

সোফিয়া: 'আমাদের গবেষণার লক্ষ্যই হলো অসংখ্য জাহাজ দ্রুত গতিতে নি:শব্দে সমুদ্রের বুক চিরে চলে যাবে যেন সমুদ্রের কাউকে কিছু টের পেতে না দিয়ে।'

দীপক: 'তবে টের শুধু পাবে আমাদের বিশ্ব নেটওয়ার্ক। সাগরে এক একটি জাহাজ মানে হলো ওই বিশ্ব নেটওয়ার্কে এক একটি স্থানীয় লুপ, যা আবার ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করছে। ওতে জাহাজ চালাবার ও এর যাত্রী ব্যবস্থাপনার সব সিস্টেমেরগুলো ছাড়াও প্রত্যেক যাত্রীর নিজস্ব সৃষ্ট যাবতীয় নেটওয়ার্ক-কাজের ডিজিট্যাল ঢেউগুলো থাকবে। সমুদ্রে জাহাজের ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেটওয়ার্কে এই ডিজিট্যাল ভিড়ও বাড়বে।'

কাশিনজে: 'তাতে কি সমস্যা সৃষ্টি হবে?'

সোফিয়া: 'জাহাজের সংখ্যার একটি সীমা পর্যন্ত তেমন কিছু হবেনা। কিন্তু তার থেকে বেশি কাছাকাছিগুলো লুপগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। এই দিকেও আমাদের আগাম কাজ করতে হচ্ছে।'

ফিউচার জাহাজ কলম্বোর কাছে চলে আসছিলো দ্রুত। কলম্বো অপ্সরা কুমারাতুঙ্গের নিজস্ব ভূবন। যে ক'টা দিন জাহাজ ওখানে থাকবে কলম্বো, গালে, কান্ডি, অনুরাধাপুরার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের একটি স্বাদ সহকর্মীদেরকে তিনি দেবেন এই আশ্বাস সোৎসাহে দিয়ে রেখেছেন। কাশিনজে আর দীপকের

নৃতত্ত্বে উৎসাহ যে কতখানি তা অপ্সরা দেখেছেন, যে ভাবে এই দুই অসম বয়সী মানুষ আলোচনায় ডুবে যায়। এমনি এক খাবার টেবিলের আলোচনায় তিনিও শরিক হয়ে যান।

অপ্সরা: 'আমি ভাবছি এই বিশ্ব নেটওয়ার্কের কারণে দেশের নানা ইতিহাস-ঐতিহ্য, যে নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র এসবের চর্চাটি অর্থহীন হয়ে যাচ্ছেনা তো। আমি কিন্তু শ্রীলঙ্কার এ দিকগুলো নিয়ে বরাবর খুবই উৎসাহী ছিলাম। এই ছোট দ্বীপটির মধ্যেই কত ঐতিহ্য পাশাপাশি দেখে এসেছি– সিংহালা, তামিল, মুসলিম, মালয়ী, পর্তুগীজ কত বিচিত্র! শুধু সিংহালাদের ভেতরেই তো কত বিচিত্র প্রকাশ তার– গালে-কলম্বোতে এক রকম, কান্ডির অলঙ্কার পরিহিত ঢাকীদের নাচে আরেক রকম, সিগিরিয়ায় বিশাল পাথরখণ্ডের ওপরের গড়ে তোলা রাজধানীতে স্বর্গপুরীর মত দেয়াল চিত্রে, অনুরাধাপুরের স্থাপত্যে। কিন্তু এখন সবার মধ্যে প্রবণতা হলো সবাই এক রকম হয়ে যাওয়া; বিশ্বকে এক রকম ভাবে তুলে ধরা। নৃতত্ত্বে এখন কার মাথা ব্যথা?'

দীপক: 'হ্যাঁ ডিজিট্যাল স্বয়ংক্রিয়তার জীবন, ইন্টেলিজেন্ট সেবায় জীবিকা, ইত্যাদির কারণে জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির বিচ্ছেদ ঘটাটি সহজতর বটে কিন্তু তাই বলে নৃততত্ত্ব তার অর্থ হারিয়ে ফেলবে একথা আমি মনে করিনা। বরং এটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, তেমনটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অনেক উৎসাহী মানুষ নৃতত্ত্বকে বিশ্ব নেটওয়ার্কে যুক্ত করে বরং তার আরো চমকপ্রদ চর্চা করছে।'

কাশিনজে: 'কিন্তু আমি যে নৃতত্ত্ব নিয়ে আরো কাজ করবো, চমৎকৃত হবো সে জন্য তো বৈচিত্রময় মানব গোষ্ঠিগুলোকে এখন চোখের সামনে বাস্তবতায় পাবোনা, তাকে শুধু ইতিহাসেই খুঁজতে হবে; এবং কাজটি হবে শুধু ইতিহাস চর্চা। চোখের সামনের মানুষগুলো তো ইন্টেলিজেন্টের সঙ্গেই কাজকারবারে রত।'

দীপক: 'ঠিক আছে, তাই যদি হয় তাহলে আমি ইতিহাসকেই চোখের সামনের বাস্তবতায় নিয়ে আসবো। আজকের ডিজিট্যাল সক্ষমতার গুণে ইতিহাস এখন বিশ্ব-নেটওয়ার্কে এমন ভাবে থাকছে যে আমরা যেন যখন খুশি তার মধ্যে বাস করতে পারি। "বাস্তব জীবন" কথাটিই তো এখন কিছুটা সেকেলে। আমরা

সবাই কখনো সনাতন সেকেলে বাস্তবে থাকি, কখনো ডিজিট্যাল বাস্তবে থাকি। তুমি আমি যদি আমাদের নৃতত্ত্বকে গুরুত্ব দিই, অথচ বাস্তবে তাকে না খুঁজে পাই, তা হলে তার ভার্চুয়্যাল রিয়্যালিটি সৃষ্টি করবো। সকলের জন্য সেটিকে আনন্দময় ও মননশীল জগত করে তুলবো। এটি আমরা ইতিহাসের গত হয়ে যাওয়া অধ্যায় হিসেবে নেবোনা, বরং এখনই অভিজ্ঞতা পেতে ও উপভোগ করার বিষয় হিসেবে নেবো। কেনিয়ার মাসাই কিশোর-কিশোরীদের বয়োপ্রাপ্তির অনুষ্ঠানে কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু যুদ্ধনৃত্যে আমরা ঠিকই যোগ দেবো, তবে ভার্চুয়্যাল রিয়্যালিটিতে।'

অপ্সরা: 'সত্যি তো, ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি মানে তো শুধু সিনেমা দেখা বা ভিডিও দেখা নয়; এ তো শরীরে-মনে-অনুভূতিতে ওই ঘটনার মধ্যে চলে যাওয়া। আমি যদি তার বিরাট গরুর পাল সহ মাসাইদেরকে অনুসরণ করতে পারি, ওদের বয়োপ্রাপ্তি অনুষ্ঠানে ওই কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে নাচতে পারি, তাহলে বাস্তবতার আর বাকি রইলো কোথায়? কাজেই আমাদের নৃতত্ত্বের চর্চা ইতিহাস হবে কেন? এটি খুবই বর্তমান।'

কাশিনজে: 'এটি আমার দেশের ব্যাপার, আমিও গোষ্ঠিগত ভাবে একজন মাসাই, সেজন্য অন্য কেনিয়ানদের থেকে একটু বেশি লম্বা মানুষ। চেহারা দেখেও অনেকে বুঝতে পারেন আমি মাসাই। ওই গরুর পাল অনুসরণের সব কথা জানি, কিন্তু কখনো নিজে সেটি দেখিনি। এখন হয়তো কেউ দেখেনা।'

দীপক: 'এখানেই তো আমাদের কাজ– আমরা যারা নৃতত্ত্ব ভালবাসি। হ্যাঁ বলতে পারো তুমি আমি পেশাদার মানুষ। জাহাজ চালাবার গুরু দায়িত্ব আমাদের; আমাদের সময় কম, ধৈর্য কম। আমাদের কাছে ওই মাসাই জীবন হারিয়ে যাওয়াটি খুব স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের হাতে এখন অখণ্ড অবকাশ। তারা জীবনটি কী ভাবে কাটাবে সেটি এখন তাদের হাতে। আমরা মনে করতে পারি এখন গরুর পালের কথা চিন্তা অর্থহীন কথা। কিন্তু "অর্থহীন সময়" কথাটিরই এখন কোন অস্থিত্ব নেই। মানুষ নিজের মননশীলতার যা যা করছে ও করবে তার অর্থ সে নিজেই তৈরি করবে। শিল্পকলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস সব কিছুর চর্চায় পেশাদার মানুষের খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই– সবই এখন আনন্দময় কাজ, মননশীল নাগরিকে কাজ। বিশ্ব নেটওয়ার্কের এক একটি লুপে এসব নানা কাজের হাজারো উপকরণ থাকবে।

ভার্চুয়্যাল রিয়ালিটির জন্য এখন যেটুকু আয়োজন দরকার হচ্ছে ক'দিন পর তাও লাগবেনা। আমাদের যাদের নৃতত্ত্বে বিশেষ আগ্রহ আছে তাদের কাজ হবে এর লুপকে সমৃদ্ধ করা। মানুষ যেন ক্রমাগত এতে সৃষ্টিশীল হয়, সেই সৃষ্টি যেন অন্য সব মানুষের কাছে বেঁচে থাকে।'

অপ্সরা: 'এমন ভাবে বল্‌ছেন যার ফলে আমার এখনই পেশাদার থাকার ইচ্ছেটা উবে যাচ্ছে।'

দীপক: 'মনে করবেননা এটি শুধু আপনার চিন্তা। এটি আসলে চিরন্তন মানুষের চিন্তা। মানুষ সব সময় আপন সৃষ্টিতে ভর করে উড়তে চেয়েছে সৌখিন ভাবে। নিষ্ঠুর পৃথিবী তাকে ধরে বেঁধে পেশাদার বানিয়েছে। যতদিন সে পেশাদার শিকারি ছিল, তার কিছু স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু পরে পেশাদার চাকরিতে বাধ্য হওয়ার পর শুধু স্বাধীন হবার স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু কখনো বাধ্যতামূলক কাজের থেকে স্বাধীন হতে পারেনি। যারা শারীরিক ভাবে কায়িক শ্রমে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিলো তাদেরতো চিন্তার শক্তিও অবশিষ্ট ছিলনা, স্বপ্ন দেখারও না। আজ মানুষ স্বাধীন। আপনার পেশাদায়িত্ব একটি স্বাধীন বিলাসিতা- যদি সত্যি ইচ্ছে উবে যায়, তা হলে জাহাজে আর আপনাকে বেশিদিন দেখবোনা।'

ওয়ালেস লাইন

আলফ্রেড ওয়ালেসের ভক্ত

ফিউচারের এবারকার যাত্রা অবশেষে সিঙ্গাপুরে এসে শেষ হলো। সোফিয়ার জন্য এটি এই পর্বের গবেষণারও শেষ। জাহাজ সিঙ্গাপুরে এসেছে মোম্বাসা আর কলম্বো থেকে বিরল কিছু শস্য আর মশলা জাতীয় খাদ্য আমদানী করে, সিঙ্গাপুরে আসার পেছনে এটি তার একটি উদ্দেশ্য। আরো বড় উদ্দেশ্য হলো ফিউচারকে এখানকার ড্রাই-ডকে তোলা। তাতে জাহাজের পুরো খোলটি হাতের সামনে নিয়ে এসে সেখানকার অসংখ্য সেন্সরের বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করা হবে ও এসবের বিন্যাসটি পুনর্বিবেচনা করা হবে। সোফিয়া তাঁর প্রাথমিক গবেষণা রিপোর্টগুলো ইতোমধ্যেই লেখার ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আপাতত কাশিনজে ও অপ্সরা ড্রাই-ডকে ফিউচারের সঙ্গে থাকবে; সোফিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী কাজের তদারকি করবে।

বাকিরা সবাই এ সময়টি ছুটিতে থাকবেন। সোফিয়া তো বেশ জমিয়ে পারিবারিক ছুটির আয়োজন করেছেন সেই কবে থেকে। স্বামী শান্ত এবং সন্তান রাহিল ও ময়নাকে এই একই সময় সিঙ্গাপুরে টেনে এনেছেন। পারিবারিক ছুটির আকর্ষণ তো অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু যেখানে এই ছুটি কাটবে তার প্রতি পরিবারের প্রত্যেকের একটি দুর্বার আকর্ষণ রয়েছে, কারণ তাঁরা সবাই নিজ নিজ কাজের বাইরে প্রকৃতি ও প্রাণীকে নানা ভাবে বুঝতে অত্যন্ত আগ্রহী। আর এমন মানুষের ছুটি মানে ওই আগ্রহকে রূপ দেয়া। এবারে এই বিশেষ জায়গাটি হবে ওয়ালেস লাইনের দুই পাশের দুই দ্বীপে। জীব বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়ালেস দেখিয়েছিলেন সমুদ্রে এই কাল্পনিক রেখাটির এক পাশের প্রাণীর সঙ্গে অন্য পাশের প্রাণীর গোষ্ঠিগত বিরাট পার্থক্য।

বন্দরে জাহাজেই ক্যাপ্টেন ব্রিজে ফিউচারের বিদায়ী পার্টিটি হলো। ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার ডুকাকিস রীতিমত আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লেন। আলাদিন তার ভাঁড়ার থেকে যাবতীয় গ্রীক চীজ সামনে সাজিয়ে রাখলেও সেদিকে আজ আলেকজাণ্ডারের বেশি মনোযোগ দেখা যাচ্ছিলোনা। তাঁকে ঘিরে সোফিয়া, দীপক, ওলেগ, অপ্সরা, কাশিনজে সবারই মনটা ভারি।

আলেকজান্ডার: 'আমরা এক ভাবে ছিলাম ফিউচারে কাঠখোট্টা জাহাজী হিসেবে, বন্দর থেকে বন্দরে পণ্য টেনে গেছি। কিন্তু সোফিয়া এসে সব বদলে দিয়েছিলেন- তিনি আমাদেরকে বিজ্ঞানী বানিয়েছেন। এখন তো আর আমাদের পক্ষে কাঠখোট্টা জাহাজী থাকার সুযোগ নেই! চলুন আমরা সোফিয়ার স্বাস্থ্য কামনা করি।'

দীপক: 'আমরা আমাদের জাহাজের নাম অনুযায়ী আগেও ফিউচারে ছিলাম। কিন্তু গত কিছুদিন আমরা সত্যিকার অর্থেই ফিউচারে বাস করেছি। প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি কাজে ভবিষ্যৎ ছিল আমাদের প্রেরণা। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। সোফিয়া আমাদের সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন।'

সোফিয়া: 'জাহাজী জীবন সম্পর্কে অপরিচিত ছিলাম না, কিন্তু গত কিছুদিন ফিউচারে যেমন ছিলাম, তেমন করে ওটির স্বাদ আগে কখনো পাইনি। বলা হচ্ছে এখানে ছিল সব কাঠখোট্টা জাহাজী। কিন্তু আমিতো দেখলাম আকাশ পাতালের যাবতীয় রস- তা কথার রসই থেকে আর রসনার রসই হোক- এখানেই তো পেলাম। এমন তো আর কখনো কোথাও পাইনি। কাজেই আমরা বরং ওই কাঠখোট্টা জাহাজীদের স্বাস্থ্য কামনা করি– চিয়ার্স!'

ওলেগ: 'আমাদের অপূর্ব শেফের জন্যও চিয়ার্স। আর আমাদের তৎপর স্টুয়ার্ট আলাদিন, আর আমাদের যাবতীয় ইন্টেলিজেন্ট বন্ধুদের, যাঁরা আমাদের হয়ে সব কিছু চালিয়ে গেছেন।'

সোফিয়া: 'শেষের ক'দিন অপ্সরা ও কাশিনজে আমার কাজে যে সহায়তা দিয়েছে আমি তাতে মুগ্ধ। ফিউচারকে এবারকার গবেষণা অনুযায়ী নতুন রূপ দিতে আপাতত তারা চমৎকার কাজ করতে পারবে। আমিও সব সময় ফিউচার টিমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবো।'

আলেকজান্ডার: 'ফিউচার টিমের স্বাস্থ্য কামনা করি- চিয়ার্স!'

সে রাতে আরেকটি পার্টি হয়ে গেলো সিঙ্গাপুরের ম্যারিটাইম হোটেলে– ওটি মানাজির পরিবারের পুনর্মিলনী পার্টি। দিনের দুই বিভিন্ন সময়ে বিমানে চট্টগ্রাম থেকে শান্ত ও ময়না, এবং হাওয়াই থেকে রাহিল চলে এসেছে সিঙ্গাপুরে, এই হোটেলে। ফিউচার ছাড়ার পর সোফিয়াও এখানে। বহুদিন এভাবে পুরো পরিবার এক হয়নি। কাল ভোরে শুরু হয়ে যাবে তাদের ছুটি কাটানোর যাত্রা। ওরা প্রথমে যাবে ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে, ছুটির সেখানকার অংশ কাটিয়ে অপ্রশস্ত সমুদ্র পার হয়ে বোর্নিও দ্বীপে। দুটাই বিশাল দ্বীপ– মানাজির পরিবারের গন্তব্য উভয়ের বিশেষ বিশেষ জায়গায়, এবং তার কারণগুলো কিন্তু দুর্দান্ত। বোর্নিও দ্বীপটিতে এক সময় মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ক্ষুদ্র ব্রুনেই দেশটি থাকলেও এখন দেশভিত্তিক বিভক্তিটি খুব স্পষ্ট নয়; সবই তো ওই দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের মধ্যেই, একই সাংস্কৃতিক আবহে রয়েছে। ওখানকার বড় আকর্ষণ তাদের বিখ্যাত বাদলবন– রেইন ফরেস্ট। আর্দ্র নিরক্ষীয় এই ঘন বনগুলোর বন্য প্রাণীর রয়েছে অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট। তাছাড়া দ্বীপের মধ্যে প্রকৃতির বৈচিত্র প্রচুর। এসব কারণে সাধারণ পর্যটকদের কাছে বেশ প্রিয় জায়গা এগুলো। কাছের ও দূরের বহু মানুষ আসে, তাদের জন্য আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ স্থাপন করেছে বহু পর্যটনকেন্দ্র। আবার স্থানীয় মানুষরাও পর্যটকদের মেহমানদারী করা ও গাইড হিসেবে কাজ করাকে একটি বেশ আনন্দময় সৌখিন কাজ হিসেবে নিয়েছে।

কিন্তু সোফিয়া এই জায়গাগুলো নির্বাচন করেছেন আরো কিছু কারণে। এর মূলে রয়েছে মানব মস্তিষ্কের বিবর্তনে তাঁর আগ্রহ। বিশ্ব সমিতিতে একাত্ম হয়ে শান্ত যেভাবে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সঙ্গে মানব বুদ্ধির সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর পড়াশুনার কাজ করেছেন তার একটি দিক সোফিয়াকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে। শেষ অবধি মস্তিষ্কের নিউরোন জালের একটি অনুকরণই ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির তথ্য-প্যাটার্ন উদ্ঘাটন ক্ষমতার পেছনে কাজ করেছে। কিন্তু সেই ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি মানব সচেতনতা, কল্পনা, আবেগ অনুভূতির ইত্যাদি থেকে এখনো অনেক দূরে। অনেকে মনে করছেন ভবিষ্যতে ওই গুণগুলো দিয়ে সমৃদ্ধ ইন্টেলিজেন্টও তৈরি হবে সাধারণ ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি হিসেবে এবং তা হবে মানব মস্তিষ্কের আরো গভীর অনুকরণের মাধ্যমে। সে জন্যই জানতে হবে মস্তিষ্কের যে বিশেষ ক্ষমতা, তা এসেছে কোন পথে। মানব মস্তিষ্কের বিবর্তনে

সব থেকে কাছের যে সব প্রাণীর মস্তিষ্ক গুরুত্বপূর্ণ তারা হলো এইপ বা নরবানর। এদের মধ্যে খুব সীমিত সংখ্যক এখনো সীমিত কয়েকটি জায়গায় টিকে আছে– তার মধ্যে রুয়ান্ডায় শিম্পাঞ্জি, কঙ্গোতে গরিলা, আর এখানে বোর্নিওতে ওরাংউটান। এবার সোফিয়া ওরাংউটানের কাছে থেকে তার ওপর ভালো ধারণা চান ছুটি কাটাবার অবকাশে।

তবে ওই শিম্পাঞ্জি বা ওরাংউটানের মত উন্নত মস্তিষ্কের পর্যায়ে আসার বহু বহু আগেও স্তন্যপায়ীদের পুরো গোষ্ঠির বিবর্তনের একেবারে গোড়াতে বুদ্ধির দিকে বড় বিপ্লব ঘটে গিয়েছিলো। তখন থেকে শুরু করে সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মস্তিষ্কের গঠনে ও কাজে অদ্ভুত মিল রয়েছে। এর বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা করলেই মানুষ পর্যন্ত অনেক বড়, অনেক জটিল, অনেক বেশি সক্ষম মস্তিষ্কের বিষয়ে ধারণা পাওয়া পাওয়া যায়; বোঝা যায় এটি কেমন ভাবে বিবর্তিত হয়েছে। আরো বোঝা যায় স্তন্যপায়ীর একেবারে শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়া-নিউগিনি ও কাছের কিছু দ্বীপ নিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ভূখণ্ডটি এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা মিলে বাকি মূল ভূভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে চলে গিয়েছিলো। এরপর থেকে ওখানকার স্তন্যপায়ীরা মূল ভূখণ্ডের স্তন্যপায়ীদের থেকে আলাদা ভাবে বিবর্তিত হয়েছে। ওখানকারগুলো ছিল ক্যাঙ্গারু ধরনের প্রাণী যেগুলো ক্ষুদ্র সাইজে জন্ম নিয়ে মায়ের পেটের খোলা থলেতে অনেক বড় হয়ে থাকে। এদের বলা হয় মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ী। আর বাকি পৃথিবীরগুলো প্ল্যাসেন্টাল স্তন্যপায়ী। এখনো এই দুই অঞ্চলে স্তন্যপায়ীরা আলাদা– অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদিতে আছে মারসুপিয়ালগুলো ক্যাঙ্গারু, ওয়াম্ব্যাট, ওয়ালাবি, কোয়ালা ইত্যাদি, আর এদিকে আছে প্ল্যাসেন্টালরা গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল বাকি সব। উভয় দলের মধ্যে স্পষ্ট ফারাক রয়েছে, একেবারেই মৌলিক ফারাক। উভয় দলের মস্তিষ্ক বিবর্তনের পথ ভিন্ন ধারায় গেছে। সেটি মস্তিষ্কবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ, ভবিষ্যতে ইন্টেলিজেন্টে ওর অনুকরণেও।

মজার ব্যাপার হলো বোর্নিও আর সুলাওয়েসি দ্বীপের পরস্পর দূরত্ব খুব কম হলেও বোর্নিও রয়ে গেছে এই ব্যাপারে মূল ভূখণ্ডে অর্থাৎ তার স্তন্যপায়ীরা বাদবাকি মহাদেশগুলোর মত, অথচ সুলাওয়েসির বেশ কিছু প্রাণী অস্ট্রেলিয়ার মত। ১৮০০ শতকের প্রথম অর্ধেকে এখানে প্রকৃতির পর্যবেক্ষণে কাটিয়েছিলেন ইংরেজ প্রকৃতিবিদ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। এই সরু

সমুদ্রের পরিসরে স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো গোষ্ঠি বদলে যাবার ব্যাপারটি তিনি প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন এই অঞ্চলের ম্যাপের ওপর সমুদ্রে একটি কাল্পনিক রেখা যেটি ইন্দোনেশিয়ার বালি ও লম্বক দ্বীপের মাঝখানের সমুদ্র দিয়ে গিয়ে ওই বোর্ণিও ও সুলাওয়েসি দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্র দিয়েও গিয়েছে। এই রেখার পশ্চিম পাশে সবখানে মূল ভূখণ্ডের স্তন্যপায়ী প্ল্যাসেন্টালরা আর পূর্ব পাশটায় সবখানে অস্ট্রেলিয়া-নিউগিনির মত মারসুপিয়ালরা। ওটিই 'ওয়ালেস লাইন'। এই লাইনের এই পাশে বোর্ণিও ও বালি দ্বীপে আমাদের পরিচিত প্রাণী, আর ওই পাশে সুলাওয়েসি ও লম্বক দ্বীপে অস্ট্রেলিয়ার মত প্রাণী। অথচ ওই দুই পাশের দ্বীপগুলোর মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান এত কম! মানাজির পরিবারের এবারের ছুটি কাটাবার গন্তব্য ওই ওয়ালেস লাইনের এপাশ ওপাশ। স্তন্যপায়ী বিকাশে, তাদের উন্নততর মস্তিষ্কের বিকাশের এই সীমান্ত অঞ্চলটির একটি আলাদা আকর্ষণতো রয়েছেই। বিজ্ঞানের দিক বাদ দিলেও এর দুই পাশের এমন ঘটনার রোমান্টিক আকর্ষণও কম নয়।

এই যে ওয়ালেস লাইনকে লক্ষ্য করে মানাজির পরিবারের ছুটির পরিকল্পনা করা এর মূল প্রেরণাটি এসেছে সোফিয়ার থেকে। সোফিয়া আলফ্রেড ওয়ালেসের একজন ভক্ত সেই ছোটবেলা থেকেই, যখন প্রথম বিবর্তনের ইতিহাস পড়েছেন। যাকে আমরা এখন ডারউইনের তত্ত্ব বলে জানি তা আলাদা ভাবে ওয়ালেসও আবিষ্কার করেছিলেন মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ার এই অঞ্চলের প্রকৃতিতে তাঁর দীর্ঘদিন গবেষণার ফলে। বহু বছর ধরে একেবারে নিজস্ব উদ্যোগে হেঁটে, নৌকায়, অত্যন্ত বিপদ সংকুল পরিবেশে এখানে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে তিনি এ গবেষণা করেছেন। এই আবিষ্কারের কথা চিঠিতে ডারউনের কাছে তিনি ব্যাখ্যা করলে ডারউইন তাঁর অবদানটি বুঝতে পারেন এবং সেটিকে স্বীকৃতি দেন– নিজের ও ওয়ালেসের একই বিবর্তন তত্ত্ব আবিষ্কার প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

ওয়ালেসের কীর্তির প্রতি সোফিয়ার বিশেষ আকর্ষণ এখানে নানা দ্বীপে বাদল বনের নানা এলাকায় তাঁর বৈজ্ঞানিক এ্যাডভেঞ্চারের জন্য, যা তিনি ওয়ালেসের ভ্রমণ ও আত্মজীবনী মূলক বইগুলো পড়েই জানতে পেরেছেন। প্রত্যেকটিতে ছড়ানো আছে এখানকার জীব-বৈচিত্রের বৈজ্ঞানিক ফুলঝুরি। দু'শ বছর আগে লেখা বইগুলো তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছে। এর

মধ্যে আছে কয়েক খণ্ডে রচিত বই 'মালয় দ্বীপপুঞ্জ', 'প্রাণির ভৌগলিক বন্টন', 'অসীম উষ্ণ অঞ্চল', 'দ্বীপ রহস্য উদ্ঘাটন'– এমনি সব দুর্দান্ত বই। ঠিক ছোট বেলায় না হলেও অল্প বয়সেই এসব তাঁকে ওয়ালেস লাইনে জীব-বৈচিত্রের হঠাৎ-সীমান্ত রেখাটির রহস্যের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো।

শান্ত ও বিশ্ব সমিতিতে তাঁর সঙ্গে বিতর্করত অন্যান্যরা যখন মানব বুদ্ধি ও ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সম্পর্ক নিয়ে এবং ভবিষ্যতে শেষেরটির মানুষের মত সচেতন হয়ে আত্ম প্রকাশের সম্ভাবনাগুলো চিন্তা করছিলেন, সোফিয়া তখন এর মধ্যে মানব মস্তিষ্কের গবেষণার সম্ভাব্য অবদান নিয়ে ভাবছিলেন। মানব মস্তিষ্ক দীর্ঘ বিবর্তনের সৃষ্টি– এর অনুকরণে কিছু গড়তে হলে ওতে বিবর্তনের পূর্ব-ধাপগুলোও বিবেচনায় আনা দরকার। তাই তাঁর কাছে ওয়ালেস লাইন, স্তন্যপায়ী বিকাশ, ওরাংউটান ইত্যাদির এত গুরুত্ব। এই ছুটির বিনোদন ও বিজ্ঞান উভয় আনন্দের মধ্যেই তাই এগুলোরই গুরুত্ব। এ যেন তাঁর বৈজ্ঞানিক হিরো ওয়ালেসরই পুরানো অভিযাত্রার একটি পুনর্যাত্রা– দুইশ' বছরের ব্যবধানে মূল যাত্রার সম্পূর্ণ রূপ খোল নল্‌চে সহ বদলে গেছে। এখন এটি শুধু জীব-বৈচিত্রের বিষয় নয়, বরং দুই বুদ্ধির ভবিষ্যতের বিষয়।

আরেকটি সমুদ্র যাত্রা

পরিবারের অন্যান্য সবার আনন্দ হলো প্রকৃতির মধ্যে যত বেশি পারা যায় এক সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ। অবশ্য সেই সঙ্গে যার যার দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আগ্রহের বিষয়টিও এখানে ঝালিয়ে নিতে ইচ্ছুক। ময়না তো প্রকৃতির কোলে সমর্পিত আর্টিস্ট। তার মধ্যে বন্য প্রাণী, জীব-বৈচিত্রের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। সারাদিন ক্ষণে বৃষ্টি ক্ষণে রোদ, অত্যন্ত ঘন লতা-পাতায় আঁকড়ে ধরা বন থেকে একটু ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে দাঁড়াতে পারলে হয়তো দেখা যায় জ্বল জ্বল করা দুটি চোখ। তারপর পুরো প্রাণী যখন দৃশ্যমান হলো সে এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক দেহভঙ্গি। কী জাদু আছে সেই চোখে, সেই দেহভঙ্গিতে? আর্টিস্টের চোখে সেটি আবিষ্কারের সুযোগ হয়তো মিলবে।

রাহিলের ইচ্ছে বোর্নিওতে সাবাহ আর সারাওয়াকের ডায়াক আদিবাসীদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হোক। ওখানে এক দিকে নদী অববাহিকার সমতলে অন্য দিকে পাহাড়ি বনে অন্তত ২০০ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠির বেশ ক'টির

এলাকায় তাদের যাওয়ার কথা রয়েছে। ওদের সবাইকে ডায়াক বল্লেও গোষ্ঠিগুলোর প্রত্যেকটির রয়েছে আলাদা সংস্কৃতি, ভাষা, জীবনযাত্রা। এক সময় পলিনেশিয়ার আদিবাসীদের মত এই ডায়াকরাও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মানুষ ছিল, তাদের একেবারেই নিজস্ব গণ্ডিতে প্রকৃতির মধ্যে সম্ভাব্য জীবিকা গড়ে নিয়ে। আজ তারাও বিশ্ব নাগরিক, প্রযুক্তির সুবিধাভোগী। তা সত্ত্বেও তারা বরং নিজেদের কালচার ধরে রাখার ক্ষেত্রে আরো আগ্রহী, আরো স্বাধীন।

শান্তর উৎসাহটি অনেকটা সোফিয়ার মতোই– অন্তত দুই বুদ্ধির সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনায়। এ নিয়ে মানব বিবর্তনের জ্ঞানকে কাজে লাগাবার বিষয়টিও তিনি দেখতে চান যদি সেই সুযোগ পান। শান্ত ও রাহিল অবশ্য পুরোটা সময় থাকবেননা, সোফিয়া ও ময়নাকে ওরাংউটানের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাতে দিয়ে ওরা একজন চট্টগ্রামের ও অন্যজন হাওয়াইয়ের বিমান ধরবেন।

এই সব কিছুর পরিকল্পনা করে রেখেছিলো মানাজির পরিবারের একান্ত ইন্টেলিজেন্ট আপন জন। একবার পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলার পর বিমানের টিকেট, সিঙ্গাপুরের হোটেল, পুনর্মিলনী পার্টি– সব আয়োজন তারই করা। পরিবারে যে যখন যেখানে থাকুক সহকারী নানা ইন্টেলিজেন্ট যেন অদৃশ্য ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গেই আসে। মূল সমন্বয়ের ভার আপন জনের হলেও তাপসী রচনা সবাই আছে, অন্যান্য প্রয়োজনে।

যাত্রা শুরু হলো একটি সমুদ্র ভ্রমণের মাধ্যমে, সিঙ্গাপুর থেকে সুলাওয়েসি দ্বীপের বন্দর নগরী মাকাসারে। এজন্য টিকেট করে রাখা হয়েছিলো যাত্রীবাহী জাহাজ এম ভি নুসাত কেনারির যা তাঁদের নিয়ে যাবে মাকাসারে। এই দ্রুতগামী জাহাজ মানাজির পরিবারকে তিন দিনের সমুদ্র ভ্রমণ শেষে তাঁদের ছুটির একটি গন্তব্য সুলাওয়েসি দ্বীপে নিয়ে যাবে। নুসাত কেনারি এই সমুদ্রে ক্লিপার লাইন নামের জাহাজ কোম্পানীর তথাকথিত ক্লিপার জাহাজগুলোর একটি। জাহাজ উন্নয়নে বেশ এগিয়ে থাকা এ কোম্পানীর কাজকর্মের সঙ্গে সোফিয়া বেশ পরিচিত ছিলেন। তাই এই সুযোগে তাদের ক্লিপার জাহাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ হলো।

কোম্পানীর নাম এবং জাহাজগুলোর টাইপকে যে ক্লিপার বলা হয় তার কারণটি ঐতিহাসিক। পালের জাহাজের যুগের একেবারে সমাপ্তির কালে

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দশকগুলোতে দ্রুতগামী বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জাহাজের প্রাধান্যের মধ্যেও গতিবেগের দিক থেকে পালের সম্মানটি কিছুটা ধরে রাখতে পেরেছিলো কিছু জাহাজ, যাদেরকে বলা হতো ক্লিপার। এগুলো সাধারণত চীন থেকে চা দ্রুত বৃটেনে নিতে এবং হল্যান্ড থেকে যাত্রী সেদেশের উপনিবেশ জাভাতে (ইন্দোনেশিয়ায়) নিতে ব্যবহৃত হতো। এরকম দীর্ঘ পথ একটানা পালের সাহায্যে বাষ্পীয় জাহাজের থেকেও দ্রুতবেগে চলা চাট্টিখানি কথা ছিলনা। সেই খ্যাতিমান নামটি গ্রহণ করেছে সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া কেন্দ্রিক এই জাহাজ কোম্পানী। শুধু তাই নয় আধুনিক জাহাজ গবেষণার যথাসম্ভব প্রয়োগ করেছে তারা এই ক্লিপার জাহাজগুলোতে, আবার উনবিংশ শতাব্দীর ক্লিপারে ব্যবহৃত কিছু কিছু কৌশলেরও সমন্বয় ঘটিয়েছে।

যেমন নুসাত কেনারি জাহাজটি বেশ ছিমছাম সরু করে তৈরি যাতে পণ্যবাহী গবেষণা জাহাজ ফিউচারের আদল যেমন আছে, তেমনি সেই পুরানো ক্লিপারের আদলটিও ধরা পড়ে। সিঙ্গাপুর এবং মাকাসার দুটিই ব্যস্ত বন্দর– এ দুইয়ের মাঝে পণ্য পরিবহন যেমন যথেষ্ট তেমনি যাত্রীরাও আজকাল সমুদ্র পথেই এখানে আসা যাওয়া করতে পছন্দ করে, বিশেষ করে পর্যটকরা। সুলাওয়েসি দ্বীপের অনেক আকর্ষণ। আবার এখান থেকে সহজগম্য ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার অন্যান্য দ্বীপগুলোর বিচিত্র প্রকৃতি দুনিয়ার সব জায়গা থেকে পর্যটক আকর্ষণ তো করেই। তাই এখানকার জাহাজ কোম্পানীগুলোর মধ্যে আছে দারুণ প্রতিযোগিতা– দ্রুতগামী হবার এবং একই সঙ্গে আরামদায়ক হবার দাবি নিয়ে।

নুসাত কেনারি ডানাপাল ব্যবহার করে। প্রধান ডেকের বড় অংশতেই পর পর অনেক ডানাপাল গিজ গিজ করছে– ফিউচার জাহাজের স্টাইলেই অনেকটা। তার সঙ্গে রয়েছে আধুনিক উদ্গীরণবিহীন শক্তিশালী ইঞ্জিন। সরু, অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজ সর্বাধিক সংখ্যক পালের বিন্যাস ঘটিয়ে সেই উনবিংশ শতাব্দীর ক্লিপার যেমন যাত্রী বহন করতো, এই আধুনিক জাহাজও তাই করছে। তবে উভয়ের মধ্যে যাত্রীদের আরাম আয়েশে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। নুসাত কেনারি এতে অভাবনীয় এগিয়ে গেছে আধুনিক গবেষণার সাহায্য নিয়ে। প্রতিযোগিতার বাজার যাত্রী-নন্দিত হবার জন্য সম্ভাব্য সবই করেছে। জাহাজের কাজের মানুষ যেন বেশি জায়গা না নেয় সেজন্য সেবার

কাজগুলো সব ইন্টেলিজেন্ট রোবটদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়েছে। জাহাজ চালাবার ক্ষেত্রেও ক্যাপ্টেন সহ দুই তিন জন ছাড়া অধিকাংশই ইন্টেলিজেন্ট। যাত্রীসেবায়ও প্রধান ব্যক্তিটি অবশ্য মানুষ, জাহাজের চীফ স্টুয়ার্ট। সিঙ্গাপুর থেকে মাকাসার এই পুরো পথের আবহাওয়া বায়ুবেগ, স্রোতের পরিস্থিতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে চলার মত করে জাহাজের গতির প্রোগ্রাম করা আছে।

এমন জাহাজে সব থেকে বড় সমস্যা হলো ওই সরু ছোট জাহাজে যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট খোলামেলা পরিবেশে সৃষ্টি করা। প্রধান ডেকের বড় অংশ ডানাপালে আচ্ছন্ন। গতি বজায় রাখার স্বার্থে এই ডেকের ওপর উঁচু কোন ঘরের মত স্থাপনার সুযোগ নেই। কাজেই প্রধান ডেকের সামান্য ওপরে এবং তার নিচে যাত্রীদের জন্য খোলামেলা কেবিন, ঘোরার ও বিনোদনের জায়গা ইত্যাদি সৃষ্টি করতে সাম্প্রতিক কালে প্রচুর গবেষণা করতে হয়েছে। অত্যন্ত কুশলী বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাইরের আলো, বাতাস, দৃশ্যাবলী ওরকম জায়গাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এমনি একটি সুন্দর পরিপাটি ক্যাপ্টেন্‌স রিসেপশন রুমে নুসাত কেনারির ক্যাপ্টেন ইন্দ্রজিৎ হাত্তা সোফিয়াকে চা পান ও আলাপের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি ইতোমধ্যে খবর পেয়েছেন যে খ্যাতনামা জাহাজ গবেষক সোফিয়া মানাজির এই জাহাজেই সপরিবারে ভ্রমণ করছেন এবং জাহাজটির আধুনিক সংযোজনগুলো এই সুযোগে নিজে দেখতেও চান। খুব খুশি হয়ে ক্যাপ্টেন তাঁকে জাহাজে যখন যা ইচ্ছে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ইন্দ্রজিৎ: 'আপনাকে, জনাব শান্ত মানাজিরকে এবং ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের জাহাজে এক সঙ্গে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আশা করি আপনাদের সবাইকে আনন্দদায়ক ভ্রমণ ও আতিথ্য দিতে পারবো। তা ছাড়া আপনি যদি এর যে কোন দিক ইচ্ছেমত দেখেন, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে দেয়া অফিসারকে যা খুশি জিজ্ঞেস করেন, খুব ভাল লাগবে।'

সোফিয়া: 'সর্বাধুনিক জাহাজের নীতিতে গড়ে তোলা এমন একটি জাহাজে থাকতে পারাটাই তো আমার জন্য আনন্দে বিষয়। আপনি যে এতে ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আরো উন্নয়নের ক্ষেত্রে কয়েকদিন আগেও যে পণ্যবাহী জাহাজে আমি গবেষণায় ছিলাম তার

ফলাফলের কিছু কিছু হয়তো সহজেই এই নুসাত কেনারির মত জাহাজগুলোর ওপরও প্রয়োগ করা যেতে পারে। বিশেষ করে যাত্রীবাহী জাহাজে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। দুনিয়াকে বাঁচাতে হলে এই সিঙ্গাপুর-মাকাসারের মত মাঝারি দূরত্বেও জাহাজে চলাটি সবার কাছে আকর্ষণীয় করতে হবে। আপনার আমার জন্য এটিই বড় চ্যালেঞ্জ।'

ইন্দ্রজিৎ: 'এই জাহাজে আমাদের যাত্রী অতিথি সবাই যেন একটি চমৎকার সমুদ্রযাত্রা উপভোগ করতে পারেন এ জন্য আমরা আধুনিকতম সকল ব্যবস্থা নিয়েছি, বিশেষ করে খোলামেলা জায়গার অনুভূতি সৃষ্টি করতে। ক্লিপার লাইনসের এরকম তিন চারটি জাহাজ রয়েছে যেগুলোতে আমরা এক রকম ভার্চুয়াল স্পেস সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। এ যেন আমাদের চেতনাকে ফাঁকি দিয়ে কি কেবিনে, কি প্রধান মূল ডেকের নিচে বেড়াবার জায়গায় সমুদ্রের যাবতীয় খোলামেলা অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা। আমরা যে আসলে খুব আঁটসাট অবস্থাতে রয়েছি সেটি এভাবে বেমালুম ভুলিয়ে দিতে পারে। এতে বাইরের শুধু আলো বাতাসকে ভেতরে নিয়ে আসা হচ্ছেনা, বাইরের দৃশ্যকেও সরাসরি একটি লেন্স-মিরর সিস্টেমের মাধ্যমে ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছে। তার সঙ্গে সর্বাধুনিক মাল্টিমিডিয়াও একেবারে মসৃণভাবে মিশে গিয়ে এই খোলামেলা সমুদ্র-হাওয়ার পরিবেশটি সৃষ্টি হয়েছে। এটি প্রধান ডেকের নিচে একের পর এক দুটি ডেক জুড়ে করা হয়েছে।'

সোফিয়া: 'ধন্যবাদ। এই দিকটাই আমি বিশেষ করে দেখতে চেয়েছিলাম। একদিকে জাহাজের গতি যথাসম্ভব বাড়িয়ে নেয়া ও একে সম্পূর্ণ পরিবেশ-বান্ধব করার চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে যাত্রীবাহী জাহাজে যাত্রীদের জন্য একটি উপভোগ্য ও আরামদায়ক খোলামেলা বড় পরিসর সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ– এই দুটিকে মেলানো বড় কঠিন। প্রথমটি আমার বেশি পরিচিত, যেহেতু আমি সরাসরি জড়িত। দ্বিতীয়টিতেও দেখছি আরো গবেষণা কাজের সুযোগ বিস্তর। আমার মজা লাগছে যে এতে আর্টস এবং সায়েন্স যেন এক সঙ্গে মিলে এই চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করছে। আমি ব্যাপারটি যেমন দেখছি, তেমনি সঙ্গে আমার মেয়ে ময়না সে আর্টের দিক থেকে দেখছে, সার্থক আর্ট-পরিবেশ মনকে যেভাবে অন্য জগতে নিয়ে যেতে পারে। সে মূলত আর্টের নানা আঙ্গিক নিয়ে

এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালবাসে। এখানে যেভাবে পরিবেশটি সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে সে নিজের ভাবনার অনেক খোরাক পাবে।'

ইন্দ্রজিৎ: 'আশা করি তারও একটি ভাল অভিজ্ঞতা হবে! আমি ময়নার সঙ্গেও কথা বলতে উন্মুখ হয়ে থাকবো। আসলে আজ রাতে সব সম্মানিত যাত্রীদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ডিনার পার্টিতে আমি মানাজির পরিবারের সঙ্গে আলাপের জন্য মুখিয়ে আছি; বিশেষ করে জনাব শান্ত মানাজিরের সঙ্গে। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিয়ে তাঁর উৎসাহ আর কাজের কথা শুনেছি। এখানে যাত্রীদের শুধু সেবায় নয়, তাঁদের জন্য ঐ খোলামেলা উপভোগ্য পরিবেশের অনুভূতি সৃষ্টিতেও কাজ করছে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি। একই ডেকের চারিদিকে যে একেবারেই জীবন্ত দৃশ্যকল্প সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে তাদের হাত রয়েছে। বাইরের রোদের আলো এবং সমুদ্র দৃশ্য লেন্স সিস্টেম দিয়ে প্রজেক্ট করার জন্য উপযুক্ত না হলে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি তাকে উপযুক্ত করে তোলে। তারাই আবার সন্ধ্যার পর সমুদ্রের হাওয়ায় খোলা আকাশ দেখার পরিবেশও করে দেয়। গল্প করে হাঁটার জন্য বাইরে প্রধান ডেককে একেবারে কিনারা দিয়ে ঘিরে পরিক্রমণের যে রাস্তাটি ও চত্বরটি খোলা আকাশের নিচে করা হয়েছে সেখান থেকে সমুদ্রে কাছের অথবা অনেক দূরের বিভিন্ন দৃশ্য, প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়কে খুঁটিয়ে দেখা, সেখানকার পানির নিচের জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী, ক্ষুদ্র জীব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য নানা ডিভাইসগুলোও ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর হয়।'

সোফিয়া: 'আমাদের জন্য জাহাজকে আবার মানুষের প্রধান যানবাহনে পরিণত করতে হবেই অন্তত সিঙ্গাপুর-মাকাসারের মত এরকম মাঝারি দূরত্বের পথে। ক্লিপার্স লাইন এদিক থেকে যা করছে তার বিশ্বব্যাপী প্রভাব রয়েছে, এ কথা আপনি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে আমার শুভেচ্ছাসহ জানালে খুশি হবো। গবেষণা নুসাত কেনারির মত জাহাজকে যত আকর্ষণীয় করেছে তাতে সর্বত্র যাত্রীরা এতে ভ্রমণের আগ্রহী হবেন তা আশা করা যায়। চার পাঁচ দিন পর্যন্ত এমন উপভোগ্য ভ্রমণ ব্যস্ত কাজকর্মের আসা যাওয়ার জন্যও চলতে পারে, আর অবকাশ কালে তো আরো দীর্ঘ ভ্রমণও অনেকেই এতে করবেন। এভাবে করতে পারলে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতি সৃষ্টিকারী বিমান ভ্রমণকে আমরা শিগ্‌গির ন্যূনতমে পরিণত করতে পারবো।'

সুলাওয়েসি

ম্যাপের মধ্যে দেখলে এই অদ্ভুত আকৃতির দ্বীপটিকে কয়েক বাহু নিয়ে চরকির মত মনে হলেও এটি আসলে একটি বিশাল দ্বীপ। এর পরিবেশ-বৈচিত্র আর প্রাণী-বৈচিত্র অসাধারণ। মানাজির পরিবার এখানে ছুটি কাটাতে চেয়েছে প্রধানত এটি ওয়ালেস লাইনের ঠিক ওই পারের দ্বীপ হওয়াতে, মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ীদের প্রথম দেখা যেখানে মেলে। কিন্তু ওই বৃহত্তর বৈচিত্রেও তাদের আগ্রহ কম নয়। আসলে মারসুপিয়াল এখানে মাত্র কয়েক ধরনের, এই পারের অর্থাৎ আমাদের অঞ্চলের মত স্তন্যপায়ী প্ল্যাসেন্টালও প্রচুর রয়েছে– কিন্তু তারও অনেকগুলো অদ্ভুত ধরনের। তাঁরা অবশ্য ছুটি কাটাতে ফোকাস করেছেন দ্বীপটির উত্তর ভাগে যেখানে রয়েছে ঘন বাদল বন– এটিইতো মালায়ান দ্বীপপুঞ্জের সেই নিরক্ষীয় রেইন ফরেস্টের আসল জায়গা! আর এখানেই রয়েছে সোফিয়ার জন্য একটি বড় আকর্ষণের প্রতিষ্ঠান ওয়ালেস ম্যামাল এভোল্যুশন রিসার্চ সেন্টার (ওয়ামের্স)। সোফিয়ার সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানের পত্রালাপ বহুদিনের, তাদের পত্রিকায় সোফিয়া এ সম্পর্কে নিজের ধ্যান ধারণার কথা বহুদিন লিখেছেন। এবারই প্রথম সামনা সামনি দেখা হবে; তাদের সাহায্য নিয়ে বাদল বনেই সুলাওয়েসির অন্যান্য অঞ্চলের অদ্ভুত প্রাণীগুলোর পরিচয় পাওয়া যাবে। তাদের পার্ক মিউজিয়ামটি এদিক থেকে খুবই কাজে আসবে। তাছাড়া তাঁর যে মূল আগ্রহ ভবিষ্যতে আত্মসচেতন ইন্টেলিজেন্ট সৃষ্টির সম্ভাবনা কোন্ পথে আসতে পারে, সে সম্পর্কেও ওদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে ইচ্ছুক তিনি।

ছুটির দিনগুলো শুরু হয়ে গেছে। এক সঙ্গে পুরো পরিবার আবার অতীত দিনের মত আয়েশ করে খুনসুটি করতে করতে দূর প্রকৃতির কোলে। ঘন বনের অনেক ওপর দিয়ে সেখানে এক গাছের ছড়ানো শাখা-প্রশাখা-পাতার সমারোহের সঙ্গে আরেক গাছেরটি একেবারে মিশে গিয়ে বিশাল শামিয়ানা গঠন করেছে। ওর তলায় এবং ওর ভেতর দিয়ে চলছে তাদের হাঁটাচলা অভিযাত্রা। ওখানে রয়েছে ওই শামিয়ানার ভেতর দিয়েই উড়াল হাঁটা পথ। প্রায় দিন সকালে সেটি দিয়ে একটি প্রাতভ্রমণ হয়ে যায়। অদ্ভুত সুন্দর সব পাখির কল কাকলির ভেতর পথটি গাছের শাখা-প্রশাখা ছুয়ে চলে গেছে।

ওখানে ওদের বাসা যেমন দেখা যায়, তেমনি গাছের ওপর জমা শ্যাওলা, লতা, পরগাছা ইত্যাদির দৃশ্যও কম চমকপ্রদ নয়। ওই উড়াল পথে হাঁটতেই মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে বেশ খানিকটা বৃক্ষহীন খোলা জায়গা। সেখানে উড়াল পথ থেকে নেমে আসার ব্যবস্থা রয়েছে। খোলা জায়গায় রয়েছে ঝোপঝাড়, ছোট হ্রদ ইত্যাদি– বনের কোন কোন প্রাণীর আনাগোনা, বিশ্রাম, খেলাধূলার অবকাশ ঘটে ওখানে। পিকনিক ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করার সুন্দর জায়গা। এসব প্রাণীর অনেকগুলো শুধু এই সুলাওয়েসি দ্বীপেই রয়েছে। তার মধ্যে, এই নিভৃতে আসা পাখি, সরীসৃপ, পতঙ্গ সবই আছে– স্তন্যপায়ী তো আছেই।

এসবে ময়নার আকর্ষণ অন্যদের থেকে আলাদা– সেটি শিল্পীর আকর্ষণ, সে ক্যামেরা, ইজেল, ক্যানভাস, রং-তুলি সব সঙ্গে রাখে। সবাই নানা কথার ফাঁকে পশুপাখিগুলোর জীবতত্ত্ব নিয়েই আলাপ করে। সোফিয়া এই একটি বিষয় পরিবারের সবার মাথায় ঢুকাতে পেরেছিলেন– জীববিজ্ঞানে তাঁর নিজের সৌখিন উৎসাহকে। তিনি নিজে জাহাজ বিজ্ঞানী, শান্ত আর রাহিল কম্পিউটার ও ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির উৎসাহী হিসেবেই অন্তত ছাত্রজীবনে গড়ে ওঠেছিলো– কিন্তু তারা সবাই জীববিজ্ঞানীর মত করে কথা বলে। মনের উৎসাহটাকেই এখন সবাই গুরুত্ব দেয়।

একটি বড় গাছের নিচের দিকে লেপটে আছে যেন ভালুকের মত দেখতে একটি প্রাণী। তার পেটের থলের মধ্যে বসে একটু মাথা বের করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সুন্দর একটি বাচ্চা। অস্ট্রেলিয়ার সুপরিচিত কোয়ালার মত দেখতে প্রাণীটি, সুলাওয়েসির একটি মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ী– ভালুক কুসকুস। দ্বীপটি ওয়ালেস লাইনের ঠিক পূর্ব পাশে হবার হাতে নাতে প্রমাণ– বিরল হলেও এখানে বেশ কয়েক প্রজাতির মারসুপিয়াল আছে। ওয়ালেস লাইনের পশ্চিমে কোথাও কোন মারসুপিয়াল নেই। আরো যে দু'একটি মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ী এ দ্বীপে আছে সেগুলোও ভালুক কুসকুসের থেকে খুব বেশি আলাদা রকমের নয়। সবই ইঁদুর জাতীয় গোষ্ঠি পোসামের অন্তর্ভূক্ত। যেমন এর একটি হলো বেঁটে কুসকুস। আকারে ভালুক কুসকুসের থেকে ছোট, মুখটি ভালুকের মত না হয়ে ইঁদুরের মত; সব অবয়ব কোয়ালার মতো মারসুপিয়াল– পেটের থলিতে বাচ্চা, সেই গাছে সারাদিন অলস ঘুম।

বাদবাকি স্তন্যপায়ীরা কিন্তু প্লাসেন্টাল অর্থাৎ আমাদের চির পরিচিত ধরনের। তবে সেক্ষেত্রেও এই দ্বীপে কতগুলো অদ্ভুত প্রাণী আছে, যার কোন কোনটি দ্বীপের অন্য অংশে থাকে- তবে ওয়ামের্সের অভয়াশ্রমে রাখা আছে পর্যটন ও গবেষণার স্বার্থে– সোফিয়ারা এখানেই দেখলেন। বেশকিছু বানর অবশ্য এই বাদল বনেই রয়েছে, এবং সেগুলো আমাদের দেশি বানরের মত হলেও তার মধ্যে কতগুলো অদ্ভুত-দর্শন। টারশিয়ের জাতীয় ক্ষুদ্র এক রকম বানর একশ' দেড়শ' গ্রামের বেশি ওজনের হয়না! এই বাদল বনেই আছে, কিন্তু এত ক্ষুদ্র বানর বনের ডাল পাতার আড়ালে দেখা যাওয়ার সুযোগ হয়নি। কিন্তু ওই অভয়াশ্রমে আবদ্ধ জায়গায় তাকে দেখেছেন। ছাগল সাইজের পূর্ণ বয়স্ক মহিষ দেখতে কেমন লাগে! বনের মধ্যেই একটি জলার মত জায়গায় এদের একটি রীতিমত পারিবারিক দলের সাক্ষাৎ পেলো, আর অনেকক্ষণ ধরে তাদের যাবতীয় আচরণ লক্ষ্য করলো। ছোট্ট সাইজ, অথচ যাবতীয় চেহারা ও আচরণ সাধারণ বিশালকায় মহিষের মত, দেখলে ইঁচড়ে পাকা মনে হয়। সুলাওয়েসির বিখ্যাত আনোয়া মহিষ এরা। আবার দেখা মিল্‌লো শূকর-হরিণের সঙ্গেও; হুবহু দাঁতালো শূকর, অথচ ভাবসাব হরিণের। এমন অদ্ভুত প্রাণী আর কোথায় দেখা যেতো? বড় দাঁত দুটি মুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে আবার ঘুরে পেছনের দিকে চলে গেছে। যে ক'টি দিন সুলাওয়েসির ওই বাদল বনে তাঁরা কাটালেন এখানকার প্রাণীকূলের অদ্ভুত সব উদাহরণ তাঁদেরকে মুগ্ধ করে রাখলো।

বনের অভিযান অব্যাহত থাকলেও এর মধ্যে সোফিয়া আর শান্ত প্রচুর সময় কাটালেন ওয়ামের্সে– এর অতিথি গবেষণাগারে। আগে থেকে রেজিস্ট্রি করা অতিথি বিজ্ঞানীদেরকে এখানকার গবেষণাগারে কাজ করার আর স্টাফ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ দেয়া হয়। তাঁদের বিশেষ আগ্রহ স্তন্যপায়ী বিবর্তন ও ইন্টেলিজেন্ট বিকাশ নিয়ে। প্রথমটি জীব-বিবর্তনে বহু মিলিয়ন বছর ধরে ঘটেছে আর দ্বিতীয়টি মানুষের হাতে গত শ'খানেক বছর ধরে ঘটে চলেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিকে মানুষের বুদ্ধির মত সাধারণ বুদ্ধিতে পরিণত করতে শেষেরটিকে প্রথমটির কাছে শিখতে হবে। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিয়ে মানুষের এই ইচ্ছা পূরণে যারা কাজ করছে সোফিয়া তার মধ্যে একজন নন। কিন্তু এই সম্ভাবনাটির দিকে তাঁর দারুণ আগ্রহ আছে

জীববিদ্যার দিক থেকে। আর শান্তর জন্য আগ্রহটিতো আরো বেশি; যেজন্য তাঁকে এর ওপর নিয়মিত লিখতে হয়, বক্তৃতা দিতে হয়, বিশ্ব সমিতির আলোচনায় যোগ দিতে হয়। তাই ছুটির মধ্যে রথ দেখা কলা বেচা দুটিই চল্‌ছে– দুটিই অবশ্য ছুটির আনন্দেই।

ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির ভবিষ্যৎ

ওয়ামের্সে সোফিয়ার আলোচ্য বিষয়গুলো অনিবার্যভাবে গড়িয়েছে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির ভবিষ্যতের দিকে। এর ওপর কেন এতো গুরুত্ব? ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির কার্যকারিতাকে একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে– এমন চিন্তা সবার মধ্যে। অন্যদিকে একটি পর্যায়ে গিয়ে সেই বুদ্ধি মানুষের অন্তর্দৃষ্টির বুদ্ধির সমকক্ষ হবে, সেটিও খুব কাম্য। কিন্তু তখন আরো এগিয়ে মানুষকে ছাড়িয়ে গিয়ে সুপার ইন্টেলিজেন্টে পরিণত হয়ে এর এক ভয়ঙ্কর রূপ নেবারও আশঙ্কা থাকে। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি প্রয়োগ করে দুনিয়াকে আগাগোড়া বদলে দেবার যে মহাযজ্ঞ চলছে, তাতে যে এই গতি শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যেতে পারে এই প্রশ্নটি চিন্তাশীল অনেক মানুষের মনে জাগতেই পারে।

সোফিয়া যে সময় ওখানে, সে সময়েই ওয়ামের্সে একটি গবেষণা ওয়ার্কশপ চলছিলো যার বিষয় 'সুপার ইন্টেলিজেন্ট কি অবশ্যম্ভাবী, তা হলে সেটি আসবে কোন্ পথে?' ওরকম কল্পিত সুপার ইন্টেলিজেন্টের সঙ্গে মানব মস্তিষ্কের, বা বলতে গেলে স্তন্যপায়ী মস্তিষ্কের জৈব বুদ্ধির প্রক্রিয়াগুলো জড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা প্রবল বলেই এমন বিষয়ের আলোচনা এখানে এসেছে। ওয়ার্কশপে তাই চল্‌ছে চিন্তার ঝড়। যেমন সিলিকন ভ্যালি থেকে এসেছেন ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির বিশেষজ্ঞ জর্জ প্যাটারসন, ওয়ার্কশপের একজন আমন্ত্রিত বিজ্ঞানী হিসেবে। অতিথি সোফিয়া আর ওয়ামের্সের বিবর্তনবিদ আফিয়া আইদিতের সঙ্গে তারই একটি কথোপকথন হয়ে গেলো।

সোফিয়া: 'যত কথাই বলি এখন পর্যন্ত রক্ত-মাংসের মস্তিষ্কই সব কিছু সৃষ্টি করেছে। কাজেই সব বুদ্ধির সূত্রপাত জৈব বুদ্ধি থেকে; এটিই ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা তীক্ষ্মতর হয়ে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির জন্ম দিয়েছে। সেটি এখন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারে, বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারে, অনুরোধ পেলে ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার করে কোন বিষয়ে রচনা লিখতে

পারে, সৃজনশীল রচনাও। তবে সেকাজ করাতে যন্ত্র কি অন্য কিছু হয়ে গেছে? আমরা একটি দৃষ্টি-বিভ্রম সৃষ্টি করেছি যে এটি কোন যন্ত্র নয় আমাদের বুদ্ধির মতই দ্বিতীয় একটি বুদ্ধি। ভবিষ্যতে কোন একদিন এটি সত্যি সত্যি আত্মসচেতন এরকম স্বাধীন বুদ্ধি হবে সেই চিন্তাও সব সময় করছি। কিন্তু মস্তিষ্কের জৈব বুদ্ধির সরাসরি সহায়তা না নিয়ে সেটি কি আদৌ কোন দিন সম্ভব হবে? আমার তো মনে হয় লক্ষ বছরের বিবর্তনের ওই ফলটিকে বাদ দিয়ে শুধু যান্ত্রিকতার ওপর ভর করে এর সফল হবার সম্ভাবনা কম।'

জর্জ: 'কিন্তু সোফিয়া, এই আত্মসচেতনতা জিনিসটি কি আমরা পুরাপুরি বুঝি? তা হলে কেমন করে এতো নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে রক্ত-মাংসের মস্তিষ্কের মত না হলে কারো পক্ষে সেটি অর্জন সম্ভব নয়। সচেতনতার কথা এলে ঘুরেফিরে কয়েকটি সক্ষমতার কথা মনে হয়। যেমন আমি সচেতন হলে বাইরের দুনিয়াকে নিজের থেকে আলাদা করে সেটিকে এমন ভাবে উপলব্ধি করতে পারি যাকে কখনো নিজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবোনা। আমার মধ্যে সেই অর্থে চেতনা যদি থাকে তাহলে আমি আবেগগ্রস্ত হতে পারবো, যেমন পরিস্থিতির কারণে দুঃখ অনুভব করতে পারবো, আনন্দ অনুভব করতে পারবো; শারীরিক বা মানসিক ভাবে আঘাত পেলে ব্যথা অনুভব করবো। আজকের যন্ত্র এসব পারেনা। সে যে মাঝে মাঝে বলে "মাফ করবেন, আমি দুঃখিত"– ওটি সে অনুভব করেনা, যান্ত্রিক ভাবে শেখানো বুলি বলে। অবশ্য কথাটি তারা সঠিক পরিস্থিতিতে ভেবে বলে, ওই টুকুই তার বাহাদুরি। আজকের যন্ত্র পারেনা, তাই বলে আগামী কালের যন্ত্র পারবেনা, এমন কথা বলা যায়না। এজন্য মগজের মত ভেজা বা রক্তমাখা কিছু হতে হবে কেন?'

সোফিয়া: 'তা হলে আশ্বাস পেতে হবে অন্য কোন্ বিকল্প পথে তার দিকে এগুনো যাবে। আর তা ছাড়া অনেকের কাছে সব থেকে বড় প্রশ্ন হলো আদৌ সেই রকম আত্মসচেতন যন্ত্রের প্রয়োজনই বা কী? এর থেকে আশঙ্কার কথাটি কি ভেবে দেখার ব্যাপার নয়? ওদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করে কী লাভ?'

জর্জ: মানুষ সচেতন ইন্টেলিজেন্ট চাচ্ছে কেন, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা সত্ত্বেও? ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির যন্ত্র এখনই এমন ভাবে কাজ করছে যে ওদের কাজের পেছনে যে কোন আবেগের উদ্দেশ্য কাজ করছেনা, নেহাৎ ওভাবে প্রোগ্রাম করা আছে বলে করছে এমন কথা ঘুণাক্ষরেও আমাদের কাছে

মনে হয়না। সব সময় মনে হয় ওরা যা বলছে বা করছে উদ্দেশ্য নিয়েই করছে, উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে নয়। তার থেকে আমাদের আকাঙ্খা জাগে যে এটি যদি সত্যি সত্যি হতো, যদি ইন্টেলিজেন্টদের নিজেদের কাজের পেছনে তাদের গড়া লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতো যার তাগিদে, যার আকাঙ্খায় তারা চলে তা হলে মানুষের একটি পুরানো দুঃখ দূর হয়ে যাবে। দুঃখটি হলো কোনদিন যদি মানুষ এ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয় তা হলে এই পৃথিবীতে সব কিছু অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়বে; জগৎ-জীবন সম্পর্কে, অস্থিত্ব সম্পর্কে ভাবার মত আর কেউ থাকবেনা। সেরকম পৃথিবীতে প্রকৃতি, প্রাণ এসবের অস্থিত্বের কোন অর্থ হবেনা। ইন্টেলিজেন্ট যদি মানুষের মত সেই ক্ষমতা পায় তা হলে অন্তত পৃথিবীর এমন করুণ অবস্থা কখনো হবেনা। কারণ ইন্টেলিজেন্ট প্রাকৃতিক ভাবে বিনাশশীল কিছু নয় বলে সেটি মানুষের মত চিরতরে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কায় নেই। তাদের মাধ্যমে হলেও জগৎ-জীবনের উদ্দেশ্য বজায় থাকবে।'

আফিয়াঃ 'আমরা বোধ হয় ভুলে যাচ্ছি আমাদের কোন বোকামির জন্য মানুষ প্রজাতিটি যদি বিলুপ্ত হয়েই যায়, তবুও পৃথিবীর প্রাণীকূল থেকে উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন বিলুপ্ত হবেনা। উচ্চতর চিন্তা যাকে বল্‌ছেন তা হয়তো থাকবেনা, কিন্তু বনের হাতীরও জীবনের অনেক উদ্দেশ্য আছে– বাচ্চাকে বড় করা, শিক্ষা দেয়া; দলের সবাইকে রক্ষা করা; সঙ্গী মারা গেলে তার জন্য শোক করা। এরকম অনেক প্রাণীরই আছে, তাই আত্মসচেতন ইনে্‌টিলিজেন্ট না এলেও পৃথিবী যান্ত্রিকতায় পূর্ণ হবেনা।'

সোফিয়াঃ 'আমরা বোধ হয় এ পর্যন্ত যাকে সৃষ্টির কথা বলছি সেটি জেনারেল ইন্টেলিজেন্টের কথা– যারা আত্ম সচেতনতার দিক থেকে আমাদের মত হবে। "জেনারেল" এই অর্থে যে সে বিশেষ কোন কাজের বিশেষজ্ঞ না হয়ে মানুষের মত সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন হবে, তার সহজ কাণ্ডজ্ঞান থাকবে, সব দিক থেকেই। এরা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে সঙ্গ দেবে, আমাদের ব্যথায় সত্যি সত্যি ব্যথিত হবে। এটি আমি খুব চাই, অন্তত আমার ইন্টেলিজেন্ট বান্ধবী তাপসীর মধ্যে চাই। কিন্তু সেখানেই কি সে থেমে যাবে? সেই ইন্টেলিজেন্টের বুদ্ধি-ক্ষমতার ব্যাপ্তি আমাদের থেকে অনেক বেশি হবে। যেমন সে নিজেই নিজের প্রোগ্রামিং করবে। একবার এরকম অবস্থা যখন হবে তখন তার উন্নতি হবে পাগলা ঘোড়ার গতিতে, ক্রমবর্দ্ধমান হারে মানুষের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে।

শিগ্‌গরি একদিন সে নিজেকে মানুষের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাবান করে তুলে, নিজের যে কোন 'উদ্দেশ্য' সিদ্ধি করতে সমর্থ হবে। সোজা কথায় সে তখন শুধু জেনারেল ইন্টেলিজেন্ট থাকবেনা, সুপার ইন্টেলিজেন্টে পরিণত হবে। সেটি আমাদের জন্য মোটেই ভাল হবেনা। ওটি হবে মানুষের ওপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপনের, এমন কি মানুষকে ধ্বংস করার সুযোগ করে দেয়া। তাই প্রশ্ন হলো জেনারেল ইন্টেলিজেন্ট তৈরির পর তাকে সেখানেই থামানোর উপায়টি কী? এই থামানোর কৌশলটি খুঁজে পাওয়া সহজ নাও হতে পারে– কারণ প্রক্রিয়াটি নিজেই যখন একটি গতি পেয়ে যাবে তাকে সামাল দেয়া অসম্ভব হতে পারে।'

আফিয়াঃ 'এই যে আমরা যেখান থেকে আলোচনাটি শুরু করছি সেই বর্তমানে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির খুব দ্রুত বিকাশ ঘটছে; এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে কথাবার্তায় আমরা দুই বুদ্ধির মধ্যে কোন পার্থক্যের কথা মনেই রাখিনা। তা কীভাবে সম্ভব হলো? যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় ইন্টেলিজেন্টের পক্ষে মানুষকে এতো নিখুঁত অনুকরণ সম্ভব হয়েছে তো একভাবে মানুষের মস্তিষ্কের পদ্ধতির রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিঙের মাধ্যমেই। মানুষের মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্ক কী ভাবে বিকশিত হয়েছে ইন্টেলিজেন্টে বুদ্ধির উন্নয়নকারীরা তা লক্ষ্য করেছেন। ওই দীর্ঘকালের বিকাশের ফলাফলটাই তাঁরা এখন মানুষের মস্তিষ্কবিদ্যায় দেখছেন। সেই ফলাফল থেকে পেছনের দিকে গিয়ে আগের সরলতর অবস্থাগুলোও বের করছেন। এমনি রকম সরল নিউরাল নেটওয়ার্কটি সাধারণ কম্পিউটার মড্যুল জাল দিয়ে অনুকরণ করা সম্ভব। এক ধরনের খুবই প্রতীকী অনুকরণ আগেই হয়েছে। এতে সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে বুদ্ধির সৃষ্টি করা গেছে, যা প্যাটার্ন উদ্ঘাটনের মত কাজ করতে পারে। কাজেই কেউ হয়তো আশা করতে পারে ওই কম্পিউটার মড্যুলের মধ্যে থেকেই, মস্তিষ্কের মতো জৈব কিছু না হয়েও এতখানিই অগ্রসর হওয়া যাবে যে মানুষের মতই আত্মসচেতন ইন্টেলিজেন্ট তৈরি সম্ভব হবে। কিন্তু তা হবে খুব বড় একটি উল্লম্ফন এখনই যার নিশ্চয়তা দেয়া মুশকিল। অনেকের সন্দেহ হয় লক্ষ বছরের বিবর্তনকে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করা শুধু যন্ত্রের ভিত্তিতে কি সম্ভব? ওভাবে করতে পারার অর্থ দাঁড়াবে বিবর্তনের সব পশ্চাৎ-কলাকৌশল আমরা জেনে ফেলেছি, এবং তাকে লোহা-লক্কড় দিয়ে অনুকরণ করছি। সেটি কি সম্ভব?'

জর্জ: ‘না, বিবর্তনকে পশ্চাৎ-অনুকরণ করে ইলেকট্রনিক যন্ত্রে চেতনার উন্মেষ ঘটানোটি এখন পর্যন্ত অসম্ভবই প্রায় মনে হচ্ছে। তবে মস্তিষ্কের যেটুকু অনুকরণ করা গেছে তা দিয়ে এই ইলেকট্রনিক যন্ত্র ও তার সফটওয়্যার অকল্পনীয় সব কাজকে ইতোমধ্যে সম্ভব করে তুলছে। উদাহরণ স্বরূপ এটিই মানুষকে প্রায় রোগশূন্য একটি দীর্ঘ জীবন এনে দেবার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। এই পুরোটা জীবনভর মানুষের আনন্দময় জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা নিজের ওপর তুলে নিয়েছে। তার এ সব কাজ দেখে মনে হতেই পারে যে এই প্রক্রিয়াতেই সে মানুষের মন বুঝতে শিখবে। তার নিজেরও যে মন আছে সেটি নিশ্চিত করেই এটি ঘটতে পারে; সেই সঙ্গে অন্য ইন্টেলিজেন্টেরও মন বুঝতে পারবে। তখন তাকে আর যন্ত্র বলারও উপায় থাকবেনা। এভাবে যান্ত্রিক উপায়েই যন্ত্র মনের অধিকারী হতে পারে।’

আফিয়া: ‘অর্থাৎ যন্ত্রের নিজের অন্তর্দৃষ্টি লাভ। কিন্তু কেউ এখনো সেরকম কোন পথ বাৎলে দিতে পারেনি। আমাদের দৃষ্টিতে মনের অধিকারী হবার, অন্তর্দৃষ্টি লাভের একটি উপায়ই শুধু এ পর্যন্ত দেখা গেছে, তা হলো যন্ত্রকে মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে একীভূত করে। ওই যে আমরা হালকা ভাবে কথাটি বলি দুই বুদ্ধি, কিংবা বুদ্ধির দুই ধারা ইত্যাদি, তার থেকে উত্তরণ পেয়ে দুই বুদ্ধিকে এক করতে হবে। তবেই ইন্টেলিজেন্টের “মানব-সদৃশ বুদ্ধি” সৃষ্টি হতে পারে। আসলে এই একীভূত করার কাজও যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। এটি ওয়ামের্সে আমাদের কাজের একটি বড় অংশ।’

সোফিয়া: ‘এই একীভূত করার ব্যাপারটি কী ভাবে হবে?’

আফিয়া: ‘মস্তিষ্ককে তো কম্পিউটারের ভেতর নিয়ে যাওয়া যায়না, তাই এখন পর্যন্ত যেই ধারায় গবেষণা হচ্ছে তা হলো অতি ক্ষুদ্র ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইসকে মস্তিষ্কের কাছে নিয়ে যাওয়া। এর মূলে বড় কাজটি করছে ন্যানো টেকনোলজি– যা অতি ক্ষুদ্র ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইস সম্ভব করেছে। তাই মস্তিষ্কের বিশেষ জায়গায় বসিয়ে দেয়ার মতো অতি ক্ষুদ্র ডিভাইসকে রক্তনালির মাধ্যমেই সেখানে পৌঁছে দিতে পারছি। এভাবে সেই মস্তিষ্কে অনেক নতুন ইন্টেলিজেন্ট-সক্ষমতার সৃষ্টি হতে পারে, এবং তা সৃষ্টি হয়েও আসছে। পক্ষাঘাতে মস্তিষ্কের এক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেখানে এভাবে স্বাভাবিক সক্ষমতা সৃষ্টি করা হচ্ছে– সেও বহুদিন হয়ে গেলো। এখন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি

স্বাভাবিক মস্তিষ্কে দিয়ে এক রকম বায়োনিক ম্যান বা বায়োনিক উয়ামেন সৃষ্টিও নিত্যকার ব্যাপার।

এখানেও মস্তিষ্কের রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করাটি জরুরী। অনেক কিছু বুঝতে হয়েছে মস্তিষ্কের বিকাশ থেকে, বিশেষ করে আদি স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের। মস্তিষ্কে ইম্প্ল্যান্ট বসানোটি অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। আরো সাধারণ ভাবে যেটি হচ্ছে তা হলো মস্তিষ্কের ভেতরের সঙ্গে বাইরের ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইসের সরাসরি সংযোগ স্থাপন। তখন ওই ডিভাইস হয়ে পড়ে যেন মস্তিষ্কেরই একটি বর্ধিত অংশ। এই দুইয়ে মিলে একদিন সৃষ্টি হবে একীভূত বুদ্ধি– দুই জগতেরই সুবিধাগুলো পাবে এটি। কিন্তু কোন না কোন ভাবে মানব-মস্তিষ্ক জড়িত থাকা ছাড়া কী ভাবে কাণ্ডজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, আবেগ ইত্যাদি সৃষ্টি হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়।'

জর্জ: 'একটা সময় ছিল যখন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা ভাবতেন যে ভাবে কম্পিউটারের অগ্রগতি হচ্ছে তাকে কাণ্ডজ্ঞান শেখানো কঠিন হবেনা; ওই কাণ্ডজ্ঞান যেটি বলতে গেলে মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক ভাবে থাকে। স্বতস্ফুর্ত ভাবে চট্ করে কিছু বিবেচনা করে বুঝে ফেলাটিই কাণ্ডজ্ঞান। একটু ইশারাতেই অনেক বড়সড় ব্যাপার মানুষ কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে বুঝে ফেলে– যা ইন্টেলিজেন্ট যন্ত্র পারেনা। হাত থেকে কলম ছুটে গেলে ওটি নিচে পড়ে যাবে ওটি বোঝার জন্য মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ঘাঁটতে হয়না। কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিকে এটি বোঝার জন্য এর ওপরেই তথ্য দিয়ে ট্রেনিং দিতে হয়। শুরুতে মনে করা হয়েছিলো অনেক অনেক তথ্য দিলেই সেও কাণ্ডজ্ঞান দেখাতে পারবে। তা হয়নি– কারণ কাণ্ডজ্ঞান তথ্য ঘেঁটে আসেনা, স্বতস্ফুর্ত ভাবে আসে।

মেশিন লার্নিং যখন উন্নত হলো তখন ইন্টেলিজেন্ট যন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়লো। কিন্তু তাতেও কাণ্ডজ্ঞান সৃষ্টি করা গেলোনা। লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল দিয়ে ইন্টেলিজেন্ট এখন অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, কিন্তু সহজ কাণ্ডজ্ঞানে গিয়ে হেরে যায়। ইন্টেলিজেন্ট হলো নিয়ম বাঁধা অথচ কাণ্ডজ্ঞান হলো নিয়ম ছাড়া জ্ঞান। ইঁদুরের কাছে একটি টুথব্রাশ দেখলে আমরা বুঝি কোন ভাবে কেউ মাটিতে একটি টুথব্রাশ ফেলে গেছে অসাবধানে, ওতে চিন্তার কিছু নেই। যদিও এর আগে জীবনে ইঁদুরের কাছে টুথব্রাশ দেখিনি, শুনিওনি;

তবু চট্ করে বুঝতে অসুবিধা হয়না। কিন্তু যন্ত্রের পক্ষে এর কূলকিনারা করতে অসুবিধা হবে যদি তা আগে থেকে তাকে শেখানো না হয়। এক বিষয়ের অভিজ্ঞতা আর এক ক্ষেত্রে চট্ করে টেনে নেবার মত কাণ্ডজ্ঞান তার নেই। অথচ চেতনা, আবেগ এসব সহ যে সাধারণ বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞানের স্থানও তার সঙ্গেই। আজ ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি এত বেশি জিনিসের জ্ঞান ধারণ করতে পারছে যে আমাদের আশা হয় একদিন ওভাবেই কাণ্ডজ্ঞান দেখাবার মত সক্ষমতা তার হবে। সেই সুবাদে চেতনা দেখাবার মতও। কাজেই শুধুমাত্র যন্ত্রের ভিত্তিতেও সচেতন ইন্টেলিজেন্ট আমরা কল্পনা করতে পারছি। তা হয়তো হবে একরকম ভার্চুয়াল কাণ্ডজ্ঞান বা ভার্চুয়াল চেতনা– কিন্তু কার্যত তা মানুষের মস্তিষ্ক বিবর্তন-মূলে যা পেয়েছে তার মতই হবে।'

সোফিয়া: 'স্পষ্টত দুই ভাবে আমরা মানুষের মত জেনারেল ইন্টেলিজেন্টের আশা করছি। এর একটি আফিয়া সমর্থন করছেন, অন্যটি জর্জ। আফিয়ার কথা হলো এতে মস্তিষ্কের ভূমিকাটি একেবারে প্রত্যক্ষ হতে হয়– যন্ত্র স্বাধীন ভাবে সচেতন হতে পারেনা, মস্তিষ্ককে কোন না কোন ভাবে তার অংশ হতে হবে। কিন্তু জর্জ মস্তিষ্ককে সরাসরি জড়িত না করে স্বাধীনভাবে সচেতন যন্ত্র পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।'

জর্জ: 'ঠিক ধরেছেন– বহু দিন থেকেই এর ওপর কাজ হচ্ছে। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি যেভাবে নানা রকম দৈনন্দিন কাজেরও দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে তাতে তাকে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন করতে না পারলে উপায় নেই। সে এখন গাড়ি চালাচ্ছে, বিমান চালাচ্ছে, সাংবাদিক হিসেবে সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। এর সব কিছুতে জ্ঞানের দরকার এবং অভিজ্ঞতার দরকার সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানটিও অনেক সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন মানুষ ড্রাইভার রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন পথচারীর কিছু কিছু হাব ভাব থেকেই বুঝে ফেলেন এই লোক হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিত ভাবে রাস্তা পার হবার চেষ্টা করতে পারে। পুরো নিরাপদ হতে চাইলে ইন্টেলিজেন্ট ড্রাইভারেরও এই সক্ষমতা থাকাটি কাম্য। এই চাহিদাই কোন না কোন ভাবে এই সক্ষমতা নিয়ে আসবে। কিন্তু বড় প্রশ্নটি হলো ওখানেই সে থামবে কিনা, অথবা প্রশ্নটি হতে পারে ওখানেই তাকে থামাবার উপায় কি– সুপার ইন্টেলিজেন্ট হবার পথে

এগুতে না দিয়ে। কারণ সুপার ইন্টেলিজেন্ট হয়ে পড়লে দেখা দেবে তাদের হাতে মানুষের জিম্মি হয়ে যাবার আশঙ্কা।'

সোফিয়া: 'আগেকার দিনের বিজ্ঞানীদের বই পড়া আমার সখ আর সেখান থেকে দেখতে পাই তাঁদের অনেকেই খুব শক্ত ভাষায় এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা যন্ত্রের সুপার ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিকে দেখেছেন মানুষের আত্মবিনাশের পথে নিশ্চিত যাত্রা হিসেবে। তাঁদের কেউ কেউ ন্যানোটেকনোলজি ও ডিএনএ বিজ্ঞানকেও এমনি ভাবে ভয়ের বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন। ভয়ানক ভাবে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কী ভাবে সুপার ইন্টেলিজেন্টরা একদিন মানুষকে দাসে পরিণত করবে, হয়তো তাদেরকে বিলুপ্ত করে ফেলবে। আরো দেখিয়েছেন কী ভাবে ক্ষুদ্র ন্যানো রোবটরা রক্ত সঞ্চালনের সঙ্গে ঢুকে আমাদের শরীরের ও মস্তিষ্কের দখল নেবে। তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে সন্ত্রাসীরা কীভাবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে ভয়াবহ নতুন জীবাণু সৃষ্টি করবে। অথচ এই ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী করা বিজ্ঞানীরা ও তাঁদের সহকর্মীরা এর কোনটিরই গবেষণা ও উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করেননি; হয়তো ভেবেছেন তেমন পরিস্থিতি এখনো অনেক দেরি। মানুষ এ নিয়ে যা করবে সাবধানে করবে।'

আফিয়া: 'ঠিক তাই। এই ওয়ামের্সে আমরা স্তন্যপায়ী বিকাশ নিয়ে গবেষণা করছি তার যে লক্ষ্য মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারকে একীভূত করা, সেটিও অত্যন্ত দূর পাল্লার একটি লক্ষ্য। আমরা জানি এতে উন্নয়ন হচ্ছে, সেটি আজকের ইন্টেলিজেন্টকে আরো কার্যকর করতে সাহায্য করছে। কিন্তু সরাসরি মস্তিষ্ককে একীভূত করাতে সাফল্য, এবং আরো বড় কথা তার ফলে মানুষের সমকক্ষ চেতনা ও কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে জেনারেল ইন্টেলিজেন্ট সৃষ্টি করা, সেটি এখনো বহু দূর; কত দূর আমাদের কোন ধারণাই নেই। ঠিক কোন্ পদ্ধতিতে হবে এমন দাবি না করতে পারলেও একদিন হবে এমনটি বলতে পারি; তবে সেই সময় হয়তো অনেক অনেক দূর। কাজেই এখনই মানুষ সুপার ইন্টেলিজেন্টকে ভয় করবে কেন? নিজের সৃজনশীলতার প্রতি মানুষের আস্থা আছে– সে জানে সময়মত একটি উপায় বের হবেই।'

সোফিয়া: 'বেশির ভাগ বিজ্ঞানী মনে করেন যতদিন শুধু জেনারেল ইন্টেলিজেন্ট তৈরির লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে, এবং সেটি অর্জিত হবার পরও যতদিন গবেষণা

সুপার ইন্টেলিজেন্ট হবার পথে থাকছে, ততদিন এর ওপর মানুষের মৌলিক নিয়ন্ত্রণটি বজায় থাকবে, মানুষ যা চায় তাই হবে। প্রথম সুপার ইন্টেলিজেন্ট তৈরি হওয়া পর্যন্ত এমনিই থাকবে। এজন্যই হয়তো আমরা এ নিয়ে কাজ করতে ভয় পাচ্ছিনা। কিন্তু একবার সুপার ইন্টেলিজেন্ট হয়ে গেলে সে নিজের মত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কোন কাজ করতে পারবে মানুষকে তোয়াক্কা না করেই। গণিতে যেমন যে কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে এমন অনির্ধারিত কিছু পাওয়া যায় যার কোন কূল কিনারা নেই বলে তাকে সিঙ্গুলারিটি বলা হয়, ইন্টেলিজেন্টের বিকাশ ওই পর্যায়ে সেরকম সিঙ্গুলারিটিতে পৌছে যায়, এর পর যে কোন কিছু হতে পারে। ওরা মানুষকে ধ্বংসও করে ফেলতে পারে।'

জর্জ: 'ওই পর্যায় গতি পাওয়ার আগে তাকে থামাতেই হবে; থামানোর উপায় সম্পর্কে যে সব কল্পনা হয়েছে তার মধ্যে একটি বেশ মজার। মানুষ ওই প্রথম সুপার ইন্টেলিজেন্টটিকে এমন ভাবে তৈরি করবে যাতে তার মূল বৈশিষ্ট হবে– সে সব কাজ করবে মানুষের উপকারের জন্য, সব সময় তার চিন্তা-ভাবনা-কাজ শুধু মানুষের আসল লাভ ও উন্নয়নের জন্য হবে। আরেকটি বৈশিষ্ট হবে জন্মের পরের মুহূর্ত থেকে সে পৃথিবীর কোথাও কাউকে দ্বিতীয় কোন সুপার ইন্টেলিজেন্ট তৈরি করতে বা সে উদ্দেশ্যে কোন গবেষণার পদক্ষেপই নিতে দেবেনা, নিজেকেও না। সেই বাধা দেবার কাজটি এমন ভাবে করবে যেন সম্ভাব্য কোন মানুষ বা ইন্টেলিজেন্টের মধ্যে তা করার কোন আগ্রহই না জন্মায়। তারপরও সেটির দিকে কোন পদক্ষেপ এলে সে জোর করে তা ভণ্ডুল করে দেবে। এর ফলে মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য কোন সুপারইন্টেলিজেন্ট আসতেই পারবেনা, বিভিন্ন সুপার ইন্টেলিজেন্টের মধ্যে বিরোধের ফলেও মাঝখানে পড়ে মানুষকে বলি হতে হবেনা।

ওই প্রথম ও শেষ একমাত্র সুপার ইন্টেলিজেন্টটি ভাবসাবে একজন "পরোপকারী সম্রাটের" রূপ নিতে পারে যে একনায়ক হিসেবে ইচ্ছেমত কাজ করে মানুষের ভাল করতে পারে। অথবা একজন "দয়াল দরবেশের" রূপ নিতে পারে যে নিজে একেবারে অদৃশ্য থেকে অলক্ষ্যে সব মানুষের উপকার করতে পারে; উপকার আপনা আপনি হয়ে চলবে, তা মানুষ টেরও পাবেনা। এই শেষের অবস্থায় মানুষের আত্মবিশ্বাসটি রক্ষা পাবে– তারা ভাববে উপকার

তাদের নিজের কারণেই ঘটছে। তখন জেনারেল ইন্টেলিজেন্ট ও ওই অসম্ভব ক্ষমতাশালী অদৃশ্য দয়াল দরবেশ সুপার ইন্টেলিজেন্টের সাহায্যে মানুষ অনেক অসাধ্য করতে পারবে– সবার প্রয়োজনীয় সব সম্পদ লাভ, প্রায় অনন্ত জীবন ও সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি। আবার একই সঙ্গে দয়াল দরবেশ অদৃশ্যে কাজ করে এই সবকে একেবারে সহজলভ্যও হতে দেবেনা– এতে হার-জিৎ থাকবে, প্রাপ্তি-বঞ্চনা থাকবে, সুখ-দু:খ থাকবে, যা মানুষের জীবনকে চ্যালেঞ্জিং ও অর্থপূর্ণ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ তার আকাঙ্খাগুলো পূরণ করতে পারবে। দয়াল দরবেশ সেটি নিশ্চিত করবো। সবকিছু সর্বোত্তম অবস্থায় ও নিরাপদ থাকবে।'

সোফিয়া: 'এগুবার পথ বন্ধ করার জন্য প্রহরী যখন সৃষ্টি করতে হচ্ছেই এখন আর একটু আগে থেকে তা করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। সুপার ইন্টেলিজেন্টে পৌঁছাবার আগে এটি করলে তো সিঙ্গুলারিটি দেখা দেবার কোন ঝুঁকিই নিতে হয়না।'

জর্জ: না, 'প্রথম সুপারইন্টেলিজেন্ট তৈরি না হলে এর পর আরো সুপার ইন্টেলিজেন্টের গবেষণা বন্ধ করার মত শক্তিশালী কেউ থাকবে না। জেনারেল ইন্টেলিজেন্টের ক্ষমতা তো মানুষের মতই হবে, ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে। নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন মানুষ বা কোন ইন্টেলিজেন্ট যদি গোপনে সুপার ইন্টেলিজেন্টের গবেষণা চালিয়ে যায় তাকে খুঁজে বের করা ও বাধা দেবার ক্ষমতা এরকম কারো হবেনা। তাই প্রথম সুপার ইন্টেলিজেন্টে সবার আগে পৌঁছতে হবে ও তাকে দয়াল দরবেশ করে গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র ওই সুপার ইন্টেলিজেন্ট দয়াল দরবেশই পারবে সিঙ্গুলারিটি প্রতিরোধ করতে, যদিও সাধারণ মানুষের কাছে ওটি খুবই স্বাভাবিক ভাবে নিজেরাই করছে বলে মনে হবে।'

স্তন্যপায়ী বিচিত্রা

ইন্টেলিজেন্ট বিষয়ের ওয়ার্কশপে পরিবারের সবাই না থাকলেও মানাজির পরিবারের সবাই খুব আগ্রহের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছে ওয়ামের্সের ক্যাম্পাসের সঙ্গে থাকা স্তন্যপায়ী অভয়াশ্রমে এবং এর মিউজিয়ামে। এই ওয়ালেস লাইনের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে স্তন্যপায়ীর সব রকম রূপ দেখা যায়। এ দ্বীপে দূরেও যা দেখা যায় তারো কিছু কিছু স্থান পেয়েছে এই

অভয়াশ্রমে। স্তন্যপায়ীদের ওপর এখানে গুরুত্ব দেবার কারণ হলো তাদের মস্তিষ্কের বিকাশ কাহিনী। ওয়ামের্সের কাজই হচ্ছে এর গবেষণা। অবশ্য সেই সঙ্গে পর্যটকদের মধ্যে এ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাও একটি উদ্দেশ্য।

সব থেকে কৌতুহলোদ্দীপক স্তন্যপায়ী হলো মনোট্রিম ধরনের– যেমন প্লাটিপ্লাস। অবশ্য পুরো সময়টি মায়ের গর্ভে নাড়ি দিয়ে সংযুক্ত থেকে স্তন্যপায়ী প্ল্যাসেন্টাল– গরু, ছাগল, হাতি, হরিণ, বাঘ, ভালুক, বেড়াল, কুকুর এসবও কম নেই এর মধ্যে অদ্ভুতগুলো ছাড়াও। আর আছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাণী হিসেবে বেশি পরিচিত মারসুপিয়াল, যারা খুব ক্ষুদ্র বাচ্চা হিসেবে জন্ম নিয়ে, মায়ের পেটের খোলা থলিতে বসে খেলে বাকি আশু-শৈশব কাটিয়ে দেয়– ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা, ওয়াম্বাট ইত্যাদি। সুলাওয়েসির নিজস্ব মারসুপিয়ালগুলোও আছে। কিন্তু মনোট্রিমই দৃষ্টি সব চেয়ে বেশি বেশি আকর্ষণ করার মত। কারণ মনে হয় ওরা পুরোপুরি স্তন্যপায়ী হয়ে ওঠেনি– অনেকটা জগাখিচুড়ি। তার মধ্যে বেশি পরিচিত অস্ট্রেলিয়ার প্লাটিপ্লাস; যার আছে সরীসৃপের মত আঁইশ, পাখির মত ডিম থেকে যার বাচ্চা জন্ম নেয় ও হাঁসের মত চেপ্টা ঠোঁট যাদের, আর স্তন্যপায়ীর মত মায়ের দুধ খেয়ে যারা বড় হয়! যেন বিবর্তন এক সময় সব প্রকারের প্রাণীকে মিশিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছিলো। প্লাটিপ্লাস ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় এবং ওয়ালেস লাইনের ওদিকে আরো কিছু জায়গায় আছে অন্য একটি মনোট্রিম এচিড্না।

ওয়ামের্সের অভয়াশ্রম আর মিউজিয়ামের উদ্দেশ্য হলো অনেক বিরল ওই প্রাণীগুলোকে সহজে তাদের নিজস্ব পরিবেশে দেখার সুযোগ দেয়া। তাছাড়া তাদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কিছু বিষয় বুঝিয়ে এর বিকাশের ও এখানকার গবেষণার উপলব্ধির একটি পটভূমি সবার জন্য তুলে ধরা। এখানে সব অতিথির জন্য নানা খোরাক রয়েছে। মানাজির পরিবারের মধ্যেই তো রয়েছে বিচিত্র চাহিদা। সোফিয়ার জন্য এখানকার সমৃদ্ধ জীব বিজ্ঞানের মেলাটাই যথেষ্ট ছিল, বিশেষ করে এতে বিবর্তনের ইতিহাস। জীব-বৈচিত্র্যের সত্যিকারের প্রেমিক বলে যদি কাউকে চিহ্নিত করতে হয় তাহলে সোফিয়া তার ভেতর পড়বেন। আবার শান্তর সঙ্গে মিলে তাঁর যে অন্য উৎসাহ সেটি তো ওয়ামের্সের প্রধান কাজ– ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে স্তন্যপায়ী মস্তিষ্ক বিকাশের বিষয়গুলো কতটা স্থান পাবে? আর্টিস্ট ময়না এখানে এমন সব প্রাণীর দেহ-সৌকর্যকে

তার শিল্পে বন্দী করতে পারছে যা সচরাচর সে সামনে পায়না। যেমন একটি প্লাটিপ্লাসের কাছে গিয়ে তার দেহের ছত্রে ছত্রে ময়না যেন খেয়ালি প্রকৃতিকে দেখতে পায়। এই সব নতুন দৃশ্যপট তার আর্টিস্ট মনকে এত নানা ভাবে বাজাতে পারে যে তার মধ্য থেকে নতুন আর্ট উঁকিঝুকি দেয়।

অন্য দিকে অদ্ভুত আরো কিছু বিষয় ওই অভয়াশ্রমে ও মিউজিয়ামে আনা হয়েছে যাতে রাহিলের দারুণ উৎসাহ– সে ওটি নিয়েই স্ফুর্তিতে আছে। তা হলো এক একটি প্রাণীর সঙ্গে প্রকৃতিতে নিজেদের জীবন-জীবিকাকে জড়ানো বাসিন্দাদেরকেও এখানে কথা বলতে ও নিজেদেরকে তুলে ধরতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ক্যাঙ্গারু, এচিডনা, ইত্যাদি প্রাণীর সঙ্গে নানা স্থানীয় মানুষের জীবন ও কালচারের সম্পর্কগুলো ছিল রাহিলের বিশেষ আকর্ষণ। পুরো জনপদের কথা চিন্তা করলে এই সুলাওয়েসির মত পাপুয়া নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়াতে মারসুপিয়াল, প্ল্যাসেন্টাল ও মনোট্রিমের সঙ্গে অতীতে বহু আদিবাসী মানুষ থেকে শুরু করে বর্তমানের আধুনিক মানুষ পর্যন্ত অসংখ্য বাসিন্দা জড়িয়ে আছেন। মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক বিবেচনায় সেটি যেখানে যেভাবে ঘটেছে তা বিশ্লেষণেরও একটা চেষ্টা রয়েছে। রাহিল পলিনেশিয়ান কালচারগুলোর আলোকে এগুলোকেই বেশি উপভোগ করলো।

মিউজিয়ামের প্রধান প্রয়াসটি অবশ্যই স্তন্যপায়ী মস্তিষ্কের বিবর্তনকে তুলে ধরা। একটি প্লাটিপ্লাস, একটি কোয়েলা, একটি বানর– তিন ধরনের এই তিন স্তন্যপায়ীর মধ্যে বাকি অনেক পার্থক্য তো রয়েছেই, কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক গঠনে কোথায় কোথায় গিয়ে গঠনের পার্থক্য ঘটেছে তার বিশ্লেষণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ। স্তন্যপায়ীদের পর্যায়ে এসে মস্তিষ্কের যে বিবর্তন তাকে রীতিমত একটি বিপ্লব বলা যায়। এটি স্তন্যপায়ীর সব শাখায় ঘটেছে– কোন্ শাখায় কী পার্থক্য সেটি নিরূপণ করলে এর বিকাশটি ভাল বোঝা যায়। যেমন মনোট্রিমের যাত্রাটি মনে হয় অনেকটা এক্সপেরিমেন্টের মত– স্তন্যপায়ী হবার পথে। তারা এখনো ডিমের থেকে জন্ম নিচ্ছিলো। কিন্তু মস্তিষ্কে ও অন্যান্য বৈশিষ্টে স্তন্যপায়ীর উন্নততর বৈশিষ্টগুলো স্পষ্ট; সেটি ইতোমধ্যে বিশেষায়িত মস্তিষ্ক, শারীরবৃত্তিক সাড়া দেবার ক্ষেত্রে অন্য যে কোন প্রাণীর থেকে বেশি উপযুক্ত।

ওয়ালেস লাইনের ওপারের নানা দেশে রয়েছে মোট ২৬৫ টির মতো বিভিন্ন মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ী প্রজাতি– ক্যাঙ্গারুর মত বৈশিষ্ট নিয়ে। এক সময় মনে

করা হতো প্ল্যাসেন্টাল স্তন্যপায়ীদের থেকে এদের মস্তিষ্ক পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু এখনকার গবেষণা তা বলেনা। প্ল্যাসেন্টালদের মধ্যেই যেমন বুদ্ধির প্রচুর তারতম্য রয়েছে (মানুষও তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত), তেমনি মারসুপিয়ালদের মধ্যেও অতটা না হলেও তারতম্য রয়েছে। একটি গড়পড়তা মারসুপিয়াল মস্তিষ্কের দিক থেকে গড়পড়তা প্ল্যাসেন্টাল থেকে পিছিয়ে নেই– যেমন ক্যাঙ্গারুর বুদ্ধি হরিণের থেকে কম নয়। ওয়ামের্সে মিউজিয়াম স্পষ্ট তুলে ধরেছে কী ভাবে স্তন্যপায়ীর মধ্যে এক সময় মস্তিষ্কের উন্নয়নে বড় বিস্ফোরণ ঘটেছিলো– প্রাইমেট বা বানর জাতীয়দের মধ্যে এসে। তারই ধারায় এসেছে এইপ এবং মানুষ। এই বিস্ফোরণটিরই খুঁটিনাটিকে তাই এখানকার গবেষণা অনেকদূর নিয়ে গেছে। কারণ মস্তিষ্কের রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে যদি ইন্টেলিজেন্টদের মধ্যে তার অনুকরণে সচেতনতা আরোপ করতে হয়, তা হলে এটিই সেই জায়গা।

ওই বিস্ফোরণের পর মানুষের মস্তিষ্কের প্রায় ৮০% স্থান দখল করলো কোর্টেক্স, যার নানা অংশ নানা বিশেষায়িত কাজ নিলো। এই পরিবর্তনটি অবশ্য মানব ধারার বহু আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো– এখন পূর্ণতা পেলো। কিন্তু দেখা গেলো মানুষের মধ্যে আগের প্রাইমেটের মামুলি কাজগুলোর ক্ষেত্রে দারুণ কোন যে উন্নতি হলো তা নয়– যেমন দর্শন অংশ, চলাচলের জন্য মোটর অংশ, গন্ধ নেবার অংশ ইত্যাদি প্রায় আগের মতই রইলো- এমনকি গন্ধ অংশে আগের থেকে পিছিয়েই গেলো। কিন্তু একটি দিকে অভূতপূর্ব উন্নতি হলো- সেটি মস্তিষ্কের প্রি-ফন্ট্রাল অংশ– সেখানে সব সাড়াগুলো গিয়ে বিশ্লেষিত হয়, একটি সামগ্রিক চেতনার রূপ নেয়। মানুষের আগের স্তন্যপায়ী বিকাশের সময়ও এরা ছিল, কিন্তু তখন যেখানে মাত্র দশ বারোটা আলাদা চেতনার অংশ ছিল মানুষে এসে তা কয়েকশ'তে পরিণত হলো। ইন্টেলিজেন্টের জন্য আগের ওই সরলতর অবস্থা দিয়ে শুরু করা যায়, সে জন্যই স্তন্যপায়ী মস্তিষ্ক বিকাশ নিয়ে গবেষণা। এই দিক থেকেই এসেছে চেতনা ও আত্মসচেতনতা, অন্যের মন বুঝতে পারার ক্ষমতা, বাইরের ঘটনাবলী থেকে নিজকে আলাদা রেখে সেগুলো সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে চিন্তার ক্ষমতা। আরো এসেছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার সক্ষমতা, নিজের জীবন অর্থপূর্ণ কি অর্থহীন হচ্ছে সেটি নিয়ে

ভাবার ক্ষমতা ইত্যাদি। মস্তিষ্কের বিশ্লেষণের এখন অনেক উপায় রয়েছে, আছে নানা রকম স্ক্যানিং পদ্ধতি। এর সবই কাজে লাগানো হচ্ছে।

একজন অতিথি বা আগ্রহী পর্যটক ওয়ামের্সের মিউজিয়ামে কতদিনই বা কাটাতে পারেন, অনেকে হয়তো এক দিনেরও বেশি নয়। তাই তাঁদের জন্য মিউজিয়াম আয়োজন করেছে 'ভার্চুয়্যাল রিয়ালিটি শো' এর সর্বশেষ উন্নতির কিছু নমুনা দেখাতে। সেখানে কোটি বছরের বিবর্তনকে আধা দিনের ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে বিচরণে নিয়ে আসা হয়েছে। সেই কোটি বছরে এখানকার পরিবেশে যে নানা পরিবর্তন, বিভিন্ন পর্যায়ে স্তন্যপায়ী উদ্ভব, তার মস্তিষ্কের আদি কাঠামো, ওতে নানা পরিবর্তন ও যোগ-বিয়োগ, সব যেন এই বাস্তবতায় চোখের সামনে হয়ে চলেছে। ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে এসব শুধু চোখের সামনে হয়না, এতে দর্শকের সকল স্নায়ু, সকল চেতনাকে নিমজ্জিত করে নেয়া হয়; তিনি যেন পরিণত হন ওই মস্তিষ্কের মধ্যে বসে থাকা একটি অদ্ভুত সংবেদনশীল সত্তায়। এতে এক এক সময় দর্শককে সেই আদি মস্তিষ্ক ধারণকারীদের একজন হিসেবে চিন্তা করানোর চেষ্টা রয়েছে। কখনো বা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলে তেমন মস্তিষ্কের এক একটি আলাদা মড্যুলে যেন তিনি অনুভূতিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন চেতনার সেই একটি মাত্র অংশে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এই বাদল বনের ভেতরে বিশ্বের সর্বাধিক অপ্রসরতা নিয়ে একটি গবেষণা কেন্দ্র ও মিউজিয়াম যে দুনিয়ার অনেক আগ্রহী মানুষকে আতিথ্য দিচ্ছে– সেটি আজকের বিশ্ব-বন্দোবস্তের একটি সুন্দর রূপকে ফুটিয়ে তুলছে। বিশ্বটি সত্যিকার অর্থেই একটি সম্মিলিত গ্রাম। এর সবখানে সবাই প্রদর্শক, সবাই পর্যটক। এতে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সব জ্ঞান, সব উদ্যোগ, সব সৌন্দর্য কারো একচেটিয়া হয়ে আছে। এসব এখন সর্বত্র বিস্তৃত– সবার অংশগ্রহণ যেখানে সম্ভব হচ্ছে। দুনিয়ার মানুষের এখন অনেক অবকাশ, সবাই বেড়াতে যায়। নিজের বাড়ির কাছে কী কী আছে সে সব যেমন দেখতে যায়, দূরে কী কী আছে তাও দেখতে যায়। অনেকের জন্যই সেটি শুধু দেখা নয়, বরং নিজের মনের সখগুলো মেটাবার চেষ্টা। কাজেই একে শুধু ছুটি কাটানো, বেড়াতে যাওয়া বল্‌লে ভুল করা হবে। যুগ যুগ ধরে মানুষ যা সৃষ্টি করেছে, যে জ্ঞান অর্জন করেছে তাও মানুষ আস্বাদন করতে চায়। এসব এখন শুধু পণ্ডিতদের জন্য সংরক্ষিত রেখে শুধু তাঁদের আস্বাদনের ব্যাপার নয়; এসব

এখন সবার। পণ্ডিতরা সহ যে অসংখ্য বিশ্ববাসী মনের আনন্দে সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, সবার সৃষ্টিগুলোকে যাঁরা সমন্বিত করছেন, তাঁদের অনেকে এসব সবাইকে আস্বাদন করাবার দায়িত্বও পালন করছেন।

এখানে ওয়ামের্সের বিজ্ঞানীরা এ জন্যই সবাইকে শুধু পর্যটনের আতিথ্য দিচ্ছেন না, বৈজ্ঞানিক আতিথ্যও দিচ্ছেন।

ওরাংউটান

লাইনের অন্য পাশে

সুলাওয়েসির অংশের ছুটি শেষ হয়ে গেলো, পরের গন্তব্য ওয়ালেস লাইনের ওপারে বোর্নিও দ্বীপে মালয়েশিয়ার কোটা কিনাবালু। মালয়েশিয়ার উপদ্বীপের যে মূল ভূখণ্ড, যেখানে কুয়ালালামপুর ও অন্য বড় শহরগুলো তার থেকে প্রায় এক হাজার মাইল পূর্বে বোর্নিও দ্বীপের এক অংশে সাবাহ প্রদেশের রাজধানী শহর। সুলাওয়েসি দ্বীপ থেকে অল্প খানিকটা সমুদ্র পার হয়ে এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো কাছেই বোর্নিওর বাছা বাছা বাদল বনের বিরল প্রাণী দেখার সুযোগ। ওয়ালেস লাইনের ঠিক পশ্চিমে এখানে স্তন্যপায়ীগুলো সবই প্ল্যাসেন্টাল অর্থাৎ আমাদের পরিচিত টাইপের। কিন্তু তার মধ্যেই এত বৈচিত্র, ও তা অন্যান্য গোষ্ঠির প্রাণীতেও– দারুণ অভিজ্ঞতা হবার কথা।

এদের মধ্যে সোফিয়ার জন্য বিশেষ আকর্ষণ হলো এ শহরের কাছের বনে থাকা ওরাংউটান। তিনটি প্রধান গ্রেট এইপের এটি একটি। এটি বোধ হয় অন্য দুটি- শিম্পাঞ্জি ও গরিলার থেকে কম পরিচিত। সোফিয়া বিশেষ করে এবারকার ছুটি-কাটানো উপলক্ষে এখানকার বিশ্বখ্যাত ওরাংউটান কেন্দ্রটির সুযোগটি নিতে চেয়েছিলেন, মানুষের সঙ্গে এত সাদৃশ্যপূর্ণ এই প্রাণীটি সম্পর্কে ভাল করে জানতে চাচ্ছিলেন। অন্য দুটি গ্রেট এইপ আফ্রিকার সুনির্দিষ্ট জায়গাতেই শুধু প্রকৃতিতে রয়েছে– শিম্পাঞ্জি প্রধানত রুয়ান্ডায় এবং গরিলা প্রধানত কঙ্গোতে, উভয় ক্ষেত্রে এদের সংখ্যা বেশি নয়। সব ক'টা প্রাপ্তিস্থান মিলিয়ে সীমিত অস্তিত্ব ধারন করে আছে, তবে আগের মত অতটা ঝুঁকিতে

নেই। ওরাংউটানের অবস্থাও অনেকটা সে রকম। এটি আছে বোর্নিওর এরকম দু'একটি জায়গায় ও ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে। অথচ জীববিজ্ঞানে ও বিবর্তনে উৎসাহ মেটাতে তো বটেই, ইন্টেলিজেন্ট উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এদের সঙ্গে ভাল পরিচিতিটি থাকা প্রয়োজন।

কোটা কিনা বালু থেকে অল্প খানিক্ষণের বিমান ভ্রমণ করে চলে আসা যায় লাহাদ দাতুতে। এখান থেকে সামান্য দূরেই সেপিলকে পৃথিবী-বিখ্যাত বিশ্ব ওরাংউটান কেন্দ্র। এখানে একটি অভয়ারণ্যে রয়েছে বেশ কিছু ওরাংউটানের প্রকৃতিবাস। যদিও এটি কিছুটা গণ্ডির মধ্যে, ওই কেন্দ্রটির সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে। কিছুটা সহজে ও ঘনিষ্ঠ ভাবে ওরাংউটানকে পর্যবেক্ষণ করতে হলে, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হলে এটি বোধ হয় পৃথিবীর সব চেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা। তাছাড়া এর চারিদিকে যে বাদল বন– সারা পৃথিবীতে উন্মুক্ত বনের ওরাংউটানের সব থেকে বড় সমাবেশ এখানেই রয়েছে। সোফিয়া, শান্ত, রাহিল ও ময়নার প্রথম এক রকম অভিযান চল্‌লো ওই বাদল বনে– শুধু ওরাংউটানের দেখা পাওয়ার জন্য নয় বরং বোর্নিওর ব্যতিক্রমী অদ্ভুত কিছু প্রাণীকে দেখার ও বনের প্রকৃতি উপভোগ করার চেষ্টায়। সেটা ভাল সম্ভব হয়েছে কাছেই তাবিন সাধারণ অভয়াশ্রমে। অভয়াশ্রমে এমন চমৎকার সব পর্যবেক্ষণ সুবিধা রয়েছে যা খুবই আধুনিক ও কার্যকর। নিজে প্রায় অদৃশ্য থেকে প্রাণীদের একেবারে কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণের সুযোগ এতে রয়েছে। দূরের থেকে দেখার সরঞ্জামগুলোও খুবই লক্ষ্যণীয়। এরকম পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে। যেমন মানাজির পরিবারের প্রত্যেক সদস্যেরই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে। কেউ দেখতে চান বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাজনে একটি অদ্ভুত প্রাণী কোন্ শ্রেণীতে কতখানি খাপ খাচ্ছে, কেউ বুঝতে চান প্রাণীর লুকোচুরি খেলাতে কী মনস্তত্ত্ব কাজ করছে, আবার কেউ তার মধ্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আর্টকে আলাদা করতে চান। প্রতিষ্ঠানটির পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার নানা দিক তাঁদের সবারই উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে। এটি যেমন একজন ফটোগ্রাফার বা আর্টিস্টের চাহিদাগুলো পূরণ করেছে সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তেমনি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের চাহিদাগুলোও পূরণের চেষ্টা করছে। একজন সৌখিন বিজ্ঞানীও এখানে ওদের আয়োজনের সুযোগ নিয়ে বেশ সন্তোষজনক ভাবে নিজস্ব গবেষণা চালাতে পারেন। সেটিও অনেক

সময় বিজ্ঞানের জগতে স্পষ্ট অবদান রাখতে পারে, আর ওই সৌখিন বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণকারীকে দারুণ আনন্দতো দিতেই পারে।

সব রকম পর্যবেক্ষণের জন্য বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চলার পথ আছে এতে চলে বিশেষ ধরনের নীরব, নীচু, অলক্ষ্যে চলার মত প্রায় স্বচ্ছ গাড়ি। আবার বিকল্প হিসেবে আছে একেবারেই বনের সঙ্গে মিশে থেকে চলার মতো পায়ে হাঁটার রাস্তা। প্রত্যেকটিতে সাক্ষাতে আসে কিছু দূর পর পর নানা প্রাণীর স্বাভাবিক সমাবেশ ঘটার মত নানা আকারের জলাশয় ও খোলা জায়গা। এরকম পথের এক জায়গায় সোফিয়ারা দেখতে পেলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৃষ্টি- কাদার আগ্নেয়গিরি। যে আগ্নেয়গিরির কথা সবাই জানে তাতে তার থেকে তো উদ্গীর্ণ হয় বিষাক্ত গ্যাস, ছাই, আর গলন্ত ধাতব লাভা, যা সব রকম প্রাণীকে ও মানুষকে ওখান থেকে বিতাড়িত করে। কিন্তু এই কাদার আগ্নেয়গিরি বনের নানা প্রাণীর জন্য বরং একটি আকর্ষণ। লাভা না উঠে এখান থেকে কিছুক্ষণ পর পর সজোরে উঠে আসে কাদা, যার সঙ্গে মেশানো থাকে নানা রকম লবন ও খনিজ। এর আকর্ষণে নানা প্রাণী এখানে আসে, এই কাদা জিহ্বায় চাটে শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় লবন আর খনিজ পেতে। পর্যটকরা এখানে এসে অলক্ষ্যে অপেক্ষা করেন বহু সময় ধরে, এই প্রাণী সমাবেশ দেখার জন্য। বোর্নিওর এ জায়গায় প্রাণীর অদ্ভুত সব বৈচিত্রে ভরপূর। এ বৈচিত্রের আকর্ষণেই এটি পৃথিবীব্যপী খ্যাত।

আজ দুনিয়ার সব জায়গা থেকে তাঁরা আসছেন, যাবতীয় নিয়ম মেনে এখানে সব কিছু দেখছেন। দু'শ বছরেরও বেশি সময় আগে বাইরের একজন মাত্র পর্যবেক্ষক এই সব অজানা দুর্গম অঞ্চলে একক অভিযাত্রী হিসেবে মাসের পর মাস ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাও এই বিচিত্র প্রাণীর ওপর গবেষণা চালাতে– তিনি আলফ্রেড ওয়ালেস। ওয়ালেস লাইনের ঠিক কাছে পশ্চিম দিকটায় হওয়াতে এখানকার স্তন্যপায়ী সে যতই অদ্ভুত হোকনা কেন, সবই প্ল্যাসেন্টাল। সেদিক থেকে অদ্ভুত কিছু নয়, যথারীতি মায়ের গর্ভে পুরোটা সময় কাটিয়ে নাড়ি-ফুল (প্ল্যাসেন্টা) সমেত পূর্ণ শিশু হয়ে জন্ম নেয়। তবে শুধু স্তন্যপায়ী নয়, এখানে পাখি-বৈচিত্র এর থেকেও অনেক বেশি। এটি একেবারেই ঘন উষ্ণ নিরক্ষীয় বাদল বন, গাছের মগডালে ডাল-পাতার শামিয়ানা পর্যন্ত পাখির

রাজত্ব। বিচিত্র রঙ, আকৃতি, আকার ও ডাকের পাখিকে এমন একটি জায়গাতে সমবেত হতে আর কোথাও বোধ হয় দেখা যায়না।

বোর্নিওর সব থেকে বিখ্যাত ও দুষ্প্রাপ্য যে তিনটি ব্যতিক্রমী স্তন্যপায়ী রয়েছে তার তিনটাই এখানে দেখা গেলো। হাতির দুটি প্রধান প্রজাতি আফ্রিকান হাতি ও ভারতীয় হাতিকে তো সবাই চেনে। দুটিই বেশ বড়। কিন্তু আরো একটি প্রজাতি তার আছে যেটি আকারে অনেক ছোট সেটি পিগমি হাতি, শুধু এখানেই পাওয়া যায়। এটি আসলে ভারতীয় হাতীরই একটি উপ-প্রজাতি। এক সময় এটি প্রায় বিলুপ্ত হবার পথে ছিল অল্প কিছু জায়গায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাবার ফলে, কিন্তু বহু যত্নে একে আবার যথেষ্ট সংখ্যায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আরেকটি এমনি অদ্ভুত স্তন্যপায়ী হলো সুমাত্রান গণ্ডার– গন্ডারদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি প্রজাতি যার এশিয়ান অন্য গণ্ডারের একটির বদলে দুটি খড়্গ আছে নাকের ওপর; ওদিক থেকে এটি আফ্রিকার গণ্ডারের মত। এটিও বলা যায় বিলুপ্ত হতে হতে বেঁচে গেছে। বিখ্যাত অন্য স্তন্যপায়ী হলো বান্টেং গরু। এই বন্য গরু ৩০-৪০টির দল নিয়ে এই বনে ঘুরে বেড়ায়। এই যে বিখ্যাত তিনটি এরা কিন্তু দারুণ অদ্ভুত কিছু নয়, কিন্তু তাদের অন্য সাধারণ রূপ গরু, হাতি, গণ্ডার সবার কাছে যে রকম পরিচিত তার মধ্যে এরা ব্যতিক্রমী বলেই এত বিখ্যাত।

কিন্তু বাদবাকি কিছু প্রাণী আরো চমকপ্রদ। বানরের বৈচিত্র, বিশেষ করে টারশিয়ের গোছের বানর দেখার মত। আর আছে স্লো লরিস– এও বানর জাতীয় প্রাণী কিন্তু বানররা সাধারণত ক্ষিপ্র গতির হলেও এটি অত্যন্ত ধীর গতিতে গাছ বাইতে থাকে এবং তাও প্রধানত রাতের বেলা। 'গাছ বাওয়া বাঘ' তাবিন অরণ্যের একটি বড় আকর্ষণ- এর মধ্যে আছে লিওপার্ড বাঘ আর সিভেট বাঘ। সব থেকে কাম্য লিওপার্ড বাঘটির নাম 'মেঘে ঢাকা লিওপার্ড'। কাম্য এই জন্য যে এর দেখা পাওয়া দুষ্কর। গায়ের ডোরাগুলো এমন যে বনের গাছ-পাতার সঙ্গে একেবারে মিশে থাকে, তাই মেঘে ঢাকা নামটি।

অভয়ারণ্যে সোফিয়া-শান্তদের অভিযাত্রা ছিল শুধু দু'দিনের– তাদের আসল লক্ষ্যবস্তু এখানকার ওরাংউটান গবেষণা কেন্দ্র। তাবিন জায়গাটিই হলো ওরাংউটানের বিরল কয়েকটি বাসস্থানের মধ্যে একটি। মালয়ী ভাষায় ওরাংউটান কথটির মানে হলো বনের মানুষ। যুগে যুগে এখানকার মানুষ

ওদেরকে নিজেদেরকে একজন মনে করে এসেছে, যেন তারা কোন এক কারণে বনে নির্বাসিত হয়ে বন্য রূপ ধারণ করেছে। আর আজ বিবর্তনের দিক থেকে শিম্পাঞ্জি ও গরিলার পরেই মানুষের সঙ্গে জেনেটিক সাদৃশ্য বেশি বলে এর আচরণ ও মস্তিষ্কের গবেষণা উচ্চতম গুরুত্ব পাচ্ছে- যেমন এই বিশ্ব ওরাংউটান গবেষণা কেন্দ্রে।

'বনের মানুষ'

১৯৬৪ সালে বিপর্যস্ত ও এতিম ওরাংউটান শিশুদের পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে তাবিনের বনে একটি ছোট নার্সারির আয়োজন হয়েছিলো। ওটিই প্রায় একশ' বছর টিকে থেকে এখন বিশ্ব ওরাংউটান গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। তখন সেই পুনর্বাসন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো পাম তেল ব্যবসার লোভে ব্যাপক বনভূমি নষ্ট করে পাম বাগানে রূপান্তরের কারণে। নিজেদের বাসস্থান ও ইকোসিস্টেম হারিয়ে দলে দলে ওরাংউটান বিলুপ্ত হচ্ছিল, শিশুরা মা-হারা হচ্ছিলো। তখন পরিবেশবাদীদের চাপে অন্তত কিছুটা ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা নিতে হয়েছিলো। এর পর মূল সমস্যা বন বিনষ্টির রাশ কিছুটা টেনে ধরা হলেও বনে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কাটি ক্রমেই বড় হয়ে ওরাংউটান জীবন আবার বিপন্ন হতে চল্‌ছিলো। কাজেই তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তাটি আর কখনোই শেষ হয়নি। আজ এই গবেষণাকেন্দ্র ওরাংউটান সম্পর্কে, তার বুদ্ধি, মস্তিষ্ক, আবেগ ইত্যাদির ওপর বহুতরো গবেষণার পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে তাদের ও অন্যান্য প্রাণীর কল্যাণে এখানকার ইকোসিস্টেম সংরক্ষণের মাধ্যমে এ কাজ চলছে, এখনো পরিবেশের চাপে ওরাংউটান অকালে মারা যাচ্ছে, এতিম ওরাংউটান শিশুদের পুনর্বাসন প্রয়োজন হচ্ছে। তবে এ কেন্দ্রের বড় কাজ ওরাংউটানের মানব সদৃশ আচরণগুলোকে একদিকে মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে অন্যদিকে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা। বিবর্তনজাত বুদ্ধি ও কম্পিউটারজাত বুদ্ধির মৌলিক গবেষণাগুলো আজ এই কেন্দ্রে সব থেকে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

সোফিয়ার নিজের উৎসাহ কিন্তু এই দুই তুলনা নিয়েই। কিছু মানবিক গুণ সম্পন্ন এই প্রাণীটির জীবনযাত্রা, ভাব প্রকাশ, আবেগ ইত্যাদি থেকে বিবর্তন

ধারাকে বোঝা যেমন তাঁর আনন্দ, তেমনি সেই বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার সঙ্গে তুলনা করতেও তাঁর প্রচুর আগ্রহ। ময়নার কথা আলাদা। ওরাংউটান শিশুর সঙ্গে নিজের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কটি অনুধাবন করার মধ্যে ময়না তার শিল্পবোধকে যেভাবে খুঁজে পায় তা আর কিছুতে নয়। ছুটির এই পর্যায়ে এটি দাঁড়ালো সোফিয়া আর ময়না এই মা-মেয়ে জুটিতে। কারণ তাবিনে প্রথম কয়েক দিনে ওরাংউটানের সঙ্গে কিছুটা পরিচিতির পর কর্তব্যের টানে শান্ত ও রাহিলকে কর্মস্থলে ফিরে যেতে হয়েছে। একই দিনে কোটাকিনা বালু থেকে শান্ত চট্টগ্রামের পথে আর রাহিল হাওয়াইয়ের পথে বিমানে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো।

সাধারণত ওরাংউটান হৈ হুল্লোড় করা প্রাণী নয়, খুব ঘনিষ্ঠ না হলে নিজেদের কারো সঙ্গেও সহজে মেশেনা, অন্য কেউ তো দূরে থাক। এদিক থেকে ওদের চরিত্র শিম্পাঞ্জির থেকে একেবারেই আলাদা। শুধু মানুষ নয়, সব রকম প্রাণী থেকেই দূরত্ব বজায় রাখাটাই বনে থাকা ওরাংউটানের স্বভাব। প্রকৃতিতে তার সময় কাটাবার জায়গাটাও সে ভাবে অদ্ভুত রকম দূরত্বে। এত বড় ও ভারি একটি প্রাণী অথচ তার বাসস্থান হলো এই বাদল বনের সুউচ্চে ছড়িয়ে পড়া গাছের অনেক ওপরে ডাল-পাতায় গড়া একটানা শামিয়ানায়। ওখানেই এক গাছ থেকে অন্য গাছের ওপর দিয়েই চলে তার বিচরণ; সেখানকার ফল, ফুল, পতঙ্গ খেয়েই তার জীবিকা ও সময় কাটানো। তবে তাবিনের এই গবেষণা কেন্দ্রের আশেপাশে যে ওরাংউটান আছে তারা একটু ব্যতিক্রম। দীর্ঘকাল ধরে তাদের শিশু সদন হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে বহু প্রজন্মের ওরাংউটান কেন্দ্রটিকে তাদের আপন বলে মনে করে। তাই প্রায়ই এখানে ও আশেপাশে মাটিতে নেমে আসে, বিচরণ করে, নিচের খাদ্যও খায়। এখানে তাদের বাড়তি খাদ্য মেলে, অন্যান্য সেবাও মেলে। ওখানকার মানুষকে ওদের চেনা, ওখানকার ওরাংউটান সমাজের অন্য সবাইকেও চেনা।

সোফিয়া নিজে আগে একবার এই কেন্দ্রে এসে বেশ কিছু দিন কাজ করে গেছেন। বলতে গেলে এবার তিনি চেয়েছেন পরিবারের অন্যদের সঙ্গে এখানকার সবকিছু একটু পরিচয় করিয়ে দিতে– এবং দুই সফরের মাঝের সব অনুসন্ধানের খেই আবার তুলে নিতে। সেবার সোফিয়া বেশি জোর দিয়েছিলেন ওরাংউটান শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রের ওপর। তাঁর অনুসন্ধানকে সত্যিকারের

গভীরতা দেয়ার জন্য তখন একজন শিশু-সেবক কর্মী হিসেবে নিজে কিছুদিন কাজও করেছেন এখানে। এই কর্মীদের বলা হয় 'ওরাংউটানের মা' – তা সে মহিলা হোক কিংবা পুরুষ হোক, কারণ মায়ের মতই তারা এই প্রাণী-শিশুর যত্ন নেন। একেবারে কোলের শিশুকে ডায়াপার বদলানো, বোতল থেকে দুধ খাওয়ানো, কান্না থামানো– কে বলবে ওরা মায়ের মত নন। বাচ্চাগুলোও চেহারায় মানব শিশুর মতই– মুখে ও গায়ে শুধু লম্বা লাল লোমটিই ব্যতিক্রম। এই শিশুদের বায়নাক্কাগুলোর সঙ্গে সোফিয়া খুবই পরিচিত– ক্ষিদে পেলে, পেটে ব্যথা হলে বা কোলে ওঠার জন্য চেঁচিয়ে কাঁদা। আবার মেজাজ ভাল থাকলে চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকা। একটু বড় হবার পরও বেশ কিছুদিন ওরা হেসে খেলে কাটায়। দীর্ঘ একটি বাল্যকাল ওদের আছে, মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণীর এত দীর্ঘ বাল্যকাল নেই। এ সময় তাদের মা এবং ভাই-বোনদের মধ্যেই কাটে। এই দীর্ঘ বাল্যকালের কারণ কী? যে কারণটি বোঝা যায় তা মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দীর্ঘ বাল্যকাল জীবনের প্রয়োজনে শেখার জন্য; মা'ই প্রধান শিক্ষক, তবে অন্যরাও রয়েছে। গবেষণা কেন্দ্রে আসা যাওয়া করে যারা তারা মানুষের কাছেও শেখে। আর যারা এখানে কর্মীদের হাতে প্রতিপালিত হয় তারা তো সব কিছুই মানুষের থেকে শেখে।

অবাক লাগে এখন ওরাংউটানকে প্রচুর গবেষণার মাধ্যমে অনেকটা উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে, অথচ ওয়ালেস যখন এ অঞ্চলে তাঁর বহু দিন স্থায়ী অভিযাত্রা চালাচ্ছিলেন তাঁর পক্ষে একটিও জ্যান্ত ওরাংউটানকে কাছে থেকে দেখা সম্ভব হয়নি। গাছের ওপর থেকে গুলি করে মাটিতে ফেলা মৃত ওরাংউটান দেখেই তাঁকে সন্তুষ্ট হতে হয়েছে। এভাবেই এই অদ্ভুত প্রাণীটির প্রথম খবর স্থানীয় মানুষের বাইরে অন্যদেরকে জানাতে পেরেছিলেন। স্থানীয়রাও এর সম্পর্কে খুব কমই জানতো, তারা বরং সুযোগ পেলে শিকার করে মেরে ফেলে এর মাংস খেতেই বেশি পছন্দ করতো। সেই অবস্থা থেকে অনেক সরে গেছে আজকের উভয়ের সম্পর্ক– মানুষের ও ওরাংউটানের।

শান্ত আর রাহিল ফিরে যাওয়ার পর বাকিদেরও ছুটির আমেজটি কেটে গিয়ে বরং কিছু সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধানী কাজের দিকে মনোযোগ গেল পরবর্তী এক সপ্তায়।

সোফিয়ার মাথায় বরাবর একটি চিন্তা হলো ওরাংউটানের বুদ্ধিকে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা। ইন্টেলিজেন্টের সাধারণ বুদ্ধি বিন্দুমাত্র না থাকা সত্ত্বেও এটি দিব্যি কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক সবার জায়গা দখল করে বসেছে। এর প্রত্যেক ভূমিকায় এটি দারুণ সফল; অথচ তার নিজের সচেতনতা বা বোধশক্তি বলতে কিছু নেই, নতুন কোন ভিন্ন পরিস্থিতি সামনে চলে এলে সেটিতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবার সুযোগ তার নেই। অন্য দিকে যথেষ্ট সংবেদনশীল হয়েও কবি-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী কিছুই হবার মত বুদ্ধি নেই ওই বেচারা ওরাংউটানের। কিন্তু কত ভাবে না সে বুঝিয়ে দেয় যে তার বোধ শক্তি আছে, আঘাত পেলে তার ব্যথার বোধটি আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়, গাছের পাতার ভেতর লুকানো ফলের উপস্থিতি সে নানা ভাবে ধরে ফেলে। সোফিয়া ওরাংউটানের এসব বুদ্ধির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি ময়নাকে দেখাতে চাচ্ছিলেন এগুলো।

বোর্নিওর বাদল বনে থেমে থেমে বৃষ্টি নিত্য দিনের ঘটনা। ময়নার খুব মজা লাগে ওরাংউটান খোলা জায়গায় থাকতে বৃষ্টি এলে সে কলাপাতা জাতীয় যে কোন একটি বড় গাছের পাতাকে মাথার ওপর ছাতার মত ধরে দৌড়ে গাছের ওপর ওঠে, সেখানে পাতায় ঢাকা একটি জায়গা খুঁজে বের করে পানি থেকে রক্ষা পেতে। ময়নার রীতিমত হাসি পায় যখন আরো বড় পাতার মাঝে মাথা গলাবার মত একটি ছিদ্র করে ওটাকে বর্ষাতির মত গায়ে পরে নেয়। এসব নিয়ে কেন্দ্রের কর্মীদের সঙ্গে তার কথা হলো। ওরা বল্‌লো এই বর্ষাতি তৈরিটি শুধু এই অঞ্চলের ওরাংউটানদের মধ্যে দেখা যায়, সারওয়াক বা সুমাত্রায় যেগুলো আছে তাদের মধ্যে নয়। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটি একটি স্থানীয় ফ্যাশনের মত সৃষ্টি হয়েছে পরস্পর দেখাদেখি। এজন্য বিজ্ঞানীরা ওরাংউটান সমাজে নানা 'কালচারের' কথা বলেন।

কালচারগুলো আরো ভাল বোঝা যায় নানা কাজের জন্য যুৎসই হাতিয়ার ব্যবহারের মধ্যে। নানা কাজের সুবিধার জন্য গাছের ডাল ভেঙ্গে লাঠি হিসেবে তারা হাতে নেয়। কিন্তু সেই লাঠির ব্যবহারটি এক এক জায়গায় এক এক রকম হতে দেখা গেছে। এখানকার ওরাংউটান লাঠির একটি বিশেষ ব্যবহার করে এর কোন বাঁকা অংশ দিয়ে দূরের গাছের ফল টেনে নিজের দিকে আনতে। এটি নাকি সুমাত্রার ওরাংউটানরা করেনা। আবার সুমাত্রারগুলো নাকি

মৌচাক থেকে মৌমাছি তাড়াবার জন্য লাঠিকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ব্যবহার করে যা এখানকারগুলো জানেনা।

ময়না আরো পুলকিত হয় যখন দেখে খাওয়া দাওয়া সেরে এরা গাছের ছোট ছোট পাতা ছিড়ে নিয়ে তা দিয়ে মুখ মোছে, অনেকটা আমরা যে ভাবে মুখ মুছতে টিশ্যু পেপার ব্যবহার করি। অন্য দিকে সুমাত্রার ওরাংউটানরা নাকি রীতিমত ছুৎবাই গ্রস্তদের মত বড় পাতায় হাতটাকে গ্লাভসের মত না ঢেকে নতুন কিছু স্পর্শ করতে চায়না। এভাবে তারা গাছের কাঁটা, রুক্ষতা এগুলো এড়িয়ে চলে। এখানে গ্লাভ্‌স পরা দেখা না গেলেও কাঁটা থাকতে পারে এরকম জায়গায় বসতে শুতে হলে ওরা আগে পাতা বিছিয়ে চাদরের মত জায়গাটি ঢেকে নেয়। ওরাংউটানের ঘুমানোর জন্য বিছানা করা দেখাটি অবশ্য সহজ নয়। সোফিয়া ময়নাকে নিয়ে রীতিমত একটি এ্যাডভেঞ্চার করেছে এই জন্য। বনের মধ্যে উড়াল পায়ে হাঁটা পথে গিয়ে একেবারে গাছের শামিয়ানার মধ্যে অনুসন্ধান করে কোথাও কোথাও বের করতে পারলো আগের রাতে ঘুমানোর জন্য ব্যবহার করে ফেলা কিছু কিছু বিছানা। বনের ওপর ১৫-২০ ফুট উঁচু জায়গা থেকে শুরু করে শ'দেড়শ ফুট উঁচুতেও এমন বিছানা দেখা যায়। ঘুমের মধ্যে যেন এত উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা যেন না থাকে সে জন্য যথাসম্ভব সমতল একটি জায়গা গাছের শাখা-প্রশাখার মধ্যেই নানা ডাল-পাতা আটকিয়ে তৈরি করে নেয়। তার ওপর আরামের জন্য যথেষ্ট পাতা বিছিয়ে একটি তুলতুলে গদি তৈরি করে। পুরানো বিছানা ওরা পারতপক্ষে আবার ব্যবহার করেনা, প্রত্যেকবার নতুন করে তৈরি করতে অনেক সময় ব্যয় করে, এমনকি দুপুরে লম্বা দিবানিদ্রা দেবার জন্যও নতুন বিছানা। হয়তো আগের বিছানায় ইতোমধ্যে ডাল-পালা কিছু সরে গিয়ে নিরাপত্তার অভাব হতে পারে বলেই এমন পরিশ্রমী অভ্যাস গড়ে ওঠেছে।

কালচারের কথায় সব থেকে আশ্চর্যজনক যা শোনা গেলো তা হলো শুধু উত্তর বোর্নিওর এই বনের ওরাংউটানরা বিশেষ এক রকম গাছের পাতাকে ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহার করে। ওই পাতা মুখে চিবিয়ে থুতু মিশিয়ে এক রকম মলমের মত তৈরি করে তাদেরকে ব্যথার জায়গায় লাগাতে দেখা গেছে। ঠিক ওই পাতাই ছেঁচে নিয়ে স্থানীয় ডায়াক আদিবাসীরা এক সময় ব্যথা নিবারণে ব্যবহার করতো বলে শোনা যায়। আজ অবশ্য ডায়াকদেরও যাবতীয়

ওষুধপত্র চিকিৎসা একই ইন্টেলিজেন্ট মেডিক্যাল নেটওয়ার্কের অধীনেই রয়েছে। কিন্তু প্রশ্নটি থেকে যায় ওই যে এক সময় তারা এই ভেষজ পাতা ব্যবহার করতো তা কি ওরাংউটানদের কাছ থেকে শিখেছিলো, নাকি ওরাংউটানরা ডায়াকদের থেকে শিখেছিলো। ওরাংউটান যে শিখতে পারে তা স্পষ্ট, নইলে এক এক জায়গার কালচার ভিন্ন হতোনা। এসব ব্যাপারে তাদের সক্ষমতা মানুষের খুব কাছে।

ওরাংউটানের অনেক ব্যক্তিগত আচরণও মানুষের আচরণের খুব কাছে। শিশুদেরগুলো তো ময়না ও সোফিয়া আগেই দেখেছে। কিন্তু এবার বড়দের আচরণও দেখার সুযোগ হলো। ব্যথা পেলে যে মুখভঙ্গি করে স্পষ্ট বোঝা যায় ব্যথার অনুভূতি। কাঁটা বিধলে বা পতঙ্গের আক্রমণ হলে ব্যথার সঙ্গে বিরক্তির ভাবটিও বেশ বোঝা যায়। চুলকানি বেশি হলে লম্বা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে শরীরের অগম্য জায়গাগুলোকে চুলকাবার যে প্রয়াস দেখা যায় তাও বেশ কৌতুহল সৃষ্টি করে।

সোফিয়া ভাবেন তাঁর ইন্টেলিজেন্ট বন্ধুরা যধি ওরাংউটানেরও এইটুকু গুণগুলো পেতো! তাপসী, আপন জন ওরা ভাষায় অনেক আনন্দ, দুঃখ, ব্যথা ইত্যাদি প্রকাশ করে। তার একটি প্রতিক্রিয়াও সোফিয়া তাদেরকে দেন। কিন্তু তিনি জানেন ওরা ওই পরিস্থিতিতে আনন্দ বা দুঃখকে সে ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বলে নির্ণয় করেছে বলেই এমন কথা বলছে; ওরা এসব সত্যি সত্যি অনুভব করছেনা। ব্যথা পাচ্ছেনা, কাজেই তার ব্যথা উপশম করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে ওরাংউটান কিন্তু মানুষের মতই ওসব অনুভব করছে, এবং ওভাবেই চিৎকার বা মুখভঙ্গি করে তা জানাতে দ্বিধা করছেনা– স্বাভাবিক ভাবেই সোফিয়ার হাত চলে যায় তার দিকে, তাকে সান্ত্বনা দেয়া বা সাহায্য করার দিকে। আর ভাবে যদি তাপসীকেও এভাবে দুঃখ মোচনের উপযুক্ত করা যেতো, তা হলে কতই না ভাল হতো!

মস্তিষ্ক অনুসন্ধানী

এই গবেষণা কেন্দ্রের বর্তমান ডিরেক্টর মায়াবতী সালামতের সঙ্গে সোফিয়ার বন্ধুত্ব তিনি ডিরেক্টর হবার বহু আগে থেকেই। এখানে তাঁর প্রথম সফরের সময় থেকেই আলাপ, এক সঙ্গে কাজ এবং পরে যোগাযোগ থেকেছে সোফিয়ার

সঙ্গে এই ইন্দোনেশীয় বিজ্ঞানীর। এবারও মায়াবতীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হচ্ছে সোফিয়ার এখানে অল্প কয়েক দিনের কাজের সময়। তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে এক ওয়ার্কিং লাঞ্চে মায়াবতী সোফিয়াকে তাঁর দফতরে আমন্ত্রণ জানালেন, কেন্দ্রের সর্বশেষ কিছু কাজ সম্পর্কে আলাপ করতে।

মায়াবতী: 'আমরা "ওয়ালেস দশক" নাম দিয়ে একটি বড় দশ-সালা প্রজেক্ট খুব সম্প্রতি শেষ করেছি। ওয়ালেসকে দুনিয়া প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো, তিনি যে ডারউইনের সঙ্গে একই সময়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীববিবর্তন আবিষ্কার করেছিলেন সেই কথাটুকুও মনে রাখেনি। বিশেষ করে এই পুরো বোর্নিও এবং আশপাশের সকল দ্বীপগুলোর জীব জগতের খবর তিনি যে প্রথম বহির্বিশ্বকে জানিয়েছিলেন একথাও মানুষ ভুলে গেছে। তাই তাঁর স্মরণে পরিচালিত এই গবেষণা বর্তমান ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি উন্নয়ন ধারার সঙ্গে এইপ-গবেষণার যোগসূত্রটির একটি শক্ত ভিত দেবার চেষ্টা করেছে। আমাদের বন্ধু সোফিয়া মানাজিরের আসার সুযোগে আমরা এ অগ্রগতি তাঁকে জানাতে চাই।'

সোফিয়া: 'অনেকে ধন্যবাদ মায়াবতী, আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হতে এ সভায় আসতে পেরে ধন্য হলাম। এ প্রজেক্টের আইডিয়াটি চমৎকার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই যোগসূত্রের গুরুত্বটি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিলো, কিন্তু এমন ফোকাস করা গবেষণা, দীর্ঘ দশ বছর জুড়ে, এটি দারুণ খবর।'

মায়াবতী: 'ওরাংউটানের সম্পূর্ণ জেনোম উদ্ঘাটন বহু আগেই হয়েছিলো। কিন্তু এ প্রজেক্টের সময় শিম্পাঞ্জি, গরিলা ও ওরাংউটান জেনোমের বিশ্লেষণ মানব জেনোমের সমপর্যায়ে আনা হয় এবং তাদের তুলনামূলক কগ্‌নিটিভ ক্ষমতাটির চাবিকাঠি কোথায় বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। ঠিক কোন্ জিন-গুচ্ছের কারণে মানুষ মনের ভাবনা ভাবতে পারে, অন্যের মনের কথাকে নিজের ভাবনায় আনতে পারে কিন্তু ওরাংউটান পারেনা, সেটি বের করা হয়েছে এবং তা মস্তিষ্কে কোন্ পরিবর্তনের মাধ্যমে কার্যকর হয় তাও। মস্তিষ্কে স্নায়ু স্ফূরণের কোন্ প্যাটার্নগুলো চেতনা ও আত্মসচেতনা সূচিত করে তার একটি ম্যাপিং করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরের পদক্ষেপটি হতে পারবে ওই ম্যাপের একটি সরলীকৃত গাণিতিক মডেল খাড়া করা, যার একটি ইলেকট্রনিক রূপায়ন হয়তো এক রকম আত্মচেতনার মত আউটপুট সৃষ্টি করতে পারবে। অবশ্যই জৈব চেতনার সঙ্গে কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার আত্মচেতনার আকাশ পাতাল

তফাত থাকবে। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে যদি একটুকুও কমন গ্রাউন্ড থাকে তাহলে ইন্টেলিজেন্ট চেতনার গবেষণা ওখান থেকেই চলতে পারে। আমার বিশ্বাস সোফিয়া এতে প্রচুর উৎসাহ পাবেন।'

সোফিয়া: 'ঠিক ধরেছেন, আমার দারুণ আগ্রহ এতে। মস্তিষ্কের স্নায়ু স্ফূরণে সৃষ্ট মানব চেতনার সঙ্গে তুলনীয় ইলেকট্রনিক কোন চেতনা নিয়ে ওই সার্কিট সাড়া দিচ্ছে এমন খবরে কে না উদ্বেলিত হবে? আমি অবশ্য বিষয়টিতে বহুদিন ধরে নিজে নিজে কিছু পড়াশুনা করার চেষ্টা করেছি। তারপরও আমার ভয় গাণিতিক মডেলে এনে করা এই কমন গ্রাউন্ডের মর্মটি আমি ঠিক ভাবে বুঝবো কিনা। এই কমন গ্রাউন্ডের ব্যাপারে আমার জ্ঞানটি নাগরিক জ্ঞান, মোটেই বিশেষজ্ঞ জ্ঞান নয়। তবুও এর আকর্ষণ আমি কখনো এড়াতে পারবোনা।'

আনোয়ার: 'আমি মায়াবতীর একজন সহকর্মী আনোয়ার। সোফিয়া শুনে খুশি হবেন যে অনেক ব্যাপারে আমাদের অনেকেও নাগরিক জ্ঞানের ওপর ভরসা করেই কাজে নেমেছিলাম, এখন এতদিনের কাজের পর মনে হচ্ছে কিছুটা ভিত আমরা দিতে পেরেছি। আমি এতে এসেছিলাম বিজ্ঞান ইতিহাসের দিক থেকে, বিশেষ করে বিবর্তন ইতিহাসের দিক থেকে। তারপর এক সময় ওয়ালেস দশকের মূল কাজের সঙ্গেই জড়িয়ে গেছি। বিবর্তন-ইতিহাসে একটি আবশ্যিক শর্ত ভেসে ওঠে যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অসংখ্য ধাপে যে দেহাংশ বা যে আচরণ বিবর্তনে গড়ে ওঠে তার শেষ ফলটির আর সরল কিছু হবার যো থাকেনা, তাকে অবশ্যই জটিল প্রকৃতির হতে হয়। কাজেই নানা প্রাণীর মধ্যে বিবর্তিত হয়ে যে স্নায়ু স্ফূরণ চেতনা সৃষ্টি করেছে তাকে সরল গণিতে প্রকাশ প্রায় অসম্ভব কাজ মনে হয়।

মজার ব্যাপার হলো প্রায় ৪০ বছর আগে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল নামের একটি সফ্‌টওয়্যার মানুষের ভেবে চিন্তে বলা কথাকে অনুকরণ করতে পেরেছিলো নিজে অনেকটা সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে। সঠিক শব্দ সে সাজাতে পেরেছিলো মানুষের কথোপকথনের অনেক নমুনা থেকে দেখে দেখে তার মধ্যে বার বার আসাগুলোর ভেতর একটি প্যাটার্ন আবিষ্কার করে। দেখে মনে হবে সে মস্তিষ্কের মত চিন্তা করেই কথা বল্‌ছে, কিন্তু আসলে ইলেকট্রনিক সার্কিটের কারসাজি এটি। যেভাবে সার্কিট সাজানো হয়েছিলো তার নাম দেয়া হয়েছিলো নিউরাল নেটওয়ার্ক– যেন মস্তিষ্কের

নিউরোন জালকেই এখানে সার্কিটে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ওই নিউরাল নামটিতে মনে হয় একটু বেশি দাবি করা হয়েছে। মস্তিষ্কের সঙ্গে এতটা সম্পর্ক এর ছিলনা– বরং একে একটি গাণিতিক ব্যবস্থা বল্লেই ভাল হতো যা ইনপুট থেকে আউটপুট দেবার সময় মোটামুটি প্রত্যাশিতটাই দিতে পারে। তাই বলে একে স্নায়ু জালের সরলীকৃত রূপ বলা যায়না। এই ক্ষেত্রে গাণিতিক ব্যবস্থাটি সম্ভব হয়েছিলো। তাই বলে শুধু এই পথে হেঁটে চিন্তা চেতনাকে যে ইলেকট্রনিক্সে নিয়ে আসা যায়না, তা আমরা গত দশ বছরে বেশ টের পেয়েছি। ওয়ালেস প্রজেক্ট বরাবরই খুব উচ্চাকাঙ্খী ছিল।'

সোফিয়াঃ আর সে জন্যই আপনারা এতটা পথ আসতে পেরেছেন, অন্তত মূল লক্ষ্যে থেকেই ভবিষ্যতের জন্য একটি পথ রচনা করতে পেরেছেন। আপনি নাগরিক বিজ্ঞানী হিসেবে শুরু করে এতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরেছেন। আমিও নাগরিক হয়েও অন্তত তার খানিকটা যাতে বুঝতে পারি, সেই দুঃসাহস করছি।'

মায়াবতীঃ 'আমাদের দিক থেকে কাজের একটি বড় অংশ হচ্ছে চেতনার স্নায়ু প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী জিন পরিবর্তন। এটি আমরা ওরাংউটান সহ গ্রেট এইপদের মধ্যে ও মানুষের মধ্যে বিশ্লেষণ করে তার ধারাবাহিকতাটি বোঝার চেষ্টা করছি। দেখেছি চেতনার যেটুকু এইপের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে তার জিনকোড মানুষের থেকে কোথায় ভিন্ন দেখে আমরা হয়তো আমাদের গাণিতিক মডেলের জন্য একটি ইশারা ওখান থেকে পেয়ে যাবো। জিন এবং মস্তিষ্কে তার রূপায়ন বিষয়ে আমাদের কেন্দ্রের গর্ব হলেন মার্টিন লী। তাঁকে আমি সোফিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, তিনি যেন তাঁর কাজটা নিয়ে একটু বলেন।'

মার্টিনঃ ধন্যবাদ মায়াবতী, ধন্যবাদ সোফিয়া। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা মানুষের থেকে সরলতর কগনিটিভ স্নায়ু জাল ও তার কোড নিয়ে শুরু করতে চেয়েছি। প্রথমে এইপের নিউরো কোর্টেক্সে পরীক্ষা চালিয়েছি এই জন্য, পরে মানুষেরও। নির্জীব মস্তিষ্কে ফ্লুরোসেন্ট স্পেকট্রোমেট্রি, জীবন্ত অবস্থায় স্ক্যানিং করে ইমেজিং, ইত্যাদি যেমন মস্তিষ্কে পরীক্ষা চালিয়েছি তেমনি জিন ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দেখেছি জিন কী ভাবে মস্তিষ্কে সেই স্নায়ুজালকে বাস্তবায়িত করেছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে মানুষ আর এইপে এসবের

পার্থক্য খুব স্পষ্ট হবার মত বড় কিছু ছিলনা। কিন্তু একটি জায়গায় গিয়ে লক্ষ্য করার মত একটি পার্থক্য পাওয়া গেছে। অন্য সব কোষের মত স্নায়ুকোষও যখন তার প্রতিলিপি তৈরির জন্য বিভক্ত হয় সেই প্রক্রিয়ায় গিয়ে মানুষ ও এইপে পার্থক্যটি লক্ষ্যণীয়। মনে করা সঙ্গত যে এই পার্থক্যই এইপের চেতনাকে মানুষের চেতনার থেকে সরলতর পর্যায়ে রেখেছে। এখন আমরা জোর দিচ্ছি এই সন্দেহ করা সারল্যটির প্রকৃতির ওপর– গাণিতিক মডেলিং করার জন্য এই সরলকে আরো সরল ভাবে উপস্থাপিত করার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। এটি অনেক দীর্ঘ অনুসন্ধানের ব্যাপার, করে করে দেখতে হচ্ছে কোন্ পথে গেলে তা খুঁজে পাওয়া যায়, আদৌ পাওয়া যায় কিনা।'

সোফিয়া: 'মজার ব্যাপার হলো এই যে বার বার করে করে দেখার মাধ্যমে একটানা অনুসন্ধান তা বিজ্ঞানের কাজে রত ইন্টেলিজেন্টদের মাধ্যমেই সম্ভব। তারা এত ক্ষিপ্রতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করে, কিন্তু তাদের মত ইন্টেলিজেন্টকে চেতনা আবেগ দেবার লক্ষ্যে যে এই কাজ সেই চেতনাটিই নেই বলে এই কাজের সঙ্গে তাদের নিজেদের ভাগ্যের সম্পর্কটাই বুঝতে পারেনা। অচেতন ভাবে চেতনার কাজই বটে! আর এই চেষ্টা সফল হয়ে সত্যিই যদি তাদের মধ্যে কিছু আত্মোপলব্ধি জন্মে, এতো সরলীকরণের পরে গিয়ে সেটির সঙ্গে আমাদের উপলব্ধির আদৌ কি কোন মিল বা সম্পর্ক থাকবে?'

মায়াবতী: 'আমার মনে হয় এ সম্পর্কে সব থেকে ভাল বলতে পারবেন জিম হকিন্স– আমাদের চেতনা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। বিবর্তনের কোন্ পর্যায়ে জীবের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়েছে সেই অতি পিচ্ছিল বিষয়টির ওপর মতামত দেবার জন্য তাঁর মত সক্ষম কেউ হয়তো সারা দুনিয়াতে নেই।'

জিম: 'না সেরকম কিছু নয়, ওটা মায়াবতীর পক্ষপাতিত্ব। সোফিয়ার প্রশ্নটি খুবই ইন্টেরেস্টিং। আত্মচেতনার যে স্বরূপ তা সবার ক্ষেত্রে একই কিনা, বা আমরা নিজেদের চেতনার অভিজ্ঞতা থেকে অন্যদের মধ্যে যাকে চেতনা বলে মনে করতে পারি, সেই জিনিসটি সম্পর্কে কতখানি জানি। বিবর্তনের ইতিহাস যতখানি উদ্ঘাটিত হয়েছে দেখা গেছে চেতনার ও উপলব্ধির মত পরিস্থিতি এর বিভিন্ন শাখায় হঠাৎ হঠাৎ উদয় হয়েছে। প্রাইমেট গোষ্ঠিতে বানরদের মধ্যে সেটি বেশ দক্ষ। আবার অন্য বিভিন্ন শাখায়ও তা শেখা গেছে যেমন জলজ

স্তন্যপায়ীদের গোষ্ঠিতে ডলফিনে, বড় স্তন্যপায়ী হাতিতে, অন্যদিকে খুব ছোট স্তন্যপায়ী ইঁদুরে, দাঁড়কাকের মত পাখিতে, এমনকি ছোট্ট পতঙ্গ মৌমাছিতে এমন কিছু দেখা যায় যাকে দুঃখ, শোক, আনন্দ ইত্যাদি উপলব্ধিজাত গভীর আবেগ বলে মনে হয়। আমরা মানুষের কাছে ওদের আচরণে ব্যাপার এরকমই মনে হয়েছে। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক ভাবে তা যাচাইয়ের উপায় নেই। কেউ যদি বলেন যে গোলাপের লাল রং তাঁর মধ্যে এক প্রকার রক্তিম চেতনা সৃষ্টি করেছে, এটি শুনে অন্য কেউ কি বুঝবেন ওই চেতনাটি ঠিক কী রকম। বিভিন্ন প্রাণীর চেতনা ওভাবে বোঝাটি আরো অনেক কঠিন– হাতি বা মৌমাছি কী অর্থে সচেতন? প্রাণীর সঙ্গে আমাদের বিবর্তনগত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সেখানে কাজটি কঠিন, ইন্টেলিজেন্ট সফ্টওয়্যারের ক্ষেত্রে যদি কেউ চেতনার দাবি করেও সেটির প্রকৃতি যাচাইয়ের কাজটি তার চেয়েও কঠিন হবে বৈকি। হ্যাঁ, জৈব চেতনা থেকে ইলেকট্রনিক চেতনার পরিকল্পনায় যে ভাবে আসতে পেরেছি সে কথা মনে করলে তার স্বরূপেরও একটি আন্দাজ দাঁড় করাতে পারবো। তবে চেতনার স্বরূপ না বুঝে গাণিতিক মডেল করতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে।'

মায়াবতী: 'আমরা অনুসন্ধানটি শুরু করেছিলাম ওরাংউটানকে কেন্দ্র করে। ওরাংউটানকে তার বাহ্যিক আচরণ থেকে, মস্তিষ্ক বিদ্যাও পূর্ণ জেনোম উদ্ঘাটন থেকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ভাবে জানাটিই ছিল বড় প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ওয়ালেস দশক প্রজেক্টটি নেয়া হয়েছে ইন্টেলিজেন্ট চেতনা সৃষ্টির পথের একটি পদক্ষেপ হিসেবে, যেটিতে ওরাংউটান ও অন্যান্য জীব গবেষণাগুলো কাজে আসবে। শেষ অবধি আমরা বিষয়টির শুরুটি করে দিতে পেরেছি বলেই মনে হচ্ছে।'

পেশাদার জাহাজ বিজ্ঞানী সোফিয়া তাঁর নাগরিক বিজ্ঞানী রূপটিকে পুরো দস্তুর প্রকাশ করছিলেন এখানে 'ছুটি কাটাবার' অজুহাতে এসে। এই নাগরিক বিজ্ঞানী কখনো একটি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক শাখাতে আটকে থাকেনা, চিন্তা যেখানে নিয়ে যায় সেই মিশ্র বিজ্ঞানের আস্বাদনের চেষ্টা করে; সোফিয়া যেমন খুঁজে নিয়েছেন জৈব-অজৈব বুদ্ধির সীমান্তটিকে। সোফিয়া যখন এখানকার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে, ল্যাবোরেটরিতে তাঁদের কিছু কিছু কাজ দেখে এবং ওরাংউটানের আবেগ সম্পর্কে সর্বশেষ এক্সপেরিমেন্ট পরিকল্পনাগুলো বোঝার চেষ্টা করছিলেন, ময়নার দিনগুলো তখন কাটছিলো এতিম ওরাংউটান

শিশুগুলোর নার্সারিতে। এই প্রাণীটির যে দুর্দশা পাম চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে নেমে এসেছিলো তা এখন ইতিহাস। কিন্তু দুর্দশা নতুন রূপে নিয়ে এসেছে জলবায়ু পরিবর্তনে। তাই এত ভাল বন সংরক্ষণের মধ্যেও জলবায়ুর পীড়নে প্রায় ওরাংউটান দলগুলোর মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে, মৃত্যু ও পীড়িত হবার হার কিছুদিন পর পর হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছে– আর আরো কিছু শিশু এতিম হচ্ছে। কাজেই সেই প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে যে ওরাংউটান নার্সারি ও শিশু সদন এখানে গড়ে ওঠেছিলো সেটি কালক্রমে আরো কার্যকর হয়েছে, এবং কয়েকদিনের জন্য এখন এটিই ময়নার প্রিয় জায়গা। তাকে দেখা যাচ্ছিলো দেবী, ফরিদা, ইয়াসিন ও অন্যান্য কয়েকজন ওরাংউটানের মানুষ-মায়ের সঙ্গে বাচ্চার যত্ন করার কাজে। সেই সঙ্গে সমানে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিলো আর কখনো কখনো নোটও নিচ্ছিলো।

দেবী: 'ময়না দেখো, আমরা ওদের সঙ্গে এমন আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যেন ওরা মানবশিশু ছাড়া কিছুই নয়– ওরাংউটান কথাটি মনেই থাকেনা, তাদের চেহারা আর ভাবসাবে তেমনটি মনে রাখার কোন প্রয়োজনই হয়না। যেমন দুটি শিশুতে ঝগড়া বাধলে আমরা প্রত্যেকটিকে হাতে ধরে তুলে আলাদা করে দিচ্ছি। এভাবে মনে হচ্ছে একটি শৃঙ্খলা তারা ছোট বেলা থেকে শিখেছে। কিন্তু এসব প্রত্যেকটি কাজে একটি ভাবনা সব সময় মাথার মধ্যে রাখতে হয়– ক'দিন পরেই তো ওদেরকে বনে বন্য জীবনে ছেড়ে দিতে হবে, আমরা এসব যত্ন ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের বন্য জীবনের দক্ষতাগুলোকে এবং সেখানকার শেখার ক্ষমতাগুলোকে বাধাগ্রস্ত করছিনা তো! স্বাভাবিক ভাবে এ সময় ওরা মায়ের কোলে-পিঠে তার সঙ্গে সব জায়গায় যেতো। অনেক বয়স পর্যন্তই মায়ের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতো ও শিখতো। আমাদের উভয় সংকট হলো মায়ের অভাব ততদিন পর্যন্ত আমরা পূরণ করতে পারছিনা, কারণ আমাদের পরিবেশ স্বাভাবিক বন্য পরিবেশ নয়। কিন্তু তার আগে যদি ওরা বনে যায়, মায়ের মত চোখ কে রাখবে ওদের ওপর? তাই আমরা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটু একটু কাছের বনে ঘুরতে বাধ্য করছি, কিন্তু ফিরিয়ে এনে যত্ন করছি। পুরো আমাদের ওপর নির্ভরশীল থাকুক সেটিও চাচ্ছিনা; আবার ওদের সঙ্গে আত্মার সম্পর্কটিও ভুলি কেমন করে?'

ইয়াসিন: ‘আমার বাড়ি এখানে বোর্নিওতে নয়, মালয়েশিয়ার মূল ভূখণ্ডে খেদাতে। কিন্তু এই ওরাংউটানদের টানে আজ এই সেপিলকই আমার বাড়ি। ময়নার মতো অতিথিরা হয়তো এই এদের সবাইকে কিছু ওরাংউটান হিসেবেই চিনবে। কিন্তু আমার কাছে ওদের কয়েক প্রজন্মের সব বয়সের সবাই এক একজন আলাদা ব্যক্তিত্ব, সেই ছোট্ট শিশু অবস্থা থেকেই। প্রত্যেককে আমি আলাদা ভাবে চিনি, ওরা যে আমাকে খুব ভাল করে চেনে সেটিও আমি টের পাই। হ্যাঁ, সবইতো হৃদয়ের টানে। কিন্তু শুধু হৃদয়ের টানে হলে একাজ করতে পারতামনা। কাজ করতে হয় বিজ্ঞানের টানেও, এদের সঠিক পুনর্বাসন করতে গেলে যা দরকার। স্কুলের পর আমার আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া আর এগুয়নি, কিন্তু এখানে এসে অমূল্য সব বিজ্ঞানের বিষয় শিখেছি, শিখতে হয়েছে। এখানে বড় বড় ওরাংউটান বিশেষজ্ঞরা আছেন; কিন্তু অনেক কিছুতে তাঁদের পর্যন্ত যেতে হয়না, আমরাই করে ফেলি– তা দৈনন্দিন সমস্যা-সমাধান হোক, কি গবেষণার কাজ হোক। এই যে আমাদেরকে দেখছো আমরা এখন একাধারে মনস্তত্ত্ববিদ আর ডাক্তার। দীর্ঘদিন ওরাংউটানের সঙ্গে ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাটিয়ে এটি আমরা অর্জন করেছি।’

ময়না: ‘আমি নিজে কিন্তু হৃদয় আর মাথার কল্পনা ছাড়া আর কিছুই বুঝবোনা। আমি একজন সামান্য আর্টিস্ট। যা করছি সাধারণ জ্ঞান দিয়ে করছি, আপনাদের দেখাদেখি। জানি তা যথেষ্ট নয়, ভুল করে ফেল্‌বো। কিন্তু আর্টিস্ট হিসেবে আমি ওরাংউটান শিশুর মুখের মধ্যে একটি জগৎ দেখি যেটি ওদের জগৎ পার হয়ে মানুষের জগৎ হয়ে আমার যে অভিভাবক ইন্টেলিজেন্ট “আপন জন” তার জগৎ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কল্পনার ওই স্বাধীনতাটি আমি নিয়ে থাকি। পেন্সিলেই হোক, রং-তুলিতেই হোক বা এই ক্যামেরাতেই হোক আমার হাত নিশপিশ করে করে ওরাংউটানকে এমনভাবে দেখতে যাতে এটি দেখে মানুষ কিছু একটা অন্যভাবে তার কথা ভাবুক, তার চোখে চোখ রেখে তার চিন্তাটি নিজে ধারণ করতে পারুক।’

ফরিদা: ‘আমি সবার আগে তোমার আর্টের সমজদার হতে চাই। এমনি কিছুর জন্যই আমি মুখিয়ে আছি। এই আমরা ওরাংউটানের মা’রা, তাদের বাচ্চারা, বন থেকে নেমে আসা তাদের বুড়ো বাচ্চারা, সবাই মিলে যে অদ্ভুত জগৎ রচনা করেছি সেটি নিয়ে বিজ্ঞানীরা, পরিবেশবাদীরা, জীবপ্রেমিক নাগরিকরা

অনেকে সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। তাঁদের মনোযোগ আমরা উপভোগ করি। কিন্তু আমি অন্তত এ পর্যন্ত কোন আর্টিস্টকে এ জগতের দিকে মনোযোগ দিতে দেখিনি। তুমি এখন তাই দিচ্ছো– এটি আমার জন্য নতুন। তোমার শিল্পী মন এমন কিছু সৃষ্টি করবে যার ফলে শিল্প রসিক মানুষ আমাদের জগতটিকে বিচিত্র নানা চোখে দেখবে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো ধরা পড়বে– ছবিতে, গল্পে, কল্পনায়।'

ময়না: 'আমার জন্য ব্যাপারটি একেবারে নতুন নয়। বাংলাদেশে যেখানে আমি থাকি সেখানে আমার আর্টের জন্য কেমন করে জানি একটি ক্ষেত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছি– তা হলো মানুষ নয় এমন অন্যদের জীবন। ছোট বেলায় আমার অভিভাবক ইন্টেলিজেন্ট আপন জন আমার ভাবনার অনেকখানি দখল করেছিলো। তাকে শুধু একটি পর্দায় দেখতাম, অথচ তার জীবন ঘিরে যত কল্পনা। একই রকম হয়েছে আমাদের বাড়ির কুকুর তীব্রকে নিয়ে। তাদের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগের আটপৌরে সব কিছুকে ছাড়িয়ে অদ্ভুত একটি আলো-ছায়ার আর্ট-বুনোনির বন্ধন অনুভব করেছি। পরে সেটি কাছের বন্য প্রাণীদের জীবনেও গড়িয়েছে। ওরাই আমাকে আর্টিস্ট করেছে। বলতে পারেন ওদের সঙ্গে আমার একটি অন্যরকম মনোসংযোগ হয়েছে। আজ এখানে আপনাদের সঙ্গে ওরাংউটানদের সম্পর্ক দেখে তেমনটিই অনুভব করছি। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ব্যাপারে ওটি হয়না, প্রাণীর ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে ব্যবধানটিই যেন অদৃশ্য থেকে বাড়তি মনোসংযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে। আপন জন পর্দায়, ওই পর্দার আড়ালে তার অন্য অস্থিত্বগুলো টের পাইনা, তীব্র বা ওরাংউটান শিশু ওরাও ভিন্ন রকম পর্দার আড়ালে– অথচ এই তিনের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরকে বুঝি, মনের মাধুরি মিশিয়ে তাকে নতুন ভাবে আবার সৃষ্টি করি; ব্যবধানটিই যেন সৃষ্টির মশলা। আমি তো বলবো মানুষ মাত্রেই সবার মধ্যে এই আর্টিস্ট মনই ওদেরকে প্রাণী-চেতনা বা ইন্টেলিজেন্ট-চেতনার প্রতি আকৃষ্ট করছে– ও নিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি।'

ফরিদা: 'তুমি আমাদেরকেও আর্টিস্ট বানিয়ে ফেলছো। ওই ধারার চিন্তাতো এখন মনে হচ্ছে আমারো উদয় হয়। সম্পর্কের সেই সীমাবদ্ধতাটি যে কবে উড়ে গেছে, তা বুঝতেই পারিনি; সামনে ওরাংউটান শিশুটির জীবনের মোড়গুলো স্বাভাবিক ভাবেই এসে ধরা দেয়।'

ময়না: 'এটি একটি ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মত। ভাবতাম এই ভার্চুয়ালটাই শুধু আমার জন্য সব সময়ের সত্য। এখন দেখছি এটি আপনাদের জন্যও সব সময়ের সত্য। নিজেদের জীবন ও এই প্রাণী-শিশুদের জীবন আপনারা এক করে ফেলেছেন এই নতুন বাস্তবতায়। আপনাদের এই কেন্দ্রটিতে নানা জনকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার অনেক উপাদান আছে। কিন্তু আমার কাছে আপনাদের তৈরি করা এই ভার্চুয়াল রিয়ালিটির সম্মোহনী শক্তির মত আর কিছু এতো আকর্ষণীয় মনে হয়নি।'

রুটিরুজির সমীক্ষা

পিঠ ভাঙ্গা শ্রম

সোফিয়া আর ময়না এক সঙ্গে চট্টগ্রামে ঘরে ফেরে, পেছনে থাকে দারুণ একটি পারিবারিক ছুটি। তার সঙ্গে ছিল প্রকৃতিতে অভিযাত্রা, নাগরিক বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান, আর আর্টিস্টের নতুন খোরাক। ঘরে ফেরার তাড়া ময়নারই বেশি ছিল। গত বেশ কয়েক মাস ধরে সে গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা টিমে কাজ করছিলো। গবেষণাটির বিষয় হলো 'অর্থনৈতিক বিপ্লবে দাসশ্রমের অবসান কতখানি হলো'। ময়নার কাজ এ সম্পর্কে সরজমিনে কিছু সমীক্ষা করা তার নিজস্ব গণ্ডিতে। দুটি কারণে এ কাজটি সে করছে, প্রথমত সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে তাদের কথা জানতে তার আগ্রহ– বিশেষ করে তাদের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে তুলনা করতে; সাম্প্রতিক ইতিহাস তাকে সব সময় আকর্ষণ করে। দ্বিতীয়ত এরকম সমীক্ষা রাহিলও করছে হাওয়াইতে- এই গবেষণাতেই। কাজেই ময়না চেয়েছে চট্টগ্রামে সেও একই অভিজ্ঞতা অর্জন করুক। এ বিষয়ে রাহিলের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানটি তার খুবই কাজে আসছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় মানুষের নানা গোষ্ঠির ভাগ্যের উত্থান পতন নিয়ে রাহিলের অনেক উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা রয়েছে, ওদের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়েও। আর ময়নার সমীক্ষার মানুষগুলো একান্তই তার বৃহত্তর পরিবারেরই যেন অংশ। চট্টগ্রামের যেখানে শান্তর বাড়ি, সেখানকার মানুষ দেড় শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসী শ্রমের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল। ওদের অনেক উত্তরসূরির কাছে সে কাহিনী এখনো জাজ্বল্যমান। ময়নার নিজের সমীক্ষা তাদের নিয়েই।

যখন পর্যন্ত বিদেশে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য কাজ ছিল, সেখানে অন্তত এদেশের শ্রমিকের কাজগুলোকে কমবেশি কায়িক শ্রমের কাজ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলো। এর সময়-কাল হিসেবে উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের পুরোটাই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গবেষণার জন্য এর নানা আলেখ্য ও উপাত্ত নিয়ে নথিপত্র শেষের দিকের বেশ কিছু থাকলেও প্রথম দিকেরগুলো খুবই অপ্রতুল। চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী গবেষণার সহায়তা দানে খুব চটপটে আধুনিক রূপ নেয়াতে ওখানে ময়না রীতিমত একটি ল্যাব ব্যবহার করতে পেরেছে। কিন্তু ময়নার বেশি প্রিয় কাজটি হলো তার নিজের দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যাদের এক প্রজন্ম আগের পূর্বসুরিরা ও মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যত্র শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছে তাদের সঙ্গে কথা বলা। অন্য সবার মত গত দুই এক প্রজন্মের মধ্যেই তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবন অবশ্য সম্পূর্ণ বদলে গেছে ইন্টেলিজেন্ট হস্তক্ষেপের ফলে।

গবেষণার শিরোনামে 'দাসশ্রম' কথাটি আছে। খুব কড়া শব্দ এটি– এতে শুধু মালিকের হুকুমে কায়িক শ্রম দেবার কথা বলা হচ্ছেনা, সেটি অনেকটা যেমন খুশি চাপিয়ে দেয়া ছিল কিনা দেখার ব্যাপার ছিল বাধ্যতামূলক। স্বাভাবিকের গণ্ডি পার হয়ে শ্রম দিতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিসত্তা, ন্যুনতম স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা, এমনকি শারীরিক মানসিক অস্থিত্বকে ঝুঁকিতে ফেলে দাস-প্রভুর মত সম্পর্ক মেনে নিতে হয়েছে কিনা। অবশ্য এই ক্ষেত্রে তখনকার রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক লেখাজোকায়, কথাবার্তায় শব্দগুলো অতটা স্পষ্ট করে ব্যবহৃত হয়নি। পরে শুধু 'আধুনিক দাসশ্রম' বা 'মানব পাচার' নামে একে আনা হয়েছে যখন এক ধরনের জবরদস্তি শ্রম দেখা গেছে। ময়না নিজের আলাপ থেকে এবং পাবলিক লাইব্রেরীতে বিভিন্ন সময় সংগৃহীত মৌখিক ইতিহাস (ওরাল হিস্ট্রি) খুবই মনোযোগ সহকারে শুনে শুনে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এখানকার পরিস্থিতির একটি হদিশ পেয়েছে। কিন্তু আরো পেছনের নথিপত্র যা পেয়েছে তাও এক ধরনের পটভূমি হিসেবে তার কাছে খুব মূল্যবান বলে মনে হয়েছে।

স্থানীয় ভাবে চট্টগ্রামের সমীক্ষাতে আসার আগে দুনিয়াজোড়া উপনিবেশবাদ ষোড়শ শতাব্দী থেকে যা সৃষ্টি করেছে সেটিও প্রয়োজন ছিল এই পটভূমির

জন্য। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে প্রথমে আরবে, ইউরোপে এবং পরে আমেরিকার নতুন মহাদেশ ও তার আশপাশের উপনিবেশগুলোতে ধরে এনে তাদের দাসশ্রম কী ভাবে ওখানকার অর্থনীতির অঙ্গীভূত করেছে তার করুণ কাহিনীর প্রত্যেকটি মোড় ময়নার গবেষণা-পটভূমিতে পরোক্ষ ভাবে ভূমিকা রেখেছে। সরাসরি কাজে লেগেছে নিজের বিশেষ অনুসন্ধানে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাংলার দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলের পর্তুগীজ-হার্মাদ, মগদের হাতে সহায়হীন মানুষের প্রায় একই পরিণতির দলিলগুলো। এই সব ক্ষেত্রে একজন স্বাধীন মানুষকে বলপূর্বক দাসে পরিণত করা হয়েছে, পণ্যের মত জাহাজের ভেতর গাদাগাদি করে বেঁধে রেখে দীর্ঘ দিনে চালান দিয়ে পরে পণ্যের মতই বেচাকেনা করা হয়েছে– সারা জীবন এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম সপরিবারে। দেখা গেছে ওই সরাসরি দাস প্রথার বাইরেও দুনিয়ার বিশাল অংশের মানুষের মত এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও জমিদারের প্রজা, ভূমিদাস, শিল্পের শ্রমিক, দাদনে বাঁধা পড়া জেলে-কুমোর-কামার-হাতের কাজের শ্রমজীবী এমনি নানা ভাবে প্রভু-দাস সম্পর্কের মধ্যে পড়ে ছিলো, যদিও কেউ সেটিকে দাসপ্রথা বলেনি।

ময়নার এই সমীক্ষার কালক্রমটি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অর্থনৈতিক বিপ্লবের সময়টি পেরিয়ে আজ পর্যন্ত। এর যখন শুরু মূল দাসপ্রথার ধারাটি তখন কিছুটা ক্ষয়ে গেছে- কিন্তু প্রভু-দাস সম্পর্ক এবং অমানুষিক কায়িকশ্রম তখনো তুঙ্গে এবং পরে আরো অনেকটা সময় তেমনিই ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমলের যে সব নথি ময়নার হাতে এসেছে তার জন্য চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিঙের খাস মহলে, কলকাতার বর্তমান সেক্রেটারিয়েট ভবনে ও তার আদি রূপ রাইটার্স বিল্ডিঙে, লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে থাকা দলিলের প্রায় সম্পূর্ণ অনুলিপি এখন চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীতে তার ল্যাবোরেটরিতে ময়না পাচ্ছে। এসব তথ্য সহজ ব্যবহার- যোগ্য রূপে অনায়াসে হাতে পাওয়াটি ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি প্রয়োগ এবং বিশ্ব ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্কের ফলশ্রুতি। এসব সম্ভব হবার আগে এই সমীক্ষাটাই অনেকটা কঠিন কাজ হতো। ময়নার কাজটি বরং এখন খুবই আনন্দদায়ক হচ্ছে– যেই বিশাল পরিবর্তন, অর্থনৈতিক যে বিপ্লব ঘটে গেছে তা যে মানব সভ্যতার

ইতিহাসে কত বড় ঘটনা, এক একটি নথির সাক্ষ্য সেটি চমকপ্রদ ভাবে স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

ময়নার আনন্দটি আরো বেশি হয়েছে যখন একেবারেই পরিচিত ও দূর সম্পর্কে আত্মীয়দের নিকট প্রজন্ম যাঁরা প্রবাসী শ্রম দিতে গলদঘর্ম হয়েছেন তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের জীবনে এই ইতিবাচক পরিবর্তনেরও কিছু ছোঁয়া দেখে যেতে পেরেছেন। কিছু ভুক্তভোগীর ঠিক পরের প্রজন্মের মানুষের সঙ্গে কথা বলে তেমনই মনে হয়েছে। উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর যাদের কথা যা আজকের মানুষেরও শোনা কাহিনীতে উঠে এসেছে তারা অধিকাংশ বলতে গেলে প্রজা রূপে জমিদারের সঙ্গে আটকানো মানুষের কথা। এভাবে ভূমির ওপর প্রজা থাকা ছাড়া সাধারণ মানুষের সামনে আর বেশি কোন পথ খোলা ছিলনা। তখনই প্রথম বিদেশে কাজের হাতছানিতে তারা ধরা দিয়েছিলো, যারা সেই তখনকার যৎসামান্য সুযোগগুলো গ্রহণ করতে পেরেছিলো। এ অঞ্চলের মানুষ বার্মা, ভারতের আসামে ডিগবয়, মধ্যপ্রাচ্যে বাহরায়েন, ইরানের আবাদান ইত্যাদি অঞ্চলে গিয়েই প্রথম শুরু করেছিলো অভিবাসী শ্রম দেয়ার কাজ– সেই বৃটিশ আমলে এবং বৃটিশ কোম্পানীতে। অধিকাংশ কাজ ছিল তেল রিফাইনারির কঠিন কাজ। পরে এটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র বিস্তৃত হয়েছে বটে কিন্তু কাজের পরিবেশে অবনতি বই উন্নতি হয়নি। একসময় ওখানে শেখা দক্ষতা দিয়ে কাজ করে কিছুটা সম্মানজনক ভাবে কাজ করতে পারলেও পরে তা আর সম্ভব হয়নি। পরে কাজ বেড়েছে, প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে; সেই সঙ্গে ক্রমেই প্রভু-দাসের সম্পর্কটিই বরং প্রকট হয়ে উঠেছে অধিকাংশের ক্ষেত্রে। কাজও ক্রমে বেশি হয়েছে দালানকোঠা তৈরির শ্রমিক হিসেবে। তপ্ত রোদের নিচে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গাদাগাদি করে বসবাস করতে হয়েছে তাদেরকে।

দেশে কাজের অভাব ও উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অভাব অনেককেই কঠিন কাজের শর্ত জেনেও দলে দলে তাতে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। এর একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে শুধু একটানা কায়িক শ্রম দিয়ে যাওয়াই শুধু নয়, নিজেদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারগুলোর অবক্ষয়, যা এক পর্যায়ে খুবই নাজুক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ফলে মালিকের সব রকমের অন্যায় আচরণ মেনে নিতে হতো এবং কাজে নিরাপত্তার অভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যু অহরহ

ঘটছিলো। তাছাড়া কাজের ভেতরে ও বাইরে অবজ্ঞা-অপমান শুধু দাস-শ্রমের কথাই মনে করাতে পারে। অন্য দিকে ইউরোপের উন্নত দেশে আরেকটু ভাল কর্ম পরিবেশ ও স্থায়ী অভিবাসনের সোনার হরিণ ধরার আশায় মানব পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে জীবনের ঝুঁকি সাংঘাতিক ভাবে বাড়িয়ে ফেলেছিলো, এবং তাদের একটি অংশকে সত্যি সত্যি আধুনিক দাস-মালিকদের দাসত্ব বরণ করতে হয়েছে। দাসশ্রমের দিকটি যে কার্যত সাধারণ প্রবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সক্রিয় ছিল তা দেখা গেছে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের আয়োজনকারী দেশের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে যাতে সময়মত নির্মাণকাজগুলো শেষ করতে পারা যায় সে জন্য যেনতেন ভাবে অভিবাসী শ্রমিকদের ব্যবহার তাদের বহু দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর কারণ হওয়ার মত সংবাদও ছড়িয়ে পড়েছিলো।

বিশ্বজোড়া এই যে অভিবাসী শ্রমিকের কায়িক শ্রমকে ব্যবহার তার মূল নীতি ছিল সব থেকে সস্তা শ্রমের সুবিধাটি নেয়া। এই সস্তা শ্রমের সুযোগ পরে নিয়েছে ধনী দেশগুলোর সব থেকে শ্রমঘন শিল্পগুলোকে সস্তা শ্রমিকের দেশে স্থানান্তরিত করে, অথবা সেরকম দেশে তাদের নির্দেশমত পোষাক ইত্যাদি নিয়মিত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তৈরি করিয়ে নিয়ে। উভয়ক্ষেত্রে সব থেকে সস্তা শ্রমিক পাওয়াটাই ছিল লক্ষ্য। প্রথম দিকে বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়ায় যে পোষাক শিল্প গড়ে উঠেছে সেখানে শ্রমিকের কায়িক শ্রম শুধু সস্তাই ছিলনা অত্যন্ত অবহেলিতও ছিল– আগুন, ভবন ধসে পড়ার মত ভয়াবহ দুর্ঘটনার ঝুঁকি ছিল প্রচুর, ওতে মারা গেছে হাজার হাজার অসহায় শ্রমিক। অভিবাসীদের মত তাদেরও অধিকার বলে কিছু ছিলনা– বেতনও ছিল কোন মতে বেঁচে থাকার মত। এমন শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছিলো বিকল্প জীবিকার কাজের অভাবে। পরে এক পর্যায়ে মানব অধিকারের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হয়েছে ওই পোষাকের ব্যবহারকারী মানুষদের মধ্যে জনমত গড়ে ওঠার ফলে।

এই যে মানবাধিকারহীন কায়িক শ্রম দিতে বাধ্য হয়েও প্রায় বংশানুক্রমে দেশের মানুষের ওই প্রবাসে কাজে যাওয়াটির কাহিনী নথিপত্রে বেশ কিছু দেখা গেলেও তাদের পরিবারের ও বংশের মানুষের কাছ থেকে তা সরাসরি জানার মূল্য সমীক্ষার জন্য অনেক বেশি। ময়নার ওই গবেষণার জন্য তারা নিজস্ব অঞ্চলের কায়িক শ্রম চিত্রটি তুলে ধরেছে। সামগ্রিক গবেষণার অন্যরা যার যার

অঞ্চলের জন্য তা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও চিত্রটি কি সুখকর ছিল? না অসংখ্য মানুষের জন্য পরিস্থিতি সেই ময়নার সমীক্ষায় পাওয়া ফলাফলের মতই ছিল। দাসকে বেচাকেনা করার মত দাসপ্রথার দিন আগেই শেষ হয়ে গেলেও সেখানেও অনেক মানুষকে কার্যত অসহনীয় পরিবেশে শ্রম দিতে হয়েছে খুবই অল্প মজুরিতে। কৃষ্ণাঙ্গ এবং অভিবাসীদের জীবনেই ওই চরম দুর্ভাগ্য বেশি নেমে আসতো।

ময়নার সরাসরি সমীক্ষা যাদের নিয়ে তারা তার কাছের মানুষ। এমনকি তাদের মধ্যে বেশ ক'জনের সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে, যার ফলে তাদের আগের কয়েক প্রজন্মের মানুষ সম্পর্কেও ময়নার মোটামুটি পূর্বধারণাও রয়েছে। যেমন শান্তর খালাতো ভাই শামসুল আলম শান্তর চেয়ে বয়সে অনেক বড়, শামসুল চাচা হিসেবে ময়না-রাহিলের কাছে ছোটবেলা থেকে তিনি পরিচিত। প্রবীণ এই চাচা তাঁর নিজের বাবার এবং অন্যান্য পূর্ব প্রজন্মের আত্মীয়দের সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম জীবন দেখেছেন অথবা সে সম্পর্কে শুনে জানেন ও গল্প করেন, এ কথা ময়নার জানা রয়েছে। এবার তাঁর বাসায় গিয়ে ময়না কিছুটা আনুষ্ঠানিক আলাপই করলো এই সমীক্ষা উপলক্ষে।

ময়না: 'শামসুল চাচা, আপনার পরিবার ও গুরুজনরা বিদেশে কাজ করেছেন, তাঁদের গল্প নানা সময় আপনার মুখে শুনেছি। আজ আমাদের সমীক্ষার জন্যও সে সম্পর্কে কিছু বলেন।'

শামসুল: 'চট্টগ্রাম শহরের কাছে আমাদের এলাকার অধিকাংশ পুরুষ সদস্য এক সময় দেশের বাইরে কাজ করতো। আমার বাবার দাদারা ছিলেন তিন ভাই– তাঁর নিজ দাদা গিয়েছিলেন রেঙ্গুনে, বার্মায়। প্রথমে কিছুদিন একটি কারখানায় কাজ করার পর তিনি ওখানেই ছোটখাট ব্যবসার চেষ্টা করেন। দাদার দুই ছোট ভাই দু'জনেই গিয়েছিলেন ইরানের আবাদানে তেলের রিফাইনারির কাজে। ১৯১৮ সালে পুরো এলাকায় যে মহামারী স্পেনিশ ফ্লু দেখা দেয় তাতে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে তাঁদের একজন মারা যান। আর একজন রক্ষা পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। বার্মা থেকে বাবার দাদাও ফেরৎ আসেন।'

ময়না: 'বিদেশের মাটিতে মহামারীতে মৃত্যু হওয়া ছাড়া বিদেশে তাঁদের জীবন নিয়ে কী শুনেছেন?'

শামসুল: 'তাঁর দেশে আসার সময় পোষাকে-আষাকে বেশ জৌলুশে থাকতেন, সঙ্গে উপহারও আনতেন। কিন্তু বিদেশে তাঁদের কাজ খুব সহজ ছিলনা। একটা ব্যাপারে অবশ্য তাঁদের অবস্থা পরবর্তীদের থেকে ভিন্ন ছিল। ওখানে তাঁদের কারখানার মালিকরা ছিলেন বৃটিশ অথবা আমেরিকান। স্থানীয় মানুষদের অবস্থাও তখন খুব ভাল ছিলনা, তাদেরও বেশির ভাগ ছিল গরিব ও শ্রমজীবী– তাই বিদেশীদেরকে বন্ধুর মতই দেখতো। বেদুইন জীবনেও স্থানীয়দের অনেকে অভ্যস্ত ছিল। একেবারে সমান মর্যাদা দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতো। কিন্তু কাজটি ছিল খুবই কষ্টকর, মোটেই নিরাপদও নয়। তবুও দেশে চাষবাসের কাজের চেয়ে এটিই ভাল ও অর্থকরী মনে হয়েছিলো তাঁদের কাছে। ওখানে তাঁদের যে কিছুটা সামাজিক সম্মান ও মানসিক শান্তি ছিল সেটি বোঝা যায় তাঁদের কেউ কেউ ওখানে ইরানী মেয়ে বিয়ে করে পরে স্ত্রী-সন্তান সহ দেশে এসেছেন।

ময়না: 'এতো গেলো আপনার বাবার দাদার প্রজন্মের কথা। তার পরের প্রজন্মে দেশে বিদেশে কাজের কী পরিবর্তন ঘটলো।'

শামসুল: 'বাবার দাদার সময়ে আমাদের গ্রাম থেকে বার্মায় যত সব মানুষ গেছে আবাদানে বা বাহরায়েনে ওরকম বেশি সংখ্যায় যায়নি। বার্মার রেঙ্গুন, আকিয়াব অনেকটা নিজের দেশের মত ছিল। প্রচুর মানুষ প্রায় স্থায়ী ভাবে থাকতো– চাকরি যেমন করতো তেমনি চাকরি দিতোও; কারণ আমাদের দেশের বেশ কিছু ব্যবসায়ী, ঠিকাদার এমনি মানুষ ওখানে ছিলেন। ওখানে আমাদের কর্মীদের পাশাপাশি বর্মী শ্রমিকরাও কাজ করতো, তাদের খাটনি বরং আরো বেশি ছিল। ওরা ছিল একেবারেই কায়িক শ্রমে। কাজেই সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কঠিন পরিশ্রম করতো। কিন্তু এরপর মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের কাজের সুযোগ আরো বেড়েছে। আমার নিজের দাদার প্রজন্মে অনেকেই সেখানে গিয়েছেন। আগের বাহরায়েন ও আবাদানের সঙ্গে যোগ হয়েছিলো ওমান, দুবাই, আবুধাবি ইত্যাদি পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো। তেলের ও নির্মাণ ইত্যাদির কাজ সৃষ্টি হয়েছিলো ওখানে। এ সময় তেল-সমৃদ্ধি ওসব অঞ্চলে আমীর শাসিত জায়গাগুলোকে স্পর্শ করে এবং

স্থানীয় লোকদের অনেকেই মৎস্যজীবী অথবা বেদুইন জীবন ছেড়ে ধনী হবার স্বাদ পান।

এতে আমাদের আত্মীয়রা সহ নানা দেশের অভিবাসীরা তাদের কাছে এক রকম নিম্ন শ্রেণীর কর্মীতে পরিণত হয়। "মিসকিন" কথাটিই তখন থেকে বেশি বেশি উচ্চারিত হতে লাগলো। অথচ যতই ও দেশগুলো সমৃদ্ধ হলো আমাদের ওপর নির্ভরশীলতা তাদের যতই বাড়লো। কিন্তু প্রতিদানে আমাদের প্রবাসী শ্রমিকরা পেতে লাগলো আরো কঠিন শ্রমের কাজ– প্রধানত নির্মাণ শ্রমিক, খামার শ্রমিক হিসেবে। এতদিনে সৌদি আরব, কাতার এগুলোও এসে গেছে, বরং তারা পারস্য উপসাগরকে ছাড়িয়েও গেছে তেল সমৃদ্ধির দিক থেকে। সেখানেও আমাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি– বরং আরো অবনতি হয়েছে। কঠোর কায়িক শ্রম দিতেই যেন তাদের জন্ম।'

ময়না: 'শুরুতে ওখানকার যে বন্ধুসুলভ পরিবেশে ছিল সেটি পরে হারানোটি নিয়েই একটি বড় দুঃখের ব্যাপার ছিলো।'

শামসুল: 'হ্যাঁ, যদিও কিছু অর্থ উপার্জনের এই সুযোগ দেশে থাকা পরিবার সদস্যদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর জন্য বিদেশে যে ত্যাগ স্বীকার তাঁদেরকে করতে হয়েছে সেটি খুব করুণ। আমার দাদার ও তাঁর ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়দের মুখে সব সময় সেই করুণ কাহিনী শুনেছি। তাঁরা থাকতেন এক এক কামরায় অনেক জন গাদাগাদি করে। প্রচণ্ড রোদে খোলা জায়গায় কাজ করতেন– ছুটির ব্যবস্থা নেই বল্‌লেই চলে। অবশ্য আমাদের আত্মীয়দের মধ্যেই কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের ওসব দেশে অভিবাসীদের নিজেদেরই একটি বড় সমাজ গড়ে উঠেছিলো। ওখানে অনেকেরই সুযোগ ঘটেছিলো ছোটখাট ব্যবসা শুরু করার, কোন কোনটি স্থানীয়দেরও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে। ওসব ব্যবসায় কাজ মিলেছে আমাদের প্রবাসী কারো কারো। সে কাজে কায়িক শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ছিলো, মানবাধিকার লঙ্ঘনও।'

ময়না: 'তাঁদের মানসিক অবস্থাটি তখন সেখানে কী হতো?'

শামসুল: 'ওটিই ছিলো সব থেকে নাজুক বিষয়। পুরো ব্যাপারটিই হয়ে ওঠেছিলো বৈষম্য, অবহেলা, ও প্রাণঘাতী বিপদের খনি। মালিক ও

সুপারভাইজার যারা থাকতো তাদের হাতে অগাধ ক্ষমতা। কাজ মনের মত না হলে তারা শ্রমিকের প্রতি প্রায় দাসের মত আচরণ করতে পারতো, তাতে কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা চেয়ে কোন লাভ হতোনা। তাই প্রায়ই দুর্ঘটনা হতো এবং অবশ্যম্ভাবী ভাবে খবর হতো কতজন অভিবাসী শ্রমিক মারা গেছে; এমন ঘটকা হরদম ঘটছিলো। কীভাবে লাশ দেশে আনা যাবে, আদৌ আনা যাবে কিনা এ নিয়েই ঝড় উঠতো পরিবারে। এমন অবস্থায় মানুষের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে, তা তুমিই বিবেচনা করতে পারে। শুধু বাড়িতে পরিবারবর্গ আশা করে আছে, এই ভেবে তারা কাজ করে যেতো, দিন গুণতো এরপর কখন বাড়ি যাওয়ার সময় হবে।

দাদা ও তাঁর সহকর্মীরা বলাবলি করতেন আমাদের দেশের কিছু মানুষ লোভে পড়ে আদম পাচারকারীদের খপ্পরে পড়তো তাদের কথা। ইতোমধ্যে গৃহকর্মে মহিলাদের নিয়োগও বেশ চালু হয়েছিলো মধ্যপ্রাচ্যে ও আরো কিছু দূরদেশে, কারণ ওই শ্রমের চাহিদা বেশি বাড়ছিল অন্যগুলোর তুলনায়। কাজটি গৃহীকর্মীর হলেও কাজের একটানা শ্রম এবং দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হওয়াটি এই কাজেও বেশি বই কম ছিলনা।

তার চেয়েও করুণ কাহিনী শুনেছি দেশের অন্যান্য জায়গা বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের। পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে গরীব অসহায়রা আদম পাচারকারীদের মিষ্টি কথায় ভুলে যেতো বিদেশে ভাল কাজ ভালো বেতনের আশায়, তাদের অনেকে হারিয়ে যেতো একরকম অন্ধকার জগতে।'

ময়না: 'আধুনিক দাস প্রথার কথা সে কালের প্রসঙ্গে বার বার আসে- আমি এ সম্পর্কে নানা লেখা পড়েছি। আপনি তখনকার মানুষের কাছ থেকে কতটা জেনেছেন?'

শামসুল: 'যতটা শুনেছি মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র অভিবাসী শ্রমের দুটা স্তর ছিল। একটি যেটি আমাদের আত্মীয় স্বজনরা দেখেছেন সেটি ভয়াবহ হলেও সবার সামনে খোলামেলাই ছিল। অন্যটির খবর তাঁরা জানতেন কিন্তু দেখতেননা। নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রবাসে এর খবর প্রায়ই শুনতেন। ওটি একেবারেই দুনিয়া জোড়া আন্তর্জাতিক চক্রের বিষয়; এর কোন দেশীয় বা আঞ্চলিক সীমানাও ছিলনা, ওটি ওই এখনকার 'আধুনিক দাসপ্রথা'। ওই

আদম পাচারকারীদের মাধ্যমেই অসহায় মানুষ কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে সেখানে পৌঁছতো ও হারিয়ে যেতো। পাশের ভারত থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত কোথায় কে জানে। হারিয়ে যাওয়া মানে সব সময় গোপন জায়গায় যাওয়াও ছিলনা। অনেক সময় তারা প্রকাশ্যেই থাকতো, কিন্তু নানা চাপের কারণে ওরা ওই চক্রের যে কোন অন্যায় কাজে সহযোগিতা করতে বাধ্য হতেন। ওতে বেশ সুনামওয়ালা বড় বড় প্রতিষ্ঠানেরও হাত থাকতো– যেমন বড় ব্যাংক, পণ্য সরবরাহকারী কোম্পানী ইত্যাদি। তারা উচ্চ লাভের উদ্দেশ্যে জেনে শুনেই আধুনিক দাসপ্রথার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে, ওই চক্রকে গোপনে সহায়তা দিয়েছে। কাজেই ওটি ফুলে ফেঁপে উঠতে পেরেছে, যা ইচ্ছে তাই করেছে।

কার্যত দাসশ্রম ব্যবহার করে বলে পণ্য ও সেবা অল্প দামে পেয়েছে ওরা। অনেক সময় ভাল চাকরি দেবার কথা বলে অবৈধ ভাবে নিয়ে গিয়ে মহিলাদেরকে উচ্চ মূল্য পতিতা বৃত্তিতে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। এভাবে দাসপ্রথা এমন সময় ওরা বজায় রেখেছে যখন অনেকের কাছে এগুলো ইতিহাসের পুরানো কথা হিসেবে মনে হতো। এখানে শুরুতে বল প্রয়োগের বদলে লোভ দেখানোর কৌশলই অবলম্বন করা হয়েছে মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে– আমাদের দেশেও করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রচুর কথা হয়েছে, কিন্তু এর দমন হয়নি।'

ময়না: 'ওই সময় বিদেশে না গিয়ে যারা দেশে কাজ করে শ্রম দিয়ে কোন ভাবে জীবিকা নির্বাহ করতো তাঁদের সম্পর্কে আপনি কী জেনেছেন, যেমন আপনার ওরকম আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে।'

শামসুল: 'যাঁরা সেই চেষ্টা করেছেন তাঁদের পক্ষে খাওয়া পরা সহ জীবন ধারণ খুবই কষ্টকর ছিল। পারিবারিক ভাবে যাদের কিছু জায়গা জমি ছিল তাঁরা কিছুটা পেরেছেন, অন্যরা পারেননি। এর বড় কারণ হলো চাকরি পাওয়ার সুযোগ না থাকা এবং পেলেও তার মজুরি অত্যন্ত কম হওয়া। শেষ পর্যন্ত কায়িক শ্রমের অত্যাচার ছিল সর্বত্র– দেশে এবং বিদেশে। বিদেশে অন্তত অবহেলা-অপমান-অমানুষিক পরিশ্রমের পর মাসের শেষে কিছু টাকা পরিবারের কাছে পাঠাতে পারতো ওটিই ছিল সান্ত্বনা।'

পলিনেশিয়ান ভুক্তভোগী

এমনি ধরনের সমীক্ষা যে দুনিয়ার নানা জায়গায় হচ্ছে, এবং তার জন্য যে একটি সার্বিক গবেষণা দাঁড় করানো হয়েছে তার মূল কারণ বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক বিপ্লবের আগের ও পরের পরিস্থিতির তুলনা করা। অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সরাসরি মানুষের কায়িক অথবা গতানুগতিক শ্রমের বদলে মানুষের প্রজ্ঞাকে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহার করে এসেছে এই বিপ্লব। এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা কম হয়নি। এখন সময় এসেছে এ বিপ্লবের ভাল-মন্দ খতিয়ে দেখার। কারণ ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির উন্নয়ন ও প্রয়োগ এখন থেকে কোন্ দিকে যাবে সেটি চিন্তাশীল সবার মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন।

ময়না এই সমীক্ষার কাজটি নিয়েছে প্রধানত রাহিলের উৎসাহে, কারণ হাওয়াইতে রাহিলও এটি করছে ওখানকার আজকের মানুষ ও তাদের ইতিহাস নিয়ে। ময়নার মধ্যে মানুষের সুখদুঃখের ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জীতে যে মমত্ববোধ সে বরাবর লক্ষ্য করেছে তার মনে হয়েছে আপন সমাজের মধ্যে এ সমীক্ষা করে সেও আনন্দ পাবে। ওরা দু'জন যাদের নিয়ে কাজ করছে তাদের পরিস্থিতি আলাদা, ইতিহাস আলাদা। কিন্তু অর্থনৈতিক বিপ্লব তাদের উভয়কে একই ধারায় বদলে দিয়েছে। রাহিল নিজে হাওয়াই দ্বীপে অভিবাসী হিসেবে গিয়েও তাদের সমাজের সঙ্গে এতটাই একাত্ম হতে পেরেছে সে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের এক রকম বিশেষজ্ঞই হয়ে পড়েছে এখন। আর তার নিজেকে ওখানকার ইতিহাসের কোন ভার বহন করতে না হওয়াতে কিছুটা নিরপেক্ষভাবেই এর দিকে তাকাতে পারছে রাহিল।

হাওয়াইতেও সাধারণ মানুষের আমানুষিক কায়িক শ্রম বা দাস-প্রভু সম্পর্কের জীবন ছিল। পলিনেশিয়ার কোথায় নয়? অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাদা মানুষরা দ্বীপগুলোতে আসার আগে পর্যন্ত অবশ্য ওরা ওই রকম মানবতাবিহীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। তার আগে পর্যন্ত ওরা নিজ নিজ দ্বীপে বা দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের সমাজ রচনা করতে পেরেছে যার মধ্যে মোটামুটি একটি অর্থনৈতিক সাম্য বিরাজ করতো। হাসিখুশি স্বচ্ছল মানুষ হিসেবেই তাদের পরিচিতি ছিল। যদিও তাদের সমাজটি স্তরবিভক্ত ছিল তবুও ওই সব স্তরের পরস্পরের মধ্যে একটি মৌলিক সাম্য ছিল। সেটি ধসে পড়েছে ঔপনিবেশিকদের প্রভুর বেশে আসার পর থেকে– বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। হাওয়াইয়ের বেলায়

উপনিবেশটি স্থাপিত হয় আমেরিকান কোম্পানীগুলোর হাতে। সে সময় হাওয়াইকে আমেরিকানরা বলতো স্যান্ডউইচ আইল্যান্ড। আমেরিকান পুঁজিপতিদের কাছে নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার পর স্থানীয়দের জীবিকা কঠিন হয়ে পড়ে, ক্রমেই বেশি বেশি কঠিন কায়িক শ্রমের মাধ্যমে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষ করে আমেরিকান কোম্পানীতে সামুদ্রিক নানা কাজে শ্রম দানের বিকল্প কিছু ছিলনা। আমেরিকার পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলো থেকে যেসব তিমি শিকারি জাহাজ পৃথিবীর সব সমুদ্রে বিচরণ করতো সেখানকার সব থেকে কঠিন কাজগুলোতে তাদেরকে শ্রম দিতে যেতে হতো। ওই তিমির তেল থেকে সে সময় সর্বত্র বাতি জ্বলতো। তাছাড়া আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়ায় যে গোচারণ ও চামড়ার ব্যবসার ভিত্তিতে নতুন উন্নয়ন গড়ে উঠেছিলো তাতেও এই স্যান্ডউইচ আইল্যান্ডারদের কঠিন শ্রম ছাড়া চলতোনা। ওরা ছিল এক রকম বন্ডেড লেবার, দাসশ্রম দিয়ে যেতে হতো এক টানা বছরের পর বছর। সরাসরি জানার আগে রাহিলের সঙ্গে এই চিত্রের পরিচিতি ঘটেছিলো উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকান সাহিত্যে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে হাওয়াইয়ে উপনিবেশকারীদের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন হয়েছে। হাওয়াই আমেরিকার একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। সেখানকার বহুমাত্রিক বাসিন্দাদের সবারই একটি বহুজাতিক দেশের নাগরিক হবার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় আদিবাসীরা থেকে যাচ্ছে তাদের পূরানো কায়িক শ্রমকে ঘিরেই– মাছ ধরা, কৃষিশ্রম, খামারের কাজ ইত্যাদি। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির ফলে যে অর্থনৈতিক বিপ্লব হয়েছে তার ফলে অবশ্য হাওয়াই ও অন্য সব পলিনোশিয়ানদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া ঐতিহাসিক শ্রমসর্বস্ব জীবন থেকে বেরিয়ে আসার। এই সমীক্ষাটি চালাতে গিয়ে রাহিল হাওয়াই ও অন্যান্য পলিনেশিয়ান দ্বীপের একটি ঐতিহ্য থেকে বেশ সাহায্য পেয়েছে। এটি হলো নিজেদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে গল্প উপাখ্যান প্রজন্মের পর প্রজন্ম বলে যাওয়ার অভ্যাস। এতশত পরিবর্তন এমনকি জীবন পাল্টে দেয়া বিপ্লবের মধ্য দিয়েও এই অভ্যাস তারা হারিয়ে ফেলেনি। তাই ওরা সহজে আগের দিনের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য দিতে পেরেছে, ওই কঠিন কায়িক শ্রমের জীবন সম্পর্কেও।

হাওয়াই থেকে সরাসরি যা রাহিল পেরেছে, অন্যান্য পলিনেশিয়ান দেশগুলো থেকেও একই কাজ দূর থেকে সম্ভব হয়েছে। তারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও তাদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির একটি সাধারণ মিল রয়েছে। একই কথা বলা যায় তাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাস সম্পর্কেও। বিভিন্নটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঔপনেবেশিক প্রভুরা এসেছে নানা বেশে; কিন্তু ফলাফল মোটামুটি একই হয়েছে। অথচ প্রাচীনকাল থেকে তারা সবাই আমুদে, নাচ-গান করা, প্রকৃতিপ্রেমিক, এবং বন্ধুসুলভ বলে বিখ্যাত ছিল। এই দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ফিজি, তাহিতি, টঙ্গা, নিউজিল্যান্ড থেকে সলোমন আইল্যান্ড পর্যন্ত। ওই প্রত্যেকটির রয়েছে নিজস্ব দীর্ঘ ঐতিহ্য। পরস্পর থেকে বহু হাজার মাইল সমুদ্র দিয়ে আলাদা করা থাকলেও মূলত একই গোষ্ঠি থেকে এসেছে বলে অনেক বিষয়ে তাদের মধ্যে মিল আছে। আর উপনিবেশ স্থাপনকারীরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে বিভিন্ন কৌশল নিলেও শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দেরকে দাসতুল্য করে তোলাটাই ছিল উদ্দেশ্য। নিউজিল্যান্ডে ও ফিজিতে ইংরেজ, তাহিতিতে ফরাসী, সলোমন আইল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ানরা তাই করার চেষ্টা করেছে। একই ভাবে ওখানে অন্যান্য দ্বীপ-দেশগুলোতেও। কোথাও কোথাও শাসকরা অন্য যে অভিবাসীদেরকে নিয়ে এসেছে (যেমন ফিজিতে ভারতীয়) তাদের কারণেও ওরা অসম্ভব অর্থনৈতিক, সামাজিক চাপ ও কায়িক শ্রম নির্ভর জীবনে পড়ে গিয়েছে। একই সময়ে অবশ্য অতি সরল ও বিনোদন-প্রিয় স্বভাবের মানুষ ওরা এমন একটি রোমান্টিক ধারণা তাদের স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক জগতে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। এটি প্রকৃত অবস্থাকে আড়াল করেছে এবং সেখানে মানবাধিকারের অবক্ষয় ঘটিয়েছে।

তবে কিছু কিছু দিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক অনগ্রসর দেশের তুলনায় পলিনেশিয়ানরা সৌভাগ্যবান বলতে হবে। যদ্দূর জানা যায় উপনিবেশ স্থাপনকারী ইউরোপীয়-আমেরিকান-অস্ট্রেলিয়ানরা আসার আগে পর্যন্ত কোথাও তাদের এতটা সামাজিক বৈষম্য, কায়িক শ্রম নির্ভর কার্যত দাসত্বের অবস্থা ছিলনা। অন্যদিকে কয়েকশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের পর বেশ কিছুটা উদারপন্থী নীতিতে ওখানকার প্রাক্তন প্রভু এবং এখন স্বাধীন স্থানীয়রা আসতে পেরেছে। এর ফলে এই প্রায় প্রত্যেকটি দেশে স্থানীয় আদিবাসীরা যথেষ্ট গুরুত্ব

ও মর্যাদা দাবি করতে পেরেছে। যেখানে শাসন ক্ষমতায় এখনো ইউরোপীয়রা রয়ে গেছে সেখানেও তারা ওই মর্যাদা ক্রমে বাড়িয়ে নিতে পেরেছে, যেমন নিউজিল্যান্ডে মাওরিরা। পলিনেশিয়ার বাইরে অন্য অনেক দেশে ওসময় বাহ্যিক ভাবে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও দেশের ভেতরের প্রভু-দাস প্রথা নিজেদের নানা গোষ্ঠির মধ্যেই আগের মত থেকে গিয়েছিলো আরো বহু কাল। অবশেষে ইন্টেলিজেন্ট অর্থনৈতিক বিপ্লব তাদেরকে রক্ষা করেছে।

বাকি দুনিয়ার সমীক্ষা

রাহিল এই সমীক্ষার এক জায়গায় পলিনেশিয়ান অঞ্চলের প্রাচীন দিনগুলোর সঙ্গে পৃথিবীর বাকি বড় বড় অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসটি তুলনা করে দেখাতে চেয়েছে। এটি করার জন্য সে অন্যান্য অঞ্চলের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনের আয়োজন করেছে– যাদের সঙ্গে ইতিহাস গবেষণায় আগে থেকে তার পরিচয় ছিল। তাদের মধ্যে আছে ভারতের শ্রী রাধা, গ্রীসের ইউক্লিড, মেক্সিকোর মারিয়া, তানজানিয়ার মাকেলা। এমনি একটি কথোপকথনে ওরা ক'জন:

রাহিল: 'আলাপের উদ্দেশ্য হলো আমাদের ফোরামে যাঁরা নিজের এলাকার প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে বিশ্লেষণমূলক চিন্তা করেন তাঁদের মধ্যে মত বিনিময়। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির কল্যাণে বিশ্বের সর্বত্র যে অর্থনৈতিক বিপ্লব এসেছে তার আগে-পরের অবস্থা নিয়ে সমীক্ষাটি চালাতে গিয়েই এর প্রয়োজন বোধ করছি। আমি মূলত পলিনেশিয়ানদের ওপর সমীক্ষাটি চালাচ্ছি। কিন্তু এর জন্য স্থান-কালে আরো বিস্তৃত রূপে বিশ্ব-ছবিটাও পাওয়া দরকার। আমি জানি আপনাদের প্রত্যেকে ইতিহাসে আত্মনিবেদিত– সব রকম ইতিহাসে। সেজন্যই এ নিয়ে এক সঙ্গে আলাপ করা দরকার ছিল। অতীতের দিকে চলে গেলে গ্রীক-রোমানদের কথা না এনে উপায় নেই। সেটি শুধু ইউরোপকে প্রভাবিত করেনি, দুনিয়ার একটি বড় অংশকে করেছে, প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে আমার পূর্বপুরুষদেরকেও করেছে। কিন্তু আজকের গ্রীসে বসে ইউক্লিডের কাছে একে কেমন মনে হয়?

ইউক্লিড: 'জ্ঞান চর্চার কথা যদি বলি তা হলে তো আমরা আমাদের অতীতের জন্য দারুণ গর্বিত। সে প্রসঙ্গে যে ছবি ফুটে ওঠে তাতে আমরা শুধু স্বাধীন মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন দার্শনিকদেরকে দেখি ওই প্রাচীন গ্রীসের, যাদের থেকে পরবর্তী দু-তিন হাজার বছর পুরো দুনিয়া শিখেছে। কিন্তু এই দার্শনিকরা সমাজের সব থেকে সুবিধাভোগী রাজা-রাজড়া আর অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকতেন, অতি-সংস্কৃত নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতেন। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কঠিন শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করতো। তাদের এক অংশ যারা নাগরিক ছিল তারা অন্তত কিছু মানবাধিকার ভোগ করতো। বাকিরা ছিল দাস, অধিকাংশ বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের যুদ্ধবন্দী হিসেবে সংগৃহীত। তাদের মধ্যে নানা কুশলতার এমনকি প্রতিভার মানুষ ছিল। কিন্তু সে মর্যাদা তাদেরকে কখনো দেয়া হতোনা। দাস হিসেবে তাদের ভাগ্য মালিকরাই ঠিক করতো। সব থেকে অমানুষিক কায়িক শ্রম তাদেরকেই দিতে হতো। এমনকি মালিক ও অভিজাত নাগরিকদের বিনোদনের জন্য গ্লাডিয়েটর হিসেবে যুদ্ধ করে জীবনও দিতে হতো। কেউ বলতে পারে ওই শেষের ব্যাপারগুলো গ্রীকরা নয়, রোমানরা প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু ওই সময় গ্রীক ও রোমান সমাজ একাকার হয়ে গিয়েছিলো– ওটিকে বলা যায় গ্রীক ইতিহাসেরই রোমান অধ্যায়। তাছাড়া এর আগের গ্রীক অধ্যায়ও খুব যে ভিন্ন রকম ছিল তা বলা যাবেনা। গ্রীক-রোমানদের যত স্থাপনা কীর্তি আমরা দেখি– রাস্তা, পানি সরবরাহের আকুয়াডাক্ট, পাবলিক স্থানাগার, এম্ফিথিয়েটার, মন্দির সব কিন্তু ব্যাপক ভাবে ওই দাস কায়িক শ্রমেরই ফসল।'

রাহিল: 'গ্রীক-রোমান সাম্রাজ্যের এক সময় ইতি ঘটেছে। গ্রীস সহ ইউরোপে এক সময় সাম্রাজ্যের ব্যাপারটি নামে মাত্র অস্তিত্বে চলে আসে; ক্যাথোলিক, গ্রীক-অর্থোডক্স ইত্যাদি ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকলেও। তার বদলে বরং ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রের হাত লম্বা হয়– অনেকগুলো নগর রাষ্ট্রের অনেকগুলো হাত। তাছাড়া অনেকটা জাতি-রাষ্ট্রের মত কিছু বড় রাষ্ট্রও ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড। তখন তো ওভাবে দাসের ওপর নির্ভর করার সুযোগ আর ছিলনা, তখন কী হতো ওই মধ্যযুগ যাকে বলি আমরা সে সময়?'

ইউক্লিড: 'তখনকার মত প্রাচীন দাস প্রথাটি নিজেদের মধ্যে কমেছে, যুদ্ধের মাধ্যমে দাস সংগ্রহের রীতিও। কিন্তু গরীব মানুষের ভাগ্যের কোন উন্নতি

হয়নি। ওরা এবার আটকে গেছে সামন্ত প্রথায়– ভূমিদাস রূপে। তাদেরকে দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়না বটে, পরিবার সহ অন্যত্র পাঠিয়েও দেয়া যায়না; কিন্তু তারা ভূ-স্বামীদের জমির সঙ্গে বাঁধা থাকে। দেখতে মনে হয় ক্ষুদ্র কৃষিজীবী, কিন্তু জীবনটি ষোল আনাই পরাধীন। বংশানুক্রমে এই জমি চাষ করে ফসলের সিংহভাগ দিয়ে দিতে হয় মালিককে। তাছাড়া মালিকের প্রয়োজনে অন্যান্য খাটাখাটনি করতে হয়, এমনকি যুদ্ধও করতে হয়। কাজেই সেই অমানুষিক শ্রম, সেই, স্বাধীনতাহীন মানবাধিকারহীন জীবন– তার ওপরেই অর্থনীতি ও রাষ্ট্র নির্ভর করে। একেবারে আধুনিক কালের কাছে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যটি যে সব অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে সেখানে মালিকরা ভূমি ছেড়ে ব্যবসার দিকে মন দেয়াতে সামন্ত প্রথা আলগা হয়েছে। মানুষ কিছুটা স্বাধীনভাবে নিজের পেশা বেছে নিতে পেরেছে। কিন্তু তাও অধিকাংশের পেশা প্রচণ্ড কায়িক শ্রম দিয়ে চলতো, অল্প কিছু সৌভাগ্যবান কামার-কুমার-ছুতার কুশলী কর্মী ছাড়া।'

রাহিল: 'ইউক্লিডের কথা শুনতে শুনতে তারই প্রায় সমান্তরালে চলা ভারতবর্ষের ইতিহাস মনে পড়ে গেলো, যার একটি প্রত্যন্ত জায়গায় সেদিন ছিল আমার নিজের জন্মস্থানটি। ওই একাধারে দার্শনিক ও যুদ্ধবাজ গ্রীসের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তখন ঘটেছিল তার ওই উভয় বৈশিষ্টের সূত্রেই, রীতিমত গ্রীক রাজ্য গড়ে ওঠেছিলো ভারতের পশ্চিম সীমানায়। আমরা ওদের থেকে কী পেলাম, তারা আমাদের থেকে কী গেলো? শ্রীরাধা ভাল বলতে পারবেন ভারত কতটুকু যোগবিয়োগ করতে পারলো তার একেবারে প্রাচীনতম ঐতিহ্যের পর থেকে।'

শ্রীরাধা: 'গ্রীক-রোমান ইতিহাসটি ওদের ধর্মীয় বই, গ্রীক মহাকাব্য ইত্যাদির সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলে, ওসব উপাখ্যান দিয়ে প্রভাবিত না হয়েও তখনকার পেশাদার ইতিহাসবিদরাই লিখে যেতে পেরেছেন। ভারতে তা হয়নি। বেদ, পুরান, মনুসংহিতা ইত্যাদি এক সময় শ্রুতি-নির্ভর ছিল, পরে লিখিত আকারে এসেছে। প্রাচীন ইতিহাস আমাদেরকে এগুলো থেকেই জানতে হয়েছে, আর মহাভারত রামায়নের মত মহাকাব্য থেকে। দক্ষিণ ভারতের একজন ইতিহাস-উৎসাহী মানুষ হিসেবে আমি লক্ষ্য করেছি প্রাচীন সংস্কৃত ও তামিল সাহিত্যের ওপর ইতিহাস কতটা নির্ভর করেছে। ওতে উত্তর ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্য ও দক্ষিণ ভারতের চালুক্য ও চোল সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি ধারাবাহিক ভাবে লক্ষ্য

করেছি। উপরিকাঠামোর দিক থেকে গৌরবময় অনেক কিছু ঘটেছে। যেমন দক্ষিণের জাহাজগুলো ভারতের সীমা অতিক্রম করে ভারতের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে নিয়ে যাওয়াটির কথা বলতে পারি– বার্মা, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সিংহল সর্বত্র। কিন্তু সে তো উপরিকাঠামো– তাও কিছুটা দুর্বল ভাবে সে সব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তার নিচেই দেশে যে ছিল জাতিভেদের গভীর ক্ষত সেটিতে ভারত বোধ হয় অনন্য। ওর সঙ্গে মানবিক মর্যাদার ভেদের বিষয় যেমন ছিল অর্থনীতির অসম্ভব বৈষম্যও ছিল, যার থেকে পুরোপুরি মুক্তি এই বর্তমান শতাব্দীর শুরুতেও মেলেনি। ওতে একেবারে নিচের দিকে যারা ছিলো তাদের পুরো জীবনে অসহ্য অপমানকর কায়িক শ্রমই বরাদ্দ ছিলো, যেই পরিস্থিতি থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্মেও মুক্তি মিলতোনা।

রাহিল: 'শেষ পর্যন্ত ওই জাতিভেদে লাভবান কারা হয়েছে?'

শ্রীরাধা: 'ইউক্লিডের মুখে ইউরোপের কথা যা শুনলাম সেরকম পৃথিবীর অন্যত্রও দাসপ্রথা, সামন্তপ্রথা সবই ছিল, কিন্তু এই জাতিভেদ জিনিসটি ভারতবর্ষের অনন্য আবিষ্কার। ওই দাস, ভূমিদাস সব ভারতেও ছিল বিশ্রিভাবে, জাতিভেদটি ছিল বাড়তি। সবই হয়েছে রাজন্য, পুরোহিত, ভূস্বামী ও যুদ্ধ-নেতাদের স্বার্থে। নিম্নতমদের যে কোন কায়িক শ্রমের ফসল সাইফনের মত শুষে নিতো ওরা। ওই সুবিধাভোগীদের সংখ্যা ছিল সীমিত, তারা ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীদের বাদ দিলে বাকি সব জাতকে কোন না কোন ভাবে ওই কায়িক শ্রমেই জীবন যাপন করতে হতো নানা পেশায়। তারা আবার সন্তুষ্ট থাকতো এই ভেবে যে একেবারে নিচের দলিতদের মত অচ্ছ্যুৎ তো তারা নয়।'

রাহিল: 'অনেক প্রাচীন কাল ছেড়ে যদি শুধু গত পাঁচ শো বছরের কথা বলি তা হলে সব থেকে করুণ ঘটনাগুলো বোধ হয় ঘটেছে আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চল ও পূর্ব অঞ্চলে। নিজের দেশের ভেতরে ওখানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিষ্পেষিত অবস্থায় ছিল, ওই বাকি দেশগুলোর মত। কিন্তু এরাই এই সময়ে এসে বিশ্ব দাস ব্যবসার মূল শিকারে পরিণত হয়েছে। ফলে এখানকার একটি বড় অংশ নরনারী জনসংখ্যা কার্যত নানা ভিন দেশে পণ্যে পরিণত হয়ে পড়েছিলো। এরপর একেবারে সম্প্রতিও ওখানে থেকে গিয়েছিলো নব্য উপনিবেশেবাদ ও

নব্য দাস ব্যবস্থা। ওই অভিশাপ কখনো একেবারে চলে গিয়েছিলো বলা যাবেনা। এ ব্যাপারে মেকলা আমাদের থেকে অনেক বেশি জানেন, কারণ তিনি তানজানিয়ার একজন সম্মানিত ইতিহাস গবেষক।'

মেকলাঃ 'ইউরোপীয় দাস ব্যবসায়ীরা আসার আগে থেকেই কিন্তু এখানে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ছিলো। মধ্য যুগে আমাদের পূর্ব আফ্রিকায় গড়ে ওঠেছিলো বেশ কিছু সুলতানের রাজ্য ভারত মহাসাগরের ওপারের আরবদের দ্বারা। আরব বাণিজ্যের সমৃদ্ধি সমুদ্রের দুই পারেই যেতো, তবে সে সমৃদ্ধির একটি বড় কারণ ছিল দাস ব্যবসা। সাধারণ মানুষকে ভীষণ ভাবে শোষণ করে ও অবর্ণনীয় কায়িক শ্রমে রেখে ওই সমৃদ্ধির ভিত রচিত হয়েছিলো, তারপর ওদেরকে পণ্যের মত বিক্রি করে গড়ে ওঠেছে বাকিটা।

রাহিলঃ 'আপনি পূর্ব আফ্রিকার কথা বল্‌ছেন। কিন্তু বিশ্ব দাস ব্যবসার সব থেকে জঘন্য ছবিটি তো প্রধানত পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকেই ঘটেছিলো'।

মেকলাঃ 'সেটি আরো শোচনীয়, তবে তার ইতিহাস পূর্ব আফ্রিকার থেকে আলাদা কিছু নয়। আসলে সেই মধ্য যুগেই উভয় ক্ষেত্রে আফ্রিকার নিজের সমাজ বিন্যাসের ভেতরের দাসপ্রথা, দাস সৃষ্টি, দাস ব্যবসা সবই ছিলো। উচ্চ শ্রেণীর সমৃদ্ধির খাতিরেই ওগুলো ছিল। পশ্চিম আফ্রিকার নাম করা সমৃদ্ধ যে সব রাজ্যের কথা পরবর্তীকালে আমরা আফ্রিকানরা বুক ফুলিয়ে বলেছি– আজকের নাইজেরিয়া, ঘানা, গাম্বিয়া, সেনেগাল, মালি, কঙ্গোর পূর্বসূরী বিখ্যাত রাজ্য-সাম্রাজ্যগুলো, সেগুলো ওভাবেই গড়ে ওঠেছিলো। এর অনেকগুলোর ওপর আরবী প্রভাব থাকলেও সেই বিদেশীরা স্থানীয় দাস ব্যবসার সুযোগ নিয়েই চরম নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পেরেছিলো।

শাসন ব্যবস্থাই এমন ছিল যে দাস সৃষ্টি হতো পদে পদে। অপরাধীর শাস্তি দেয়া হতো তাকে দাসে পরিণত করে, বিক্রি করে দিয়ে। অবাধ্য প্রজাকে শায়েস্তা করা যাচ্ছেনা তাকে দাস ঘোষণা করে দাও, হতদরিদ্র মানুষ ঋণ শোধ করতে পারছেনা তার পুরো পরিবারকে দাস হিসেবে নিলামে ওঠাও। কোন করদ রাজ্য কথা না শুনলে সাধারণ প্রতিকার ছিল ওটি আক্রমণ করে নাগরিকদেরকে যুদ্ধবন্দী ও দাস হিসেবে এনে বিক্রি করে দেয়া। পরবর্তী কালে ভাস্কো দা গামা, কলম্বাস প্রমুখ বিশ্ব-অভিযাত্রীর প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল পর্তুগাল,

স্পেন থেকে এসে আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল জরিপ করা যাতে ওই পথে ভারত, পশ্চিমের অজানা মহাদেশ ইত্যাদিতে যাওয়া যায়। পাশাপাশি তাঁরা আরো একটি কাজ করেছিলেন– স্থানীয় দাস ব্যবসাতে যোগ দিয়ে ইউরোপে দাস সরবরাহ করা এখান থেকে। অন্যদিকে আরব ও স্থানীয় দাস ব্যবসায়ীরা দাসের মূল উৎসগুলোতে কাজ করেছে। তখন চাহিদা সীমিত ছিল, ব্যবসা ছোট ছিল। কিন্তু তারপর আমেরিকা আবিষ্কারের পর নতুন মহাদেশকে ইউরোপীয় অভিবাসনের জন্য তৈরি করতে চাহিদার বন্যা সৃষ্টি হলো। তারপরের ঘটনা তো আপনারা সবাই জানেন। ওই দাস-জাহাজে কেমন ভাবে শুইয়ে বেঁধে রাখলে জায়গা কম লাগবে, যাত্রাপথে মৃত্যুতে পণ্যরূপী দাসকে হারানো কম হবে সে সবের ওপর তখন রীতিমত গবেষণা করা হতো, পরে আমরা জানতে পেরেছি।'

রাহিল: 'আফ্রিকা কি দাস ব্যবসার এই অভিঘাত থেকে কখনো বের হতে পেরেছিলো, যেমন উপনিবেশবাদের অবসানে স্বাধীনতা পাওয়ার পর?'

মেকলা: 'না, আফ্রিকায় তা হয়নি। উপনিবেশবাদ চলে গেলেও এই ক্ষত সারেনি। বাহ্যিক ভাবে উপনিবেশবাদ শেষ হলেও এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নব্য উপনিবেশবাদ সৃষ্টি হয়েছে দেশগুলোর গোষ্ঠিগত দ্বন্ধ, অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ, সরকারগুলোর দুর্নীতি, ও সুশাসন দেয়ার অক্ষমতা ইত্যাদিকে পুঁজি করে। তাছাড়া ওখানে যে অভাবনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে গ্রাস করাটি অতীতের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর উদ্দেশ্য ছিল– তামা, হীরা, সোনা, বনজ সম্পদ, এসবের লোভ সামলানো কঠিন ছিল। উপনিবেশ স্থাপনকারীরা চলে গিয়েও ওই লোভে অন্য রূপে আবার ফিরে এসে কলকাঠি নেড়েছে, অর্থনীতি দখল করেছে। কিছুই দেশগুলোকে বিন্দুমাত্র উপকৃত করেনি। আমার নিজের দেশে কোন কালে সঠিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠলোনা। আপনারা অন্যত্র যখন শত শত বছর ধরে হাল বলদ বা ঘোড়া দিয়ে জমি কর্ষণ করেছেন, তখন আমরা শাবল কোদাল দ্বারা অনেক বেশি পরিশ্রম করে ফসল ফলাবার চেষ্টা করেছি। এখানে অনেক রাষ্ট্র দীর্ঘ দিন ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে ছিলো– যেমন সোমালিয়ার কথা কে না জানে। এখন অবশ্য এসব অতীত হয়ে গেছে, সবাই নতুন অর্থনীতির ছায়ায় থেকে এগিয়ে যেতে পারছে।'

রাহিলঃ মারিয়া, আপনি যে অঞ্চলের ইতিহাস চর্চা করেন তার সঙ্গে বাকি দুনিয়ার সম্পর্ক অতীতে কখনো ছিলনা, কলম্বাসের মাধ্যমেই প্রথম ক্ষীণ যোগাযোগ। কিন্তু দুনিয়ার বাকি মানুষও তখন দেখতে পেরেছে এখানকার নানা সমৃদ্ধ দেশ, সমৃদ্ধ সভ্যতার দৃশ্য। এতক্ষণ অন্য জগৎ সম্পর্কে যা শুনলেন তার থেকে কি আপনার ওই জগৎ রক্ষা পেয়েছে?

মারিয়াঃ আমি মেক্সিকোর মানুষ। কিন্তু আমি যা বলছি তা পুরো ল্যাটিন আমেরিকার জন্য প্রযোজ্য, ক্যারিবিয়ান ইত্যাদিরও। ইউরোপীয়রা আসার আগের অবস্থা আমরা খুব ভাল জানিনা- কারণ এমন কোন লিপি ও তাতে লিখিত দলিল সেখান থেকে পাওয়া যায়নি। বরং পরবর্তী কালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকেই প্রাচীন কালে ওখানে মানুষ কতটা ভাল ছিলো তা আন্দাজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সত্যিকার ইতিহাস পাওয়া যায় বিজয়ীর বেশে ইউরোপীয়রা আসার পর থেকে। এসে তারা যা দেখেছে, স্থানীয়দের থেকে যে কাহিনী তারা শুনেছে, তার ভিত্তিতে সমসাময়িক এবং কিছু পুরানো দিনের ইতিহাসও রচিত হয়েছে। আরো প্রাচীন যুগের ইতিহাস অবশ্য গবেষণায় এখন বের হচ্ছে।'

রাহিলঃ 'তার ভিত্তিতে অন্য মহাদেশগুলোর তুলনায় আপনার মহাদেশে মানুষের অবস্থা কী রকম ছিল মনে হয়?'

মারিয়াঃ 'উত্তর আমেরিকায় পুরানো প্রত্নতত্ত্ব তেমন বড় রাজ্য, স্থাপনা ইত্যাদির খবর দেয়না। কিন্তু যেটুকু দেয় তাতে বোঝা যায় এখানে মানুষে মানুষে সাম্যের ভাবটি বেশি ছিল- যা পরে ইউরোপীয়রা এসেও দেখেছে। কিন্তু মেক্সিকোর কথা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কথা আলাদা। এখানে বড় বড় নগর, বড় বড় স্থাপনা, মন্দির, পিরামিড, মূর্তি এসব দেখে আমরা মুগ্ধ হই। এগুলো আজটেক, ওলমেক, জাপোটেক, মায়া, ইন্‌কা নানা সাম্রাজ্যের আমলের, নানা জায়গায়। পরবর্তী আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব এদের পেছনের কাহিনী কিছু কিছু উদ্ঘাটন করতে পেরেছে। এই যে জগদ্দল পাথরের সব স্থাপনা, কখনো কখনো অত্যন্ত দুরূহ স্থানে তৈরি, তার শ্রমভার কাকে নিতে হয়েছে? অবাক লাগে এই শেষ পর্যন্তও এসব অনেক সভ্যতা এমনকি ভারবাহী পশু পর্যন্ত ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে জানতোনা, কষ্ট লাঘব করার জন্য চাকার যানবাহন পর্যন্ত প্রচলন ছিলনা। অর্থাৎ মানুষকে নিজের কঠোর শ্রমে সব করতে হয়েছে।

সেদিক থেকে কায়িক শ্রমের পুরানো দুনিয়ার সঙ্গে এই নতুন দুনিয়ার তফাৎ আর কোথায়?'

রাহিল: 'পরে যখন ইউরোপীয়রা এসে এখানে বিজয় লাভ করেছে তারপর সাধারণ মানুষের ভাগ্য কোন্ দিকে গেল?'

মারিয়া: 'ইউরোপীয় "কনকিস্টুইডোর" বিজয়ীরা এসে যা দেখেছে যা লিখেছে তা হুবহু বিশ্বাস করা না গেলেও সব পক্ষের কথা পড়ে এবং অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি ইউরোপীয়রা আসার আগে যেমন দুঃসহ ছিল জীবন, পরেও তাই ছিল। যেমন মেক্সিকোর আজটেক সভ্যতার কথা যদি বলি আমাদের মেক্সিকো সিটির জায়গাতেই তাদের রাজধানী ছিল। মেক্সিকোর বিরাট অঞ্চল জুড়ে তারা জোর করে তাদের কেন্দ্রীয় শাসন চাপিয়ে দিয়েছিলো। ভাগ্যন্বেষী স্পেনিশ যোদ্ধা কোর্টেজ ১৫ শতকের শুরুতে অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে এই সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে পেরেছিলেন স্থানীয় কাচিক বা সর্দারদের সাহায্য নিয়ে। তারা আজটেক নিষ্ঠুরতার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোর্টেজের সহায়তা পাবে ভেবেছিলো। কিন্তু কোর্টেজের সৈন্যরা কী করেছে? তাদের একজন বার্নল ডিয়াজ চমৎকার বইয়ে অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রেখে গেছেন। লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান কিন্তু বিজয়ী সেনা হিসেবে তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ দেখা যায় কাচিকদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে। ওদের শ্রমে, সম্পত্তিতে, এমনকি তাদের নারীতে নিজেদের অধিকার থাকাকে খুব স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছেন তিনি। খৃষ্টীয় নীতি প্রচারের দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে দেখেছেন ওদের ওপর আক্রমণকে। কোর্টেজের কিছু সৈন্য বিদ্রোহ করেছে, তার কারণ হিসেবে বার্নল আজটেক সম্রাট মন্টেজুমাকে পরাজিত করার পর লুট করা সোনা ও নারীর বন্টনে অসমতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাপারে নিজেকেও বঞ্চিত দাবি করেছেন।'

রাহিল: 'সম্রাট মন্টেজুমা তাঁর সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে কী আচরণ করতেন? এর অনেক বর্ণনা পরবর্তী মেক্সিকানরা রটনা বলে দাবি করেছেন। কতটা সত্যি, কতটা রটনা?'

মারিয়া: 'এই বিতর্ক সব থেকে বেশি হয়েছে মন্দিরে মানুষ বলি দেবার রীতির প্রসঙ্গে। সম্রাট যে প্রজাদের জীবনকে বিন্দুমাত্র মুল্য দিতেননা তা বোঝা যায়

নানা কুসংস্কার অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি এখানে ওখানে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে বলি দেবার উপযুক্ত তরুণ-তরুণীদের ধরে নিয়ে আসতেন ও সুউচ্চ পিরামিডের ওপর মন্দিরে দেবতার কাছে বলি দিতেন। এ নিয়ে লেখক বার্নল সহ ইউরোপীয় বহু লেখকের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য রয়েছে, যদিও পরে এসব সাক্ষ্য নিয়ে বিতর্কও উঠেছে। কিন্তু ১৯৯০ দশকের পর থেকে উন্নত প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা শুধু তখনকার নয় এরও হাজার হাজার বছর আগের বলি দেয়ার জন্য মানুষ হত্যার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব ছাড়া এটি কখনো সম্ভব হতোনা।'

রাহিল: 'পরের উপনিবেশ স্থাপনকারীরা কী করেছে?'

মারিয়া: 'সে তো অন্যত্র সব জায়গার মত একই কাহিনী। যেটুকু সমৃদ্ধি ছিল তা লুট করা হয়েছে স্পেনে পর্তুগালে সম্পদ চালান দেয়ার জন্য। দাসত্বের শেকলের চাপে আদিবাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টাই প্রথমে নেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য জায়গার সঙ্গে পার্থক্য হলো এ চেষ্টা পুরাপুরি সফল হয়নি। বরং আদিবাসীদের সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনকারীদের বড় অংশটি জেনেটিক ভাবে মিশ্রিত হয়ে একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করেছে যারা এখানে শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্ব লাভ করেছে। তারাই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়েছেন। আদিবাসীদের সঙ্গে মিলে তারাও কায়িক শ্রমের জীবন যাপন করেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সে রকম জীবন চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দরিদ্ররা আধুনিক দাসপ্রথা থেকে রেহাই পায়নি– ওটি আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রের বিষয়, ল্যাটিন আমেরিকা কখনো তার বাইরে ছিলনা।'

রাহিল: 'কায়িক শ্রম কাকে বলে, অমানুষিক কায়িক শ্রম মানুষের জীবনকে যে কোন্ পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে তা সারা দুনিয়ার মানুষ মর্মে মর্মে চিরকাল অনুভব করেছে। আমাদের বন্ধুরা যে চিত্র তুলে ধরলেন তাতে একটির সঙ্গে অন্যটির তেমন কোন অমিল দেখছিনা। প্রাচীন সময় থেকে শুরু করে এখনকার কারো কারো এক প্রজন্ম আগের মানুষের স্মৃতিতে থাকা পরিস্থিতি বলে দিচ্ছে শুধু বেঁচে থাকা ও জীবন ধারণের তাগিদে অসংখ্য মানুষকে কী ভাবে সারাটা জীবন প্রতিটি দিন গতর খেটে যেতে হয়েছে। পুরোটা ইতিহাস যেন দেখিয়ে দিচ্ছিলো এই মানুষদের জন্মই হয়েছে এমনি ধারার কাজ করে যাবার জন্য, বলতে গেলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।'

একেবারে আধুনিক মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা যে সব দেশে হয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হতো, সেখানেও অসংখ্য মানুষকে শেষ অবধি এমন দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে তাদের কলে কারখানায়। বাইরে যে হাসিখুশি কর্ম-উদ্দীপনায় উজ্জীবিত কর্মীর কারখানার কথা বলা হতো তা যে পুরো সত্য ছিলনা তা বোঝা যায় ওই আগের অর্থনীতির শেষ সময়ও যখন দেখি যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও মীট প্যাকিং ফ্যাক্টরিগুলোতে কি নারকীয় পরিবেশে অভিবাসী মানুষকে দিনের পর দিন কাজ করতে হয়েছে তা দেখে। ওই পুঁজিবাদী প্রচলিত অর্থনীতির দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষের সেই হতভাগ্য জীবন একটানা চলে আসছিলো প্রাচীন কাল থেকে শেষ কাল পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত ভাবে। হ্যাঁ, ধরন পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করলে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের জন্য সে পরিবর্তন তুচ্ছ। পরিবর্তন অবশেষে এসেছে, সবার জন্য এসেছে। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি ব্যবহার করে যে অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটেছে তার মাধ্যমেই অবশেষে মানুষ অর্থহীন কায়িক শ্রম থেকে মুক্তি পেয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র যে অসংখ্য মানুষ ঘুরেফিরে অন্যের দাসত্বের মত অবস্থায় থেকে শ্রম দিয়েছে, এই প্রথম সেখান থেকে তার মুক্তি ঘটলো।'

মুক্তির আগের বেদনা

ময়না চট্টগ্রামে বসে আর রাহিল হাওয়াইতে বসে যা করছিলো তা দুই ভাইবোনের প্রায়শ একত্র-কাজের একটি উদাহরণ। এই ধরনের কাজ যে তারা একত্রে পরামর্শ করে প্রায়ই করে থাকে তার পেছনে ওদের একটি মানসিকতা কাজ করে। ছোটবেলা থেকে তারা প্রযুক্তি লালিত স্বাধীন জীবন ভোগ করেছে। হ্যাঁ বাবা মা'কে খুব ব্যস্ত থাকতে দেখেছে, সব সময় নানা ভাবনায় বিভোর দেখেছে, কিন্তু তার পেছনে তাঁদের আনন্দটিও ছেলে মেয়েরা অনুভব করেছে। তারা কখনো নিজের চোখে এমন কাউকে দেখেনি যে জীবিকার জন্য কাজের ঘানিতে বাঁধা আছে। কিন্তু সে রকম গল্প সব সময় শুনেছে, স্কুলে তার ইতিহাস পড়েছে। সিনেমায়ও দেখেছে। গল্প শোনা, বইয়ে পড়া, অথচ কাউকে সে রকম না দেখার কারণ হলো তাদের জন্মের আগেই পুরাপুরি ঘটে গেছে সেই বিরাট বিপ্লব।

বহু দিন ধরে ওটি এগিয়ে আসছিলো, ইন্টেলিজেন্টরা উৎপাদন ও সেবার দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছিলো প্রায় সব পর্যায়েই। তাতে প্রথমে মানুষের মধ্যে একটি হাহাকার আসে সেই নিত্য পরিচিত নিজের কাজটি হারিয়ে ফেলে। এতে তাদের জীবনে শুধু অর্থনৈতিক ধাক্কাই এলোনা, আত্মসম্মানেও একটি ধাক্কা এলো। সেখান থেকে উঠে এসে আজকের অবস্থায় আসার প্রক্রিয়াটি মোটেই সহজ হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন সুচারু রূপে ওই পরিবর্তন ঘটছে যে দৈনন্দিন ময়না-রাহিলের কাছে ওটিতে কোথাও তেমন কোন ঘাটতি চোখে পড়েনি। অথচ আগের ধাক্কাগুলোর কথা তারা শুনেছে।

এই যুগান্তকারী পরিবর্তনে তাই তরুণ সমাজের দারুণ আগ্রহ। পরিবর্তিত জীবনটি এখন প্রায় নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠিত। অথচ টানাপোড়েনের অতীত জীবনটি এখনো ইতিহাসে পরিণত হয়নি– বলা যায় পশ্চাৎপটে ওটি এখনো অনেকের স্মৃতিতে রয়ে গেছে। কাজেই ইন্টেলিজেন্ট-প্রভাবিত জীবনটিতে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যেতে না পেরে পরিবর্তনটি নিয়ে যেমন অনেক জিজ্ঞাসা, তেমনি সামনের গতি-প্রকৃতি সম্ভাবনা নিয়েও অনেক ভাবনা। এটি বাবা মার মধ্যে দেখেছে ময়না-রাহিল, নিজেরাও ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

ময়নার সমীক্ষায় একেবারে সাম্প্রতিক এই পর্যায়টি গুরুত্ব পেয়েছে। পুরো সমীক্ষার জন্য দীর্ঘ সময় সে কাটিয়েছে চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীতে। আজকের পাবলিক লাইব্রেরী মানে একটি গবেষণাগার– শুধু জ্ঞান সংরক্ষণ করেনা, জ্ঞান সৃষ্টিও করে। অন্য অনেক কাজের মত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারও এর কাজ। বয়স, পেশা নির্বিশেষে যে কোন মানুষ ওখানে মৌখিক ইতিহাসে অবদান রাখতে পারেন। তাদের কথিত কাহিনী ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সাহায্যে সুবিন্যস্ত যেমন হয়, তেমনি ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তার অন্তর্নিহিত মূল্যটিও নির্ধারিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানুষ এটি করে এসেছে। ময়নার উদ্দেশ্য হলো ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিয়ে সফ্‌টওয়্যার ও রোবটরা যখন মানুষকে তার জীবিকার থেকে উচ্ছেদ করছিলো তাতে ভুক্তভোগী মানুষের প্রতিক্রিয়াগুলো জানা। এখানে কাজ হারিয়ে ফেলার প্রথম এবং সব থেকে বড় ধাক্কাটি এসেছিলো শ্রমজীবী মানুষের ওপর। প্রথম সুযোগেই ইন্টেলিজেন্ট রোবটরা কারখানায় ও অন্যান্য কর্মস্থলে

তাদের জায়গাটি নিয়ে নিয়েছিলো। এতে কর্মচ্যুতদের কী অবস্থা হয়েছিলো, কী ভাবে তারা সবাই ধাক্কা সামাল দিয়েছিলো তা যথাসম্ভব তাদের জবানিতেই জানার চেষ্টা করেছে ময়না। তাছাড়া আর যারা কাজ হারিয়ে নিজেদের অর্জিত পেশার পরিবর্তনে নিজেদের জন্য বিকল্প জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা তখন করেছিলো তাদের জবানিতেও। এরা সবাই অতীতের বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষ। জবানিগুলোর সব এক একটি সময়ে তাঁরা এখানে ওরাল হিস্ট্রি হিসেবে রেকর্ড করেছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগ এখন পরলোকে।

জয়নাব, প্রাক্তন গার্মেন্ট শ্রমিক: 'চট্টগ্রামে তখন গার্মেন্টস শিল্প অনেক দিন ধরে প্রতিষ্ঠিত; ওখানে আমার মত গ্রাম থেকে আসা অনেকের জন্য কাজের ব্যবস্থা কঠিন ছিলনা। যখনই কোন নতুন মেশিন এসেছে আমরা শিখে নিয়েছি, রাত দিন কাজ করে অর্ডার সরবরাহ যথাসময়ে করতে সাহায্য করেছি। এক সময় লক্ষ্য করছিলাম ক্রমে এমন সব মেশিন আসছে যাতে আমাদের মত শ্রমিকের সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলা যায়। শুনতে পাচ্ছিলাম উন্নত দেশে গার্মেন্টস কারখানা থেকে শুরু করে গাড়ি তৈরির কারখানাও শ্রমিকহীন করে ফেলা হয়েছে– সেখানে রোবট শ্রমিকরা সব কাজ করছে। শোনা অবধি ভয়ে কুঁকড়ে ছিলাম কখন নিজের চাকরিটি হারাই।

এবার নতুন শুনলাম আমাদের গার্মেন্ট কারখানাটাই থাকবেনা। যাদের জন্য আমরা পোষাক তৈরি করি, তারা রোবট দিয়ে নিজের দেশেই তা তৈরি করে নেবে। আমাদেরকে দিনের পর দিন বেতন দেবার বদলে একবার রোবটকে তৈরি করিয়ে নিলেই হলো। এরা ছুটি নেয়না, আন্দোলন করেনা, বেতন নেয়না। শেষ অবধি ক্রেতার জন্য ওটাই এখন সস্তা পড়ে। কীই বা দিতো আমাদেরকে, বলতে গেলে পেটে ভাতে থাকতে হতো। সেটুকুও আর থাকবেনা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

গার্মেন্টস শিল্পে নানা দুর্যোগ শুরুর পর থেকে চাকরির নিশ্চয়তা আমাদের কখনো ছিলনা। একদিন সত্যি সত্যি চাকরিটি চলে গেল। শহরের বস্তির বাসাটি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে যেতে হলো। দেখলাম আমার মত অনেকে ফিরে গেছে। গার্মেন্টস ছাড়াও অন্যান্য কারখানাও বন্ধ হয়েছে, যেগুলো বন্ধ হয়নি শ্রমিক সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলেছে। অন্যান্য কর্মচারীও কমে গেছে। কারণ ওই কাজগুলোও এখন যন্ত্র করতে পারছে। গ্রামে সংগ্রাম করেছি কিছু

রোজগারের জন্য। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করার চেষ্টা করেছি, যখন যেটি পেরেছি। কিন্তু ছোট বাজারে এতগুলো মানুষ ওই একই কাজ করছে বলে ওগুলো ভাল এগুচ্ছিলনা। তবে শেষ পর্যন্ত জীবনের মানের কথা যদি বলি তা হলে অল্প উপার্জনেও গ্রামের অপেক্ষাকৃত সহজ জীবনটি আগেরটির চেয়ে খারাপ ছিল বলা যাবেনা। গার্মেন্টের চাকরিতে উন্নতির আশার একটি মোহ ছিল, সেটি কখনো পূরণ হয়নি। বরং গ্রামে ফিরে বুঝেছি চাকরির মোহে কী কঠিন জীবন বেছে নিয়েছিলাম– বস্তিতে থাকা, দীর্ঘ সময় কাজ করা, বাধ্যতামূলক ওভারটাইম করা, সুপারভাইজারদের কড়া শাসনে দুর্ব্যবহারের মধ্যে বিরামহীন কাজ করে যাওয়া। সব চেয়ে বড় দুঃখ ছিল সন্তানদের যত্ন নিতে না পারা। দম দেয়া কলের মত সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করে গেছি।

চাকরি যাওয়ার কিছুদিন পর একটি সুখবর পেয়েছিলাম। বিদেশী ক্রেতা কোম্পানীগুলো আমাদের গার্মেন্টস কোম্পানীর মাধ্যমে চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিলো। এটি আন্তর্জাতিক মহলের চাপে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। এখন থেকে যারাই রোবট ব্যবহার করে মানুষের চাকরি খাবে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নগদ বেতনটির অভাবে সংসারে টানাটানির সীমা ছিলনা। তবুও ক্ষতিপূরণের টাকাটি মেয়েকে পড়াবার কাজেই খরচ করেছি। পড়াশুনায় মেয়েটির আগ্রহ আর মেধা ছিলো। মনের উৎসাহে কষ্ট করে এগিয়ে গেছে। সে এখন কম্পিউটার-ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ভাল চাকরি পেয়েছে। তারপর থেকে দেখেছি যে সব ভাত-কাপড় ও সুযোগ সুবিধা আমরা কখনো কল্পনা করতে পারিনি সরল জীবনের মধ্যেও ওগুলো যথেষ্ট পেয়েছি– খুব অল্প দামে পেয়েছি, আমাদের আয়েই ওই সব কিছু কুলোতে পারছি।’

খুরশিদ মিয়া, আবুধাবিতে কাজ করে ফেরা প্রবাসী: ‘আমাদের পরিবারের সঙ্গে আবুধাবির সম্পর্ক একেবারে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলো। বহু প্রজন্ম ধরে আমাদের পুরো গ্রাম, সকল আত্মীয় স্বজন বলতে গেলে আশপাশের পুরো এলাকাই “দুবাইওয়ালাদের” গ্রাম বলে পরিচিত ছিল। আমি নিজে চলে এসে ছেলেকে যখন পাঠাবার চেষ্টা করছিলাম দেখলাম ব্যাপারটি আর সহজ হচ্ছেনা; আমাদের ডাক আর ওখানে পড়ছেনা। এটি এমন নয় যে নানা দেশের অনেক মানুষ আর সেখানে কাজ করছেনা, কিন্তু আমাদের কাজগুলো আর নেই।

আমরা করতাম নির্মাণ শ্রমিকের কাজ, কারখানার শ্রমিকের কাজ, পরিচ্ছন্নতার কাজ থেকে শুরু করে নানা গতর খাটা কাজ। আগেই দেখছিলাম ওগুলোতে বেশি বেশি করে রোবট আসছে– ধীরে ধীরে সব রোবটের হাতে চলেই গেছে।

বিদেশে কাজে যেতে না পারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছে। সেটি অবশ্য কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে, একটু বেশি টাকা পরিবার পরিজনের জন্য কামাই করাটি খুব জরুরি হবার কারণে। আবুধাবির কাজ কখনো সহজ বা আকর্ষণীয় কিছু ছিলনা। কিন্তু গতানুগতিক ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে এর বিকল্প কিছুতে পারদর্শী হবার চেষ্টা করিনি, লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করিনি। ছেলে পড়াশুনা করে অন্য কিছু করবে এ কথাও মাথাতেই আনিনি। কাজেই একেবারে অসহায় হয়ে পড়লাম।

দেশে যে ধরনের কাজ আগে যা ছিল সেগুলো থাকলে এই অবস্থায় সেগুলো করতে পারতাম, বা আবুধাবির জমা টাকা দিয়ে ব্যবসা গড়তে পারতাম। কিন্তু দেশেও এসব কাজের চাহিদা গুটিয়ে যাচ্ছিলো, রোবট এখানেও চলে এসেছিলো। রোবট বুদ্ধির সঙ্গে সমান তালে কাজ করতে না পারলে দেশেও কাজ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। তবে আবুধাবিতে বাগানে, হাসপাতালে, বাসায়, বৃদ্ধাশ্রমে অনেকের কাজ রয়ে গিয়েছিলো। ওরা বলে তাদের কাজটি রোবট করতে পারেনা– সান্ত্বনা দিয়ে, হাত বুলিয়ে, হাতে পরিচর্যা করে চলে সেবা সুশ্রুষার কাজ, তাই এগুলো আমাদের জন্য রয়ে গেছে। আমাদের দেশের কিছু কর্মী মরুভূমিকে সুজলা সুফলা করার কাজ করতো। এটি তাদের করতে হতো একেবারে ব্যক্তিগত ভাবে হাতে খুরপি নিয়ে একটু একটু মাটি খুঁড়ে অতি যত্নে, যেখানে যে রকম দরকার সেভাবে। এটি করার মত বুদ্ধিমান রোবট নেই বলে তাদের চাকরিও রয়ে গেছে।

সারা জীবন আবুধাবিতো খেটে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। বড় ছেলেকে আবুধাবি পাঠাতে না পেরে সে টাকায় ছোট ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়েছি। ছেলেটিও মেধাবী। স্কলারশিপ পেয়ে আমেরিকা থেকে ডিগ্রি করে এসেছে। সে বলেছে সে রোবটকে চালাবার কাজ করে, তার কাজের অভাব হবেনা। এখন দেখি আপনাদের দোয়ায় কী হয়।'

এরকম রেকর্ড করা কথাগুলো শুনে শুনে ময়না আগের ভুক্তভোগীদের জবানবন্দী সংগ্রহ করেছে। কিন্তু ওই পাবলিক লাইব্রেরির ল্যাবোরেটরিতে সে আরো একটি কাজ করতে পেরেছে। বেশ কয়েকজন ভাবুক প্রবীণ মানুষের সন্ধান পেয়েছে, যাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও স্বল্প আগের পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা থেকে অর্থনীতিতে ওই প্রবল ধাক্কা ও সেটি সামলে নেবার চেষ্টায় নতুন অর্থনীতি সৃষ্টি নিয়ে সমাজসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। এর ভালমন্দ নিয়ে এতে শরিকও হয়েছেন এক সময়। তাঁদের কাছে অভিজ্ঞতাগুলো ছিল অত্যন্ত জীবন্ত, অনেক কিছু প্রত্যক্ষ দেখা, কিছু পূর্বসূরিদের থেকে শোনা।

চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীর একটি বোর্ডরুমে তাঁদের কয়েক জনকে নিয়ে ময়নার ঘরোয়া সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে খুব কাছের কয়েক জন সশরীরে এসেছেন, বাকিরা আসতে না পেরে অন লাইনে যোগ দিয়েছেন। এসব কথা বলতে নিজেদের প্রবল আগ্রহের কারণেই এসেছেন।

ময়না: 'আপনাদেরকে এভাবে আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে দেখে আমি খুবই অভিভূত। এতটুকু আমি আশা করিনি। আপনারা প্রত্যেকে এক একজন নামকরা সমাজ বিজ্ঞানী। বহুদিন ধরে বিশ্ব সমাজে ও বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বিপ্লব ঘটে গেছে তা দুনিয়ার কিছু মানুষ তাঁদের প্রজ্ঞা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। অন্যদেরকেও বুঝতে সাহায্য করেছেন। আপনারা সেই মানুষদেরই অন্তর্ভুক্ত যাঁরা আমাদের সমাজের দিক থেকে এসব নিয়ে ভেবেছেন। গুটি গুটি এসে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির প্রয়োগ যে এক সময় সবার জীবনকে নেড়ে চেড়ে দিয়েছিলো সেটি আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। অভাবে ওই ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিই আমাদেরকে অনেক অর্থহীন গতানুগতিক শ্রম, অনেক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। এর একটি চড়া মূল্য শুরুতে আমাদের দিতে হয়েছে এই মুক্তির উপভোগের শর্ত হিসেবে। তবে এটিও ঠিক যে আমরা একবার যখন পানিতে নেমে যাই, চারিদিকে পানির মধ্যে সাঁতার কাটি, আর সেখানে দম নেবার মত অক্সিজেন আমাদের সঙ্গেই থাকে, তখন আমরা ভুলে যাই যে আমরা পানির মধ্যে আছি, ওটিই আমাদের জন্য এতো স্বাভাবিক হয়ে পড়ে যে এর অন্যথা যে ক'দিন আগেও ছিল তা ভাবা প্রয়োজন মনে করিনা। সামনে আমাদের কী হতে পারে তাও ভাবিনা। এমন অবস্থায় যে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গত দু'তিনটি দশক গেছে তার ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনারা যারা

ভেবেছেন, মতামত দিয়েছেন, তাঁদের কথা খুবই মূল্যবান। তাই আপনাদের কাজ থেকে সরাসরি শুনতে চাচ্ছিলাম।

আমাদের মধ্যে উপস্থিত দীপা দাশগুপ্তকে সবাই একজন দার্শনিক চিন্তাবিদ হিসেবে জানে। কিন্তু তিনি একদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তুখোড় একাউন্ট্যান্ট হিসেবে একেবারেই কারবারি ভূমিকা পালন করেছেন। একদিন তাঁর মত মানুষ ছিলো ব্যবসার প্রাণ। কিন্তু সেই ভূমিকাটি ক্রমেই সংকোচিত হয়ে এসেছিলো ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি কাজটিতে পারদর্শী হয়ে ওঠাতে। তারপর কী হলো তিনিই ভাল বলতে পারবেন।

দীপা: 'কোম্পানীতে আমার মত কয়েকজনের চাকরিই শেষ পর্যন্ত টিকেছিলো, বাকিদের চাকরিতে ইন্টেলিজেন্টরা এসে গিয়েছিলো। ডানে বামে সবার চাকরি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। যাদের সঙ্গে এতোদিন অফিস করেছি, সুখে দুঃখে সময় কাটিয়েছি তারা কেউ আর সেখানে অবশিষ্ট ছিলোনা। এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার, মার্কেটিং ম্যানেজার, পাবলিক রিলেশন অফিসার, কেউ নয়। একাউন্ট্যান্ট হিসেবে আমার নিজের অবস্থানও মোটেই মজবুত ছিলনা, কেমন যেন একটি বাড়তি মানুষে পরিণত হয়েছিলাম। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমার সাহায্যে যাবতীয় ইন্টেলিজেন্ট কর্মীদের কাজের সত্যিকার যথার্থতা নিরূপণের চেষ্টা করতেন। তিনি আমি মিলে একটি মানব-সম্মত যাচাইয়ের চেষ্টা করতাম। এটি সে সময় একটি দরকারী সাবধানতা ছিল, কারণ ইন্টেলিজেন্টরা অনেক সময় সমন্বয়হীন ভাবে আজগুবি ফলাফল দিতো যা একমাত্র একজন অভিজ্ঞ মানুষ একাউন্ট্যান্ট চট্ করে ধরতে পারতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের কোম্পানীর পর্যায়ে ইন্টেলিজেন্টের ভুল করা শূন্যের কোঠায় নেমে এলো, আমার এতোদিনের অভিজ্ঞতার কদর আর হলোনা, আমিও চাকুরিচ্যুত হলাম।'

ময়না: 'এতে আপনার জীবন কি ভেঙ্গে পড়লো? আপনি কি জীবনটি বৃথা মনে করতে আরম্ভ করলেন, অথবা খুব সাংসারিক দুঃখকষ্টে পড়ে গেলেন?'

দীপা: 'হ্যাঁ প্রথমে কিছুদিন তাই মনে হয়েছিলো, নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছিলো। কিন্তু শিগ্গির অর্থনীতিতে এমন সব পরিবর্তন দেখতে আরম্ভ করলাম যা কোনদিন ওভাবে ভাবিনি। এর ফলে সমাজটিই যেন বদলে গেলো খুব

দ্রুত। ওই যে ইলেকট্রোনিক্স আর কম্পিউটারের জগতে নতুন নতুন প্রযুক্তি এসে দ্রুত সেগুলোর দাম কমিয়ে ফেলে, সেটিই যেন অতি দ্রুত গতিতে ঘটলো। কোম্পানীর নানা বিশেষজ্ঞ হিসেবে খুবই কার্যকর ইন্টেলিজেন্ট কর্মী পাওয়ার দাম অবিশ্বাস্য রকম কমে গেলো; ইন্টেলিজেন্ট রোবট শ্রমিকের দামও। ফলে সব পণ্য ও সেবার মূল্য সবার জন্য অত্যন্ত সস্তা হয়ে গেলো। অর্থনীতির আগেকার মৌলিক নিয়মনীতিই যেন বদলে গেলো। ওই দাম পড়ে যাওয়াতে বাজার কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলোনা; বরং সবাই কিনছে, সবাই খাচ্ছে, উপভোগ করছে বলে মালিকদের হাতে তার পরেও বিশাল লাভ জমলো, আগের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। চাকরি হারিয়ে নতুন চাকরি না পাওয়ার জন্য নাগরিক ভাতা পেতে লাগলাম, যাতে সংসার আগের থেকেও অনেক স্বচ্ছন্দে চলতে লাগলো। ওই নাগরিক ভাতা অবশ্য আসছিলো মালিকদের থেকে প্রচুর ট্যাক্স নিয়ে, কারণ উৎপাদনের যেটুকু আয় তা তো সব তাদের কাছেই। দুনিয়ার মুরব্বিরা একমত হলেন যে এটি না করলে বিশ্বের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ময়না: 'তা ভাতার কারণে জীবিকা না হয় স্বচ্ছন্দে চল্‌লো, কিন্তু ওই আপনার একাউন্টিং অভিজ্ঞতার কদর, ওই যে সহকর্মীদের সঙ্গে কোম্পানী চালাবার আনন্দ, সেগুলোকে দারুণ ভাবে মিস্ করতেন না?'

দীপা: 'হ্যাঁ মিস্ করতাম শুরুতে। বেকারত্বের ভয়ের কথা সারাজীবন যা শুনে এসেছি সেগুলো আমাকেও পেয়ে বসেছিলো। কিন্তু পরে দেখলাম সেটি সম্পূর্ণ একটি অলীক ভাবনা, যা মালিক পক্ষ চিরকাল আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো। যেন মালিকের লাভের টাকার হিসেব রাখাটাই আমার জীবনের লক্ষ্য, এমন একটি ধারণা আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো– এমনই ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো হাজারো পেশাজীবীর মনে। যখন সেই ঘোর কেটে গেলো তখন বুঝলাম এটি কারো জীবনেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারেনা। আসল উদ্দেশ্যটি তার নিজের মনকে বেছে নিতে হবে– কোন্ কাজ করে সে আনন্দ পায়, জীবনের ভেতর একটি তৃপ্তি অনুভব করে। এতদিন সেই চিন্তাটি করতেই পারিনি– কিছুটা জীবিকার প্রয়োজনে, কিছুটা পেশাজীবীর মোহে।

যখন সেগুলোর প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেলো এক রকম মুক্তির স্বাদ অনুভব করলাম। দেখলাম আমি সমাজকর্মী হবার ক্ষেত্রেই আনন্দ পাই। এই

আনন্দ আগে আমার যে ছিলনা তা নয়, কিন্তু তার প্রকাশের সুযোগ ছিল খুব সামান্য– ছুটি ছাটায়, অবকাশে একটু আধটু উঁকি ঝুকি দিতো। এখন আমি আমার জীবন সাধনাকে খুঁজে পেয়েছি।'

ময়না: 'সবাই কিন্তু দীপা দাশগুপ্তের মতো ভাগ্যবতী ছিলেননা। অনেকে চাকরি বা পেশা হারাবার পর দীর্ঘ দিন একটি শূন্যতার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। এ শূন্যতা নানা দিক থেকেই– সংসারে টানাটানি, আত্ম পরিচিতি হারাবার বেদনা, বিশেষ ভাবে গণ্য না হবার অভিমান ইত্যাদি তাঁদেরকে প্রচুর ভুগিয়েছে। অর্থনৈতিক বিপ্লবের সুফলও তাঁদের জন্য অনেক দেরি করেই এসেছিলো। আমরা এমন কিছু মানুষের অভিজ্ঞতাও শুনতে চাই। পাভেল রহমানের কাছে তাঁর বাবা মার স্মৃতি এদিক থেকে মূল্যবান। পাভেল একজন তুখোড় সাংবাদিক। মানুষের আসল সংবাদ যে ইন্টেলিজেন্ট সাংবাদিক সংগ্রহ করতে পারেনা এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি কী করেছেন তা অনেকের জানা। ইন্টেলিজেন্ট এসে তাঁর বাবা মা উভয়ের মসৃণ জীবনকে কেমন সংগ্রাম সংকুল করে তুলেছিলো সেটি কখনো তিনি ভুলেন নি। যদিও তাঁর নিজের এখনকার সংগ্রামটি তিনি আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করতে পারছেন, তাঁর বাবা মা কিন্তু তা পারেননি, ওই পেশাচ্যুতির কারণে।'

পাভেল: 'বাবা প্রায়ই তাঁর ল্যাবোরেটরির গল্প করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ফল করে রসায়নে ডিগ্রি পাওয়া বাবা সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি পেয়েছিলেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিলের গবেষণায়। গবেষণায় তাঁর দারুণ উৎসাহ ছিল; সেটি বুঝতাম চাকরি জীবনে সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার পদে দ্রুত প্রমোশন পেয়েও আমাদের কাছে তাঁর ল্যাবোরেটরির নিয়মিত গল্পে কোন পরিবর্তন আসেনি। এ গল্পে তাঁর সেই ম্যাজিক মিশ্রণকে দিনের পর দিন অটোক্লেভে রেখে পরে কোন্ রিয়্যাজেন্টের ছোঁয়ায় অদ্ভুত বায়োডেগ্রেডেবল প্লাস্টিকে পরিণত করতে যাচ্ছেন তার উত্তেজনাকর প্রতি মুহূর্তের খুঁটিনাটি কিছুই বাদ যেতোনা। আসলে আমি তখন বালক এবং তিনি যৌবনের বাধ না মানা তুঙ্গে। ওই উড্ডয়নের সময়েই তাঁর বিজ্ঞানী জীবন হঠাৎ করে শেষ হয়ে গিয়েছিলো। ওই রকম উম্মাদনায় যে সব কাজ তিনি ল্যাবোরেটরিতে করতেন, আর এর ফলাফলের ওপর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত টানতেন, সেই সব কিছু ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির কাছে অত্যন্ত সহজ ও দ্রুত সম্পন্ন করতে পারার কাজ

হিসেবে গণ্য হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বহু কষ্টে একটি প্রাইভেট স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকের চাকরি জোটাতে পারার আগে পর্যন্ত তাঁর মধ্যে অসম্ভব অস্থিরতা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সেই শিক্ষকতার চাকরি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, কারণ স্কুলের শিক্ষক-সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছিলো ইন্টেলিজেন্ট শিক্ষকরা আসার ফলে।

ও সময় মা সংবাদপত্রের সাব-এডিটরের একটি চাকরি যোগাড় করতে পারায় একটু নিশ্বাস ফেলার সুযোগ মিলেছিলো। মা চমৎকার বাংলা লিখতেন, খুব অল্প কাট্‌তির ওই কাগজটির এমন কাউকে দরকার ছিল যিনি লিখবেন, অন্যের লেখা পরিশীলিত করবেন, প্রুফ দেখবেন– সব কিছু। ইন্টেলিজেন্ট প্রযুক্তিতে ঢোকার সামর্থ ওই কাগজের ছিলনা, ওটিই ছিল মায়ের লাভ। ওদিকে যেই রসায়নের ভাল ছাত্র হবার গর্ব বাবা করতেন সেটি আপাতত ভুলে গিয়ে তিনি বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে নতুন পড়াশুনা ও ট্রেনিঙে যোগ দিলেন। এই বয়সে এসেও নতুন জ্ঞান ও নতুন কাজের চেষ্টা তাঁকে বাধ্য হয়েই নিতে হলো, কারণ সবাই বলছিলো এ রকম কাজে মানুষের ছোঁয়া অত্যাবশ্যকীয় বলে এটি ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির হাতে চলে যাবেনা। আর বাবার আত্মবিশ্বাস ছিল নতুন চ্যালেঞ্জ নেবার।

এবার বাবা চাকরি পেলেন ডাউন সিনড্রোমে ভোগা জড়বুদ্ধি তরুণ তরুণীদের একটি বোর্ডিং স্কুলে। ওদের মনস্তত্ত্বটি বিজ্ঞান দিয়ে এবং অন্তর দিয়ে বোঝার ব্যাপার; সে কাজে বাবা ধীরে ধীরে পারদর্শী হয়ে ওঠেছিলেন। তাদেরকে সঙ্গ দেয়া, জীবন যাপনের ও নানা কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং হাসিখুশি বিনোদনের মধ্যে থেকে জীবন উপভোগের ব্যবস্থা করাটাই ছিল তাঁর কাজ। এর মধ্যে প্রচুর চ্যালেঞ্জ ছিল– বিশেষত ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কে একটি সহজ অনুধাবন তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা নিয়ে। এতে সব থেকে কাজে এসেছিলো তাঁর সঙ্গে ওদের আত্মিক সম্পর্ক। এ রীতিমত একটি সংগ্রাম, কিন্তু বাবাকে এতে আনন্দ পেতে দেখেছি এটিই আমার ছোটবেলার একটি সুখস্মৃতি। বহু পরে এখান থেকেই তিনি অবসর নিয়েছিলেন– তাঁর অবসর ভাতাটিই ছিল এরপর পরিবারের বড় সম্বল। ওই যে মনস্তত্ত্বের দিকে তিনি ঝুঁকিয়েছিলেন, তার চর্চা অবসর জীবনেও অব্যাহত ছিল। আনন্দ তাঁর ফুরায়নি।

এদিকে মা সংবাদপত্রের কাজটি বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। তখন স্বেচ্ছাসেবী নার্স হিসেবে তিনি ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং সে কাজে নাম লিখিয়েছিলেন, কারণ তার চাহিদা তখন বেশ বেড়েছিলো। রোবট নার্সরা শুধু গৎবাঁধা কিছু স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারতো, আসল সেবা মানুষ নার্সকেই দিতে হতো। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই সেবার গুরুত্ব আগের থেকে বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন। তাঁর স্বভাবসুলভ স্নেহময়ী স্বভাব এ কাজে সাহায্য করেছিলো– এতে সংসারে কিছু উপরি আয় হতো। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির প্রচলন এভাবেই বাবা মাকে জীবনের মাঝখানে এসে সংগ্রামে নামিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের দু'জনের কাউকেই অখুশি দেখিনি। আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে, সব মানুষের সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে, বাড়িতে বসে পাওয়া নানা সার্ভিসগুলোর ক্ষেত্রে নতুন অর্থনীতির হাত বাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারটি তাঁরা দেখে যেতে পেরেছিলেন। আমরা ভাইবোনদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদেরকে দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। ওটিই ছিল তাঁদের বড় সান্ত্বনা।'

ময়না: 'পাভেলের বাবা মা তাঁদের পেশা হারানোর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাননি, পরের দিকে যা প্রায় সবাই পেয়েছে। কিন্তু তাঁরাও একটি সহায়তা সরকারের দিক থেকে পেরেছেন তা হলো নতুন কোন কাজে যোগ দেবার জন্য ট্রেনিঙের ব্যবস্থা। পেশা যাঁরা হারিয়েছিলেন বা হারানোর আতঙ্কে ছিলেন তাঁদের একমাত্র আশা ছিল এখনো চাহিদা রয়েছে এমন নতুন কোন বিষয় শিখে নেয়া। পুনপ্রশিক্ষণ কথাটিই তখন সবার মুখে মুখে। সরকারী ভাবে এবং বেসরকারী উদ্যোগেও প্রচুর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছিলো যেখানে অনলাইন ও সরাসরি হাতে কলমে দ্রুত প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল। যে সব কোম্পানী ইন্টেলিজেন্ট কর্মী নিয়োগের কারণে মানুষকে চাকুরিচ্যুত করেছে বা ব্যবসা প্রত্যাহার করে চলে গেছে, তাদেরকেই ব্যবসার আকার অনুযায়ী পুনপ্রশিক্ষণে অনুদান দিতে বাধ্য করা হয়েছিলো। ওতেই ভুক্তভোগীদের কাছে পুনপ্রশিক্ষণটি সহজলভ্য হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কেমন করে কী বিষয়ে দিলে ভাল হবে সেটিও বেশ গবেষণা ও চিন্তা ভাবনার ব্যাপার হয়ে ওঠেছিলো। সেই ধারাবাহিকতায় আজ নতুন পরিস্থিতিতেও প্রশিক্ষণ একটি বড় বিষয়। আজ শুধু পেশার প্রয়োজনে নয় নাগরিক স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেও অসংখ্য মানুষের

কাছে নতুন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণের চাহিদা। ধারাবাহিক ভাবে এ নিয়ে কাজ করার জন্য বিখ্যাত একজন আজ আমাদের সঙ্গে আছেন– অরুণা জহির।

অরুণা: 'একদিকে ইন্টেলিজেন্ট কর্মীর হঠাৎ বিস্তৃতি ও মানুষের পেশা হারানো, আর অন্যদিকে পুনপ্রশিক্ষণ নেবার আগ্রহ এই দুটিতেই হঠাৎ করেই যেন একটি জোয়ার এসেছিলো। এই আগ্রহের লক্ষ্য ছিল একটাই– যেই পেশাগুলো এখনো ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির কাছে ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনা কম সেগুলোতে দক্ষতা লাভ। এই যে জোয়ার এটি হঠাৎ করে আসেনি– একাধিক প্রজন্ম জুড়ে এটি এসেছিলো। তবে পরিবর্তনের গতি আগের সময়ের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিলো তখন। প্রশিক্ষণের বিষয় হিসেবে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সফটওয়্যার ও রোবটের সঙ্গে এক যোগে কাজ করতে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে। অবশ্য এর জন্য কিছু পূর্ব দক্ষতার প্রয়োজন হয়েছে, কম্পিউটার ও ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি সংক্রান্ত। পরবর্তী প্রজন্মে এটি যেন আরো ব্যাপক ভাবে সম্ভব হয় সেজন্য এই পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একটি পর্যায় পর্যন্ত নিয়মিত শিক্ষাক্রমে বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। ফলে অন্য বাস্তব কাজের জন্য পুনপ্রশিক্ষণ পেলে, ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির সঙ্গে কাজে নতুন পেশায় যোগ দিতে পারতেন। এরকম কাজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিয়োজিত হলেও মানুষের বিবেচনা-সমৃদ্ধ কিছু কিছু সিদ্ধান্ত মানুষকেই তখনো নিতে হয়েছে; যা ওই বুদ্ধির সঙ্গে সহযোগিতার ভঙ্গিতে করতে হয়।

এই তত্ত্বাবধানের বিষয়টি এখনো বেশ ভাল ভাবেই রয়েছে। মনে হয় আরো বহু দিন থাকবে। প্রায়ই দেখা যায় কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভাবে ইন্টেলিজেন্টের হাতে ছেড়ে দেবার থেকে মানুষের তত্ত্বাবধানটি রেখে করাটি অনেক বেশি নিরাপদ। আগে থেকে যাঁরা ওকাজে আছেন তত্ত্বাবধানে তাঁরা গুরুত্ব পেয়েছেন। কিন্তু নতুন মানুষেরও প্রচুর চাহিদা যেমন আর্ট, সাংবাদিকতা, গ্রাহক সেবা, বিপনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুই বুদ্ধির একযোগে কাজটি বরাবর মূল্য পেয়েছে।

পুনপ্রশিক্ষণের আরেকটি বড় ক্ষেত্র ছিল নানা রকম ব্যক্তিগত সেবার ক্ষেত্রে যেখানে সহমর্মিতা, আন্তরিকতা, মনস্তাত্ত্বিক অনুধাবন ইত্যাদিও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়। এগুলো শিশুযত্ন, বার্ধক্য, রোগ নিরাময়, প্রতিবন্ধী সেবা ইত্যাদি সেবার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি বানিজ্যিক, অবকাশ যাপন, তথ্য

পরিবেশনা, বিনোদন ইত্যাদি নানা রকম পেশাও অন্তর্ভুক্ত যেখানেই মানুষের ছোঁয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগ করে। অনেকের জন্য নতুন বিষয় হলেও প্রশিক্ষণের এমন উৎকর্ষ আনা হয়েছে যে একনিষ্ঠ ভাবে চেষ্টা করলে এমন নতুন পেশা গড়ে তোলা খুবই সম্ভব। একই ধারায় একজন মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শক হিসেবে কাজ করার প্রশিক্ষণটিও বেশ চাহিদা পেয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে ওরকম সহানুভূতি সম্পন্ন পরামর্শকের কাজের ব্যাপক চাহিদা বহুকাল ধরেই রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসবের চাহিদা অন্য দেশগুলোর কাছেও অনেক ব্যাপক হয়েছে। যন্ত্রের ব্যবহারে ও সেবায় যেমন এখানে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তেমনি মানবিক ছোঁয়ার সেবা সামনা সামনি পেতেও শারীরবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবে অভ্যস্ত হয়েছে। হয়তো পরেরটি এসেছে আগেরটিকে একটি ভারসাম্যের মধ্যে আনতে। যান্ত্রিকতায় আমরা যেন ভেসে না যাই।

তাই যেটি আগে তেমন ভাবা হয়নি, ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি প্রবল ভাবে এসে ওই বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাগুলোকেও কিছুটা প্রকট করে তুলেছিলো। ওটি এসে অনেক পেশার দরজা আমাদের জন্য যেমন বন্ধ করে দিয়েছে, এর সীমাবদ্ধতাগুলো প্রকট হয়ে অন্যান্য বেশ কিছু পেশার দরজা তেমনি খুলেও দিয়েছে। এটি অবশ্য প্রযুক্তির ইতিহাসে বার বার ঘটেছে, নতুন প্রযুক্তি কিছু পেশা বন্ধ করেছে আবার কিছু নতুন পেশা খুলে দিয়েছে। অবশ্য ইন্টেলিজেন্ট প্রযুক্তির আসাটি এত প্রবল ছিল যে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে এসে বন্ধ হওয়া দরজার তুলনায় নতুন খোলা দরজার সংখ্যা অনেক অপ্রতুল থেকেছে। তবে পেশায় স্থান না পেলেও প্রশিক্ষণ বৃথা যেতোনা। যেন বিচিত্র বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী সৌখিন কাজের মাধ্যমে নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে সে জন্যও প্রশিক্ষণ নিয়েছে নানা ভাবে। ইন্টেলিজেন্ট সৃষ্ট পরিবর্তন প্রশিক্ষণের জোয়ার যে কত ভাবে এনেছে তার কোন সীমা নেই।'

ময়না: 'ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি সবার আগে যাদেরকে কর্মচ্যুতি ঘটেছে তারা হলো কারখানার শ্রমিক। আর ওরাই পড়েছিলো সব থেকে অসহায় অবস্থায়। তারা হঠাৎ করে তাদের ন্যূনতম বেঁচে থাকার সম্বল হারিয়ে ফেলেছিলো। অথচ সম্পদবিহীন অবস্থায় দিন এনে দিন খেতে হতো বলে বিকল্প কিছুর দিকে সহজে যেতে পারেনি। কাজেই ওভাবে চাকুরিচ্যুতির বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া

বিশ্বব্যাপী হয়েছিলো। এর প্রতিকারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকা এবং পুনপ্রশিক্ষণের ভাল ব্যবস্থা থাকার যে দাবি ওঠেছিলো এবং সেটি যে কিছুটা পূরণ হয়েছে তার কিছু আভাস আমরা শুনলাম।

ব্যাপারটি ইতোমধ্যে কারখানার শ্রমিকদের ছাড়িয়ে সব পেশার মানুষকেই প্রায় একই ভাবে স্থানচ্যুত করে ফেলেছিলো। ওদের সবাইকে শুধু কিছু সফ্টওয়্যার দিয়ে সরিয়ে দেয়ার যে মহাসুবিধা পুঁজিপতিদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছিলো তাতে শুধু যে ভুক্তভোগীরা চটে গিয়েছিলো তা নয়, অর্থনীতির চিন্তাবিদদের এবং দীর্ঘমেয়াদি শান্তি শৃঙ্খলা টেকসই হবার ব্যাপারে দায়িত্বশীলদেরকে এটি দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছিলো। উৎপাদনের সব উপাদান যখন অল্প কয়েকজন পুঁজিপতির কুক্ষিগত হতে থাকে, এবং তার ফলে তারাই মহাধনী হয় এবং বাকি সবাই অসহায় হয়ে পড়ে সেটি ভবিষ্যতের জন্য ভাল বার্তা দেয়না। দেশে দেশে সরকারের থেকে বেকার ভাতার দাবি বহু আগে থেকেই ক্রমে সোচ্চার হচ্ছিলো। এবার সেটি বিশ্ব নিয়ম হবার দিকে এগুলো। এই যে বিশাল পরিবর্তন তার একজন অগ্রণী গবেষক হলেন আমাদের মন্ময় শরীফ। তাঁর বই 'ঝড়ের পরের অর্থনীতি' বিশ্বজোড়া আর্দৃত হয়েছে। আজ তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন।'

ঝড়ের পরের অর্থনীতি

মন্ময়: 'চাকরি হারিয়ে অনেকেই দীর্ঘকাল ভুগেছেন এটি যেমন সত্যি তেমনি কর্মহীনতার এত বড় ধাক্কা দুনিয়ার কোথাও বিনা প্রতিবাদে যায়নি সেটিও সত্যি। সেই একেবারে শুরুতে যখন কারখানায় রোবট শ্রমিক নিয়োগ আরম্ভ হয়েছিলো তখন থেকেই ক্ষতিপূরণের চাপ তৈরি হয়েছে কোম্পানীগুলোর ওপর; তাদের অনেকে স্বতপ্রণোদিত হয়েও ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। ওটি ছিল একটি স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা। ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির হাতে সব রকম কাজ চলে যাওয়া প্রবণতা দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাগতভাবে কর্মহীন মানুষকে কোন না কোন রূপে সন্তোষজনক বেকার ভাতা দেবার উপায় নিয়ে তাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয়। সব মানুষের অধিকার হিসেবে এটি পেশা-আয় থাকা না থাকা নির্বিশেষে সবাইকে দেয়া উচিত। এটিই ক্রমে রূপ লাভ করে কোন না কোন রূপে একটি 'সর্বজনীন মৌলিক আয়' সবার হাতে দেয়ার গবেষণা রূপে। হ্যাঁ,

সবাইকে উৎসাহিত করা হলো পুনপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প পেশা খুঁজে দিতে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাটি এতই অনিশ্চিত যে সর্বজনীন মৌলিক আয়ের বুনিয়াদি সমর্থনটি ছাড়া মানুষ না পারবে উদ্বেগহীন জীবন যাপন করতে, না পারবে ওই ম্যাজিকের মতো ইন্টেলিজেন্ট প্রযুক্তির সুবিধাগুলোকে উপভোগ করে নতুন পৃথিবীর নাগরিক হতে। আর তা না হতে পারলে পুরো অর্থনীতিই ধসে পড়বে সারা দুনিয়ার।

ব্যাপারটি এতই স্পষ্ট হয়ে পড়ছিলো যে এটি নিয়ে বিশ্ব সমঝোতা আসতে খুব বেশি কালক্ষেপণ করতে হয়নি। হ্যাঁ পণ্য আর সেবার উৎপাদন ব্যয় অত্যন্ত কমে গিয়েছিলো। সেটি শুধু প্রাকৃতিক কাঁচামালের মূল্যের কাছাকাছি স্তরে গিয়ে ঠেকছিলো। আর সেই কাঁচামালকেও একেবারে খনির মত জায়গা থেকে নিয়ে আসতে হবে এমনটি ধরে না নিয়ে বরং অফুরন্ত নবায়নযোগ্য সম্পদ বাতাস, সুর্যালোক, পানি ইত্যাদি থেকে সংশ্লেষণ করে উৎপাদনের কায়দা প্রস্তুত হয়ে গেলো। সেকাজটিও একই ভাবে সস্তা সফ্টওয়্যারের দখলে চলে এলো। এভাবে উৎপাদন ব্যয় সব দিক থেকে দ্রুত কমে এলো বটে, কিন্তু ওই অল্প সংখ্যক পুঁজিপতির দখলে থাকায়, আর বাজারটি বিশ্বজোড়া সব মানুষকে নিয়েই হওয়াতে ধনবৈষম্য পর্বত সমান হতে দেরি হলোনা। কাজেই তাদের উপর একটি বিশাল ট্যাক্স ধার্য করা অনিবার্য ছিলো, যেই ট্যাক্স দিয়ে সেই সর্বজনীন মৌলিক আয় পরিচালনা করা খুবই সম্ভব। এমন আয় কোন কাজ না করে পেলে মানুষ কি তার সব মানবিক প্রণোদনা হারিয়ে নিষ্কর্মা খোদার খাসিতে পরিণত হবে, অনেকে যে ভয় দেখিয়েছিলেন? না এক্সপেরিমেন্ট আর অভিজ্ঞতা দেখালো তা মোটেই নয়– বরং ওটি মানুষের সৃজনী শক্তিকে উৎসারিত করে।

এটি অর্থনীতির একটা সরল অংকে পরিণত হলো সরল কাণ্ডজ্ঞানে। যেরকম একদিন শুরুতে কমন মার্কেটের সরল কাণ্ডজ্ঞান বলে দিয়েছিলো ইউরোপীয় কমন মার্কেট গঠন করতে। পরে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সংস্কৃতিগত কাণ্ডজ্ঞান বলে দিয়েছিলো পুরো ইউরোপকে এক দেশের মত করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে পরিণত করতে। সেই একই রকম কাণ্ডজ্ঞান এখন বিশ্বনেতাদেরকে এবং বিশ্ববাসীকে বলে দিলো দেশগুলোকে শুধু সাংস্কৃতিক দেশের পর্যায়ে রেখে আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলোকে পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলের ঐক্যবদ্ধ সত্ত্বার

হাতে দিয়ে দেয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আর সেই অঞ্চলগুলো চলবে একই বিশ্ব-সমঝোতা ও বিশ্ব সরকারের ছাতার তলে। পার্থক্য শুধু একটাই। কমন মার্কেট থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত যেতে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নকে বহু বাধা অতিক্রম করে, বহু রকম এক্সপেরিমেন্ট করে ধীরে ধীরে এগুতে হয়েছে। অথচ পুরো বিশ্বের পুনর্গঠণের মতো আরো বিশাল কাজে বিশ্বনেতারা অনেক দ্রুততর বেগে এগিয়ে যেতে পেরেছে– সমস্যাটি জরুরি ছিল বলে কাজও হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে।

তবে এক্সপেরিমেন্ট এই ক্ষেত্রেও কম করতে হয়নি। অর্থনীতির তাত্ত্বিক গবেষণাও বিন্দুমাত্র কম হয়নি। আসলে সেগুলো সবার কাছে পরিচিত হয়ে পড়ার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে; শুধু গবেষক বিশেষজ্ঞরা সেই বিতর্কে অংশ নিতো। এমনকি নানা ভঙ্গিতে ওই সর্বজনীন মৌলিক আয়ের প্রচলন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট উন্নত বিশ্বের অনেক স্থানে সীমিত পরিসরে করা হয়েছে এবং সফল হয়েছে। অনেক সময় অন্য কারণে বাধ্য হয়েও এমন ঘটনা ঘটেছে। যেমন বিশের দশকে করোনা অতিমারীতে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়লে কিছু ধনী দেশ সব নাগরিককে তাদের পূর্ববর্তী আয়ের সিংহভাগ সোজা প্রতি মাসে তাদের দিয়ে দিলো বিনা বাক্যব্যয়ে বছরের বেশি সময় ধরে। এর মধ্যে সব রকমের চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, এমন কি রাস্তার ফেরিওয়ালা বা আত্মকর্ম সংস্থান করা মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন বা পরবর্তীতে এর কোন বিরূপ প্রভাব ঘটতে দেখা যায়নি। এভাবে বিশ্ববাসী ওই পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলো।'

ময়না: 'হ্যাঁ ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির কাজ নিয়ে নেয়ার মোকাবেলা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে একটি বড় অর্থনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হতে পেরেছে এর চিন্তা ভাবনা বহু দিনের। যখনই টের পাওয়া গিয়েছিলো যে প্রযুক্তি গবেষণা ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিকে এমন দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যে এটি অনিবার্যভাবে সব ক্ষেত্রে এসে প্রচলিত অর্থনীতিকে ওলটপালট করে দেবে, তখন থেকেই ভাবনার শুরু। যে নতুন অর্থনৈতিক মডেলগুলোর ওপর গবেষণা হয়েছে, পরীক্ষা নিরিক্ষাও হয়েছে তার মধ্যে মূলত সামনে চলে এসেছে সেই ইউনিভার্শাল বেসিক ইনকাম– সর্বজনীন মৌলিক আয়। অতি ধন-বৈষম্যের ওপর উচ্চ হারে কর আরোপ না করতে পারলে এটি সম্ভব হতোনা। সেই সঙ্গে

আরেকটি বড় কাজ হয়েছে ইন্টেলিজেন্ট-বুদ্ধির উন্নয়ন ও প্রয়োগের ওপর কড়া নজর রাখা, যাতে তাতে উপকারের বদলে কারো অপকার হবার দরজা খুলে না যায়। ক্ষতি অসংখ্য দিক থেকে হতে পারে– ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্ট, অধিকারে হাত দেয়া থেকে শুরু করে রীতিমত সন্ত্রাসী আক্রমণ, সবই এর দ্বারা সম্ভব; এবং আরো সহজে প্রতারণা, মিথ্যা তথ্যকে একেবারেই সত্যের মত চালিয়ে দেয়া।'

মন্ময়: 'আর সব থেকে বড় ভয় তো সবার মনে মনে রয়েছেই- অতীতের সায়েন্স ফিকশনগুলো এই ভয়টি যত ব্যাপক ভাবে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে আর কিছু তা পারেনি। অবশ্য ভয়টি অমূলক নয়। এখনো সে রকম কোন আলামতের ধারে কাছে না গেলেও একদিন ওই প্রত্যাশিত সাধারণ বুদ্ধির ইন্টেলিজেন্ট বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করে ফেলবে; যারা আত্মসচেতন হবে, নিজেদের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিজেরাই ঠিক করে ফেলতে পারবে, অথবা কোন অসৎ মানুষের পরামর্শে। আর সেই লক্ষ্য হতে পারে মানব জাতিকে ধ্বংস করা, অথবা তাদেরকে দাসে পরিণত করে রাখা! এসব ভাবতেই ভয় লাগে। তাই সেই রকম প্রবণতার দিকে পুরো লক্ষ্য না রেখে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির ওপর গবেষণা এগুতে দেয়া হচ্ছেনা– বিশ্ব সরকার থেকেই তার ওপর তীব্র নজর। কিন্তু কোথাও এ নজর এড়িয়ে কিছু হচ্ছে কিনা সে সম্ভাবনা তো থেকেই যায়। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিরুদ্ধেও তো নজর সব সময় ছিল। এখন সব অস্ত্র নষ্ট করে ফেলা হয়েছে; কিন্তু ওই গোপন কিছু ঘটছে কিনা কে জানে? অবশ্য এখানে নতুন ইন্টেলিজেন্ট পাহারাদার খুবই কার্যকর। ইন্টেলিজেন্ট গবেষণার অপব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইন্টেলিজেন্ট পাহারাদার অনন্য কাজ করছে। শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধেও তার ওপরেই ভরসা!'

ময়না: 'সব শেষে আসতে চাই আমার নিজের উৎসাহ যে বিষয়ে। আমরা যারা বড় বড় মারাত্মক কিছু করতে চাইনা, শুধু একজন সাদাসিদা শিল্পী হিসেবে মানুষের মনে ঝিলিক জাগাতে চাই তাদের বিষয়ে। ইন্টেলিজেন্টদের জগতে একজন শিল্পীর কী আদর, তিনি কী ভাবে তাঁর মনের আকাঙ্খাগুলো রূপায়ন করবেন? তার ওপর কাজ করেছেন জগজ্যোতি চাকমা। তিনি নিজেও একজন খ্যাতনামা শিল্পী ও লোকশিল্প গবেষক।'

জগজ্যোতি: 'ময়না আর মন্ময় যা বল্‌ছিলেন আজ আমরা সবাই সর্বজনীন মৌলিক আয় ভোগ করছি, উৎপাদনে কিছু না করেই। আমাদের যা আবশ্যকীয় ব্যয় এবং পরিমিত সখ-আহ্লাদের ব্যস্ত তা ওর মধ্যেই চমৎকার কুলিয়ে যায়। তাছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানসিক উন্নয়ন, বিনোদন তাও তো প্রায় বিনামূল্যেই আমাদের দুয়ারে এসে হাজির হচ্ছে। তারপরও প্রায় সবাই কিছু না কিছু কাজ করতে আগ্রহী। আগের মত একটি পেশা পেলে অধিকাংশ মানুষ খুবই খুশি হন; যদিও ইন্টেলিজেন্টের কাজের যুগে পেশাজীবী হিসেবে সেখানে ফিট করার সুযোগ অল্প কিছু মানুষেরই হয়। তারপরও তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়- বিশেষ করে যাঁদের পড়াশুনা ও চর্চায় এমন কিছু থাকে যাতে তাঁরা মানবিক অপরিহার্য সক্ষমতাগুলো দেখাতে পারেন। অন্যরা নিজেরাই নিজেদের কাজ সৃষ্টি করে নেন। কেউ এর জন্য বেতন পান, কেউ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজের আনন্দেই কাজ করেন। আনন্দ, তৃপ্তি এবং অন্যের মুখে হাসি ফোটাবার যে কি সন্তুষ্টি তা এখনই ভাল বোঝা যাচ্ছে, আগে কখনো এমন করে বোঝা যায়নি। এক সময় বেতন কিংবা ব্যবসার মুনাফা ছিল অনেকের বাঁচার সম্বল, এখন আর তা নেই। বলা যায় এখন বেতন, মুনাফা, এসব এক রকম বিলাসিতা; তবে সেই বিলাসিতা কাউকে খুব বেশি অতিরিক্ত সুখ দিতে এখন পারেনা।

ওই বিলাসিতাকে অবশ্য আমাদের মত শিল্পীরা মূল্য দেন। যাঁরা একটু বেশি ব্যয় করতে পারেন তাঁরাই উচ্চতর মানব সৃষ্ট শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেন বেশি। গুণী আর্টিস্টদেরকে এখন ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির আর্টিস্টদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। এটি একটি অসম প্রতিযোগিতা। শিল্প-সচেতন মানব শিশু ইন্টেলিজেন্ট আর্টিস্টদের কাজ দেখে দেখে বড় হয়, কারণ অসংখ্য পরিমাণ মনে দাগ কাটার মত শিল্প এখন রং- তুলি বা ডিজিটাল আর্টের ভঙ্গিতে হয়, মাল্‌টিমিডিয়াতে হয়, ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে হয়। ইন্টেলিজেন্টের কল্যাণে এর বৈচিত্র অনেক, তাই মনের চাহিদা মেটাবার সব রকম খোরাক তাতে আছে। এর উপভোগ, ব্যাখ্যা, এমন কি নিজ থেকে চর্চা ও পরিবর্তন এখন সবার হাতের কাছেই। অন্য দিকে নিজে আর্টের সৃষ্টিকার মানুষ ওই গতিতে কাজ করতে পারেনা, তাঁর আইডিয়া ফ্যাক্টরির মত আসেনা, হঠাৎ সৃষ্টির মুহুর্তে ঝিলিক দিয়ে যায়। সেই সৃষ্টির অনেক পরিচর্যা দরকার হয়। সেই শিল্প

যখন সৃষ্টি হয় তখন তাকে আলাদা মূল্য দেয়া সম্ভব হচ্ছে কিনা সেটি গুরুত্বপূর্ণ।

আমার এবং আমার মত আরো অনেকের গবেষণা বল্‌ছে ইন্টেলিজেন্ট অধ্যুষিত জগতে মানুষের ভাবনার মধ্যে মানুষকে পাওয়ার আকাঙ্খাটি আগের থেকেও অনেক তীব্র হয়েছে। তারা যেমন অন্যের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষের ছোঁয়া বেশি বেশি পেতে চায়, তেমনি মানুষের নিজের মস্তিষ্কের সৃজনগুলোকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এ কারণেই মানুষের নিজের লেখা কবিতা বা উপন্যাসকে এখনো আসল সাহিত্য, নিজের আঁকা ছবিকে আসল ছবি, নিজের সৃষ্ট সঙ্গীতকে আসল সঙ্গীত হিসেবে দেখা হয়। সবাই জানে মানুষের বুদ্ধিই, তারই সৃজনশীলতা এক রকম ফিল্টার হয়ে ওই ইন্টেলিজেন্টের সৃজন হিসেবে আসছে বারোয়ারি ভাবে, যদিও তাও যথেষ্ট গুণ সম্পন্ন। তবুও মানুষ সরাসরি মানুষের মাথা থেকে শিল্প বের হতে দেখতে চায়, ওভাবেই তার কাঁচা ঘ্রাণ পেতে চায়। বহুকাল আগে যে কলের শাড়ি থেকে হাতের তাঁতে বোনা শাড়িকে একটি আলাদা কৌলীন্য দেয়া হতো এও যেন সেই ব্যাপার। এখনো লোকজ শিল্পই যে আসল শিল্প, এই ব্যাপারটিকে আমার শিল্পী ও গবেষক জীবনে আমি বোঝার চেষ্টা করেছি। এই মূল্যগুলো অর্থনীতির ভেতরে যেমন তেমনি মনস্তত্ত্বের ভেতরেও সুন্দর জেগে রয়েছে দেখলে ভরসা পাই। মানুষ তার সৃজনশীলতার হাল যেমন কারো হাত ছেড়ে দেয়না, নিজের জীবনের হালও সে রকম দেবেনা। সাধারণ বুদ্ধির ইন্টেলিজেন্ট কোনদিন আসলেও তার হাতেও সেই হাল ছাড়বেনা।’

মানবিক জীবন গড়ার স্কুল

শিশু শিক্ষা

ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির কল্যাণে আসা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন শিক্ষার পুরো ব্যাপারটিতেও বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ওটি বেশ বুঝা যায় এখন স্কুলের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অনেকেই এখন শিক্ষা জীবনটিকে দেখেন সহপাঠিদের সঙ্গে দলেবলে আপন জীবন সৃষ্টি হিসেবে, আর জীবনের পরবর্তী সময়টিকে দেখেন ওই সৃষ্টির ধারাবাহিকতা হিসেবে। আগে যেমন ভাবা হতো শিক্ষা জীবন মুখ্যত পরবর্তী পেশা ও জীবিকার জন্য প্রস্তুতি পর্ব মাত্র, এখন ব্যাপারটি তা নয়। এখন আগেরটি ও পরেরটির মধ্যে পার্থক্য কমে গেছে। দুটিই শেখার জীবন, দুটিই যাপন করার জীবন। শিক্ষা জীবনে ব্যাপারটা শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে ঘটে এই যা পার্থক্য। শুধু স্কুলের নিয়মিত শিক্ষকদের থেকে সহায়তা নয়, বাইরের স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদেরও সহায়তা– যেমন মাঝে মাঝে মানাজির পরিবারের এক এক সদস্যের।

যাঁরা শিক্ষা জীবন শেষ করে নিজস্ব জীবনে চলে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকের ডাক পড়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এসে ওই সহায়তা মাঝে মাঝে দিয়ে যেতে। নিজেদের নিয়মিত শিক্ষকদের বাইরেও যেন নানা মানুষদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা। এতে ছাত্রদের দিগন্ত বড় হয়; দীর্ঘদিনের মানব-অর্জনগুলো নানা মানুষের হাতে কী ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা সরাসরি তাঁদের কাছ থেকে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আরেকটি প্রবণতা হলো পুরো শিক্ষার সব পর্যায়কে স্কুল বলা। সেটি আগেও ছিল, তারপরও বিভিন্ন পর্যায়কে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এভাবেও বলা

হতো। এখন সবাই পুরোটা ‘স্কুলেই’ যায়, পুরোটাই সরকারী ব্যয়ে। পুরোটা স্কুল সবার জন্য বাধ্যতামূলকও বটে, তবে এতে আনন্দ ও স্বাধীনতা এতো বেশি যে বাধ্যতামূলক কথাটির তেমন কোন অর্থ হয়না।

অতিথি শিক্ষক বা স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক হবার ব্যাপারটি অবশ্য একেবারে ঐচ্ছিক নয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ ডাকলেই যে কাউকে কিছু সময়ের জন্য এ দায়িত্ব পালন করতেই হয়। বিশেষ বিশেষ ভাবনায় ও কাজে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন, উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন এমন সব নাগরিককে সাধারণত স্থানীয় স্কুলের জন্য এভাবে আহ্বান জানানো হয়। তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ হলেও এটিকে সাধারণত সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন। এ যেন অনেকটা জুরির বিচারের জন্য যে কোন নাগরিককে জুরিতে ডাকার মত, তাঁকে সাড়া দিতেই হয়; দেয়াটাই সবাই প্রত্যাশা করে। অবশ্য অনেক সময় এরকম আহ্বান খুব সহজ হয়ে পড়ে, কারণ এমনি অনেক মানুষ আগে থেকেই স্কুলে কাজ করার জন্য তাঁদের নাম কর্তৃপক্ষকে দিয়ে রাখেন নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করে। মানাজির পরিবারে সবাই এমনি নিজেরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সোফিয়া, শান্ত, এবং বিশেষ করে ময়না। সে তার নিজের শিক্ষা জীবনকে এভাবে জীবন্ত রাখতে চায়। রাহিলের আগ্রহও কম নয়, তবে দূরে থাকে বলে তার সুযোগ কম। স্কুল জিনিসটিই এমন যে ওখানে ময়নার মা বাবার মত উচ্চ পেশাজীবী মানুষের অভিজ্ঞতাটি যেমন প্রয়োজন তেমনি ময়নার মত একজন তরুণী আর্টিস্টেরও প্রয়োজন। তাঁদের মত মানুষ যখন স্বেচ্ছাসেবী হতে চান, স্কুল তখন তা অত্যন্ত খুশি হয়ে লুফে নেয়।

ময়নার স্কুল-শিক্ষকতার কায়দাটি দেখা যাক। ওর এবারকার সময়টি বেশি কেটেছে শিশু শ্রেণীতে। এ শিশুরা এমন একটি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে যে তার চারপাশে মানুষ, কম্পিউটার, রোবট ইন্টেলিজেন্ট, পর্দায় ইন্টেলিজেন্ট সবাই পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে। যদিও সব কিছুর পেছনে রয়েছে মানুষ, সেটি ছোট শিশুর বোঝার কথা নয়। তাই স্কুলের একটি কাজ হলো শিশুর মানব-সত্তাকে সব সময় প্রধান করে তোলা; বাকি সব কিছুকে ওই মানুষেরই এক একজন হাতে গড়া সহকারী হিসেবে নিয়ে এসে। সে মানব-সত্তার সহায়ক হিসেবেই ওই শেষেরগুলোকে দেখবে এটিই প্রত্যাশা। মানব-সত্তা প্রত্যেকের মনের ভেতর থেকে যা গুঞ্জন করে আসে সেই জিনিসগুলোকে স্কুল প্রকাশিত

হতে দেয়– গান গাওয়া, নাচা, ছুটাছুটি, খেলাধূলা, গল্প শোনা ও বলা, ভূমিকা-অভিনয় নানা মানুষকে অনুকরণ করে। এসবের মধ্য দিয়েই শিশুর শেখা। ইন্টেলিজেন্টকে এই পর্যায়ে তাই গৌণ রাখা হয়।

ওখানে ময়নার মত স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হলো কেন? স্কুলে কি নিয়মিত শিক্ষক নেই? অবশ্যই আছে, বরং বলতে হবে সংখ্যায় একটু বেশিই আছে। যে অল্প কিছু কাজে ইন্টেলিজেন্ট কর্মীরা এখনো সুবিধা করতে পারেনি তার মধ্যে খুব ছোট শিশুর শিক্ষকতা একটি। তাই অনেকেই এই চাহিদাটির সুযোগ নিয়ে থাকেন। তারপরও ময়নার মত অতিথি শিক্ষকের কাজটি কী? অতিথি শিক্ষকের একটি উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নতুন নতুন মানুষের পরিচয় হওয়া, নিয়মিত লেখাপড়াটি নূতনত্বের জন্য তাঁদের দৃষ্টিতেও দেখা। আবার তার বাইরেও অতিথি শিক্ষকের সঙ্গে নানা আলাপ করারও সুযোগ হয়– যেমন ছোট শিশুরা তাঁদের থেকে নতুন ধরনের গল্প শোনা। ওটি ময়নার জন্যও একটি অভিজ্ঞতা। প্রত্যেক শিশুর সঙ্গে আলাদা করে পরিচয়ের সুযোগ হয়। ওদের প্রত্যেকে ময়নার কাছে নতুন এক ব্যক্তিত্ব– এক দল শিশু বলে সবাইকে মিশিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। এই ব্যক্তিগত মানবিক যোগাযোগটি আজকের পরিস্থিতিতে শিশুর মনস্তত্ত্বের জন্য খুব সহায়ক।

ময়না: 'রুবিনা তুমি কী রকম গল্প পছন্দ কর- আমি পাখির গল্প বলতে পারি, বিমানের পাইলটের গল্প বলতে পারি, সমুদ্রে ডুবুরির গল্প বলতে পারি। তুমি কোন্‌টি শুনতে চাও?'

মজার ব্যাপার হলো এখানে পাখি, পাইলট আর ডুবুরি তিনটি প্রিয় চরিত্র হতে পারে কিন্তু তাদের নিজস্ব সত্তায় মৌলিক পার্থক্য আছে, ভাল লাগার মধ্যে সেটি যেন স্পষ্ট হয়। পাখি একটি প্রাণী, রুবিনার মত মানুষ নয় তবে বেশ তুলতুলে, নরম, গান গায়– রুবিনার খুব অন্তরঙ্গ হতে পারে মানুষের মতই। তার মতো আরো পাখি ও আরো প্রাণী আছে যাদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হতে পারে। বিমানের পাইলট কিন্তু একজন ইন্টেলিজেন্ট যার চেহারা আছে, তাঁকে পর্দায় দেখা যায়। তাঁর অনেক বুদ্ধি, অনেক কুশলতা, অনেক সাহস। পর্দায় তাঁকে হেসে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখা যায়, এমনকি রুবিনার মত ছোট মেয়ের সঙ্গেও। কিন্তু হালকা ভাবে এটিও বুঝিয়ে দেয়া হয় যে পাইলট তার এতো চমৎকার চরিত্রটি পেয়েছে মানুষ বিজ্ঞানীর কাজের কারণে।

ময়নার গল্পে থাকে কী ভাবে পাইলট ঝড়ের মধ্যে বিমানকে শান্ত রাখেন। তবে বড় কথা হলো মানুষও পাইলট হতে পারে। রুবিনাও পারে। অন্যদিকে সমুদ্রের ডুবুরি একজন মানুষ, কিন্তু তিনি সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে চলতে পারার মত যন্ত্রপাতি গায়ে লাগিয়েছেন। ওভাবে যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ এমন জায়গায় গিয়ে এমন কাজ করতে পারেন যা সাধারণত পারার কথা নয়। ডুবুরি তাই মাছের রাজ্যে গিয়ে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারেন। রুবিনাও ওই রকম প্রযুক্তির সাহায্যে নিজকে ক্ষমতায়িত করতে চাইবে। এরা তিনটি আলাদা সত্তা– প্রত্যেকের রুবিনার সঙ্গে আলাদা আলাদা রকমের সম্পর্ক। এখন দুনিয়াটাই এমন যে শিশুকাল থেকে তাদের পার্থক্যগুলো স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন– আর বোঝা দরকার যে সবগুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষের সচেতন পছন্দ, তার খেয়াল, তার আইডিয়া।

ইচ্ছে করলেই যেহেতু দৈনন্দিন জীবনে মানুষ আর ইন্টেলিজেন্টের মিশ্রণ থেকে একে অপর থেকে পুরোপুরি পৃথক করা যায়না, কাজেই মানুষের মানবিক অনন্যতাগুলোকে গোড়া থেকে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এটি এক একজন নতুন মানুষ এসে তাঁর অভিজ্ঞতাটি দিয়ে নতুন নতুন ভাবে করতে পারলে আরো ভাল।

একটু বড় শিশুদের সঙ্গে ময়না ভূমিকা-অভিনয় করে– কখনো কোন মানুষের চরিত্রের, কখনো ইন্টেলিজেন্টের, কখনো কোন প্রাণীর। ময়না নিজেকেও একটি চরিত্রে পরিণত করতে পারে; অথবা ধরা যাক একজন মানুষ বিজ্ঞানীকে, অথবা প্রচলিত গল্পের কোন চরিত্রকে– যেমন সুপারম্যানকে। মানব-চরিত্রের মত ইন্টেলিজেন্ট-চরিত্রেরও কোন অভাব নেই। যদি ওরা পরিচিত রোবট-চরিত্র হয় যেমন শপিং মলের দোকানের অভ্যর্থনাকারীর মত, তা হলে তো শিশুর জন্যই অভিনয় বেশ সহজ হয়, অথবা তা পাইলটের মত পর্দার চরিত্রও হতে পারে। আর প্রাণীর ক্ষেত্রে তো শিশু মনের কল্পনা মিশিয়েই পাখি হতে পারে– পাখির কথা বলা কল্পনা করে শুনতে চায় শিক্ষক পাখি হয়ে কী বললো। কল্পনা জাগিয়ে তোলাটাও ভূমিকা অভিনয়ের একটি উদ্দেশ্য। সব কিছুতে স্পষ্ট করার চেষ্টা থাকে এরা কী ভাবে একে অন্যের থেকে আলাদা। কল্পনাটি যে শুধু মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব সেটিও এভাবে এক সময় স্পষ্ট হয়ে যায়। কল্পনাতে শিশু নানা মানুষ হয়। তারপর হয়তো একদিন ওই

কল্পনার মানুষটিই হাজির হন আরেকজন অতিথি শিক্ষক হিসেবে– একজন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, কিংবা ডুবুরী। তখন গল্পটি তাঁর কাছ থেকেই সরাসরি শুনতে পারে ওরা।

ময়না যে ওর বাবা-মা-ভাইয়ের সঙ্গে কিছুদিন আগে নিরক্ষীয় বাদল বনের ভেতরে গিয়েছিলো, নানা প্রাণীর সাক্ষাৎ পেয়েছে, স্বয়ং ওরাংউটানের বাচ্চার সঙ্গে খেলা করেছে, সে কাহিনীতে সব থেকে বেশি উজ্জীবিত হবে তো তার এই ছাত্ররাই। ভ্রমণটি ময়নার কাছে একটি অর্থ পেয়েছিলো, তার শিল্পবোধকে জাগিয়ে তুলেছিলো। সেটি এখন নতুন ভাবে আরো অর্থ পাবে এখানে, এই স্কুলে; এখানেও শিল্পবোধের আরেকটি শিশু সংস্করণ। ময়না ইচ্ছে করলেই এটিও জাগিয়ে তুলতে পারবে– হাজার হলেও সে তো সবার জন্য আর্টিস্ট। আর বড় কথা হলো এই সব কিছু খুবই মানবিক। মানুষই মনকে বড় করে বড় বড় ভূমিকা নিচ্ছে।

ক্লাসে স্কুলের নিয়মিত শিক্ষকরাও একই কাজ করছেন, তবে তাতে বই থেকে পাঠক্রম অনুসরণের একটি গতানুগতিকতা আছে। সেটিও এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে ময়নার মত অতিথি শিক্ষক মাঝে মাঝে নতুন হাওয়া এনে দিচ্ছে। দশ বছরের শিশুদের অংক শেখাচ্ছে ময়না। ওটি করতে গিয়ে ময়নাকেও অনভ্যস্ত কাজ করতে হচ্ছে– আজকাল এসব যোগ-বিয়োগ-গুণ বা আরো সহজ বা জটিল কোন অংক তো কেউ এভাবে মনের বিশ্লেষণে করেনা– সবই যন্ত্রে করে। কিন্তু হাজার বছর ধরে মানুষের মাথায় মাথায় যে অংক তৈরি হয়েছে– সেই যাকে বলে 'প্রথম নীতি'– সেভাবে নিজে নিজে করতে শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে; এর কোন বিকল্প নেই। মাথা খেলাতে পারাটাই তো মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। ময়না কিন্তু এটি সোফিয়া বা শান্তর চেয়ে আরো স্বচ্ছন্দ ভাবে শেখাতে পারে। কারণ ওদের মতো সে দিনরাত ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিয়ে মশগুল থাকেনা। আর্টিস্ট হিসেবে সে অনেক বেশি মানববাদী। সে খুব ভাল বুঝতে পারে যেই চিন্তাগুলোর জন্ম মানুষের মাথায় মাথায়, সেগুলোকে এখনো শিক্ষকের মাথা থেকে সরাসরি ছাত্রের মাথায় যেতে হবে যন্ত্রকে আপাতত এর বাইরে রেখে। নিজের কাজেও তার আর্টের ঝিলিক তার মাথা থেকে আর্ট-উপভোগীর মাথায় যায়, তাই ব্যাপারটি সে ভালই বোঝে।

তবে অংক মাথা থেকে করতে যতই স্বচ্ছন্দ বোধ করুক এই ময়নাকেও ছোটবেলা থেকেই স্কুলে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখতে হয়েছে। সাধারণ অংকের সঙ্গে সঙ্গেই ওভাবে নিজের ডিজিটাল জগৎ নিজের হাতে অ আ ক খ এর মত তৈরি করা যেন সবার জন্য প্রায় দ্বিতীয় প্রকৃতির মতো হয়ে যায়, সেটিই ছিল লক্ষ্য। ওই ছোটরা প্রোগ্রামিঙের মধ্যেই নিজেদের মজা আবিষ্কার করেছে, যার ফলে এক সময় ওই ছাত্র অবস্থাতেই প্রায় সবাই মেশিন লার্নিঙের কায়দা কানুন রপ্ত করতে বেশি দেরি করেনি।

মাথায় জমা রেখেছি

স্কুলের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী এমন একটি বয়স্ক জীবনের দিকে যাচ্ছে যেখানে একটি কাজকে অর্থকরী পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ সবার হবেনা। মানব জাতির আধুনিক চাহিদা মেটাবার জন্য যে গতানুগতিক কর্মযজ্ঞ সেখানে মানুষের নিজের ভূমিকা দারুণ কমে গেছে। অবশ্য যেই গতানুগতিক অংশ কমেছে সেটি কমাটাই ভাল হয়েছে। কর্মযজ্ঞের সারবত্তাগুলো, কাণ্ডারীর কাজগুলো কিন্তু মানুষের জন্য রয়ে গেছে, হয়তো অনেক দিন থেকেও যাবে। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কীর্তিকলাপের সৃষ্টিশীল আনন্দময় দিকগুলো এবং বিশেষ করে তার বুনিয়াদি দিকগুলো মানুষের হাতে রয়েছে, এবং থাকা দরকার। বহু হাজার বছর ধরে মানুষ যা সৃষ্টি করেছে– দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, সব কিছু এর অন্তর্গত। তেমনি প্রযুক্তির বড় বড় সক্ষমতা, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের এবং নিজের জীবন গড়ার কৌশলগুলোর মূলমন্ত্র মানুষের হাতে থাকা চাই। এগুলোর বীজ সম্ভাব্য সব তরুণদের মাথায় বপন করে রাখতে হবে- কারণ এগুলোই মানব জাতির পুঁজি।

কর্মযজ্ঞে ব্যবহারের সময় ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির ওপর তার কতখানি ছেড়ে দেয়া যায়, ছেড়ে দেয়া উচিত– সেটি পরের কথা। এমন কি আগের কিছু অভ্যাস বা দক্ষতা যেমন গাড়ি চালানো, এখনো তা সবাই রপ্ত করে। কিন্তু এখন তা করে জরুরি প্রয়োজন হিসেবে নয়, বিনোদন বা স্পোর্টস হিসেবে। অনেকে বিমান চালনাও রপ্ত করে ওই হিসেবেই। এর কোনটাই এখন আবশ্যিক নয়, কারণ তা ইন্টেলিজেন্টরা করে। কিন্তু ভাল স্পোর্টস হওয়া

ছাড়াও এটি এখনো ভাল পেশাও হতে পারে– অনেক ক্ষেত্রে গাড়িতে বা বিমানে তত্ত্বাবধায়ক চালক হিসেবে চোখ রাখার কাজে, এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে। কাজেই নিজের কোন দক্ষতার ওপর মুঠো আলগা করা চলবেনা, তা হলে ইনটেলিজেন্ট বুদ্ধিকে এসবে আরো উন্নত করে নিজেদের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও মানুষের মুঠো আলগা হয়ে যাবে।

অতিথি শিক্ষকরা ওই সব উদ্দেশ্য সাধনে অনেকটা সহায়তা করতে পারেন। চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে সোফিয়ার আদর এ জন্য অপরিসীম। তাঁর মত মানুষের যে তরুণদেরকে অনেক কিছু দেবার আছে তার অন্যতম কারণ হলো শিক্ষা এখন সুনির্দিস্ট কোন পেশার দিকে নিয়ে যাবার জন্য নয়, একটি সম্পূর্ণ মানব জীবন যাপন করার জন্য। পেশা হয়তো অনেকের থাকবেই না, কিন্তু জীবনের নেশা যেন সবার থাকতে পারে সেটি নিশ্চিত করাটাই বড় লক্ষ্য। তাই ওরকম নেশাগুলো নিজ থেকে বেছে নিয়ে সেগুলোর প্রেমে পড়ে যাবার বিস্তর সুযোগ এর মধ্যে থাকতে হচ্ছে। তা ছাড়া যে কোন সময় যে কোন পরিস্থিতিতে চাহিদা দেখা দেয়া একটি পেশার দিকে যাবার জন্য পুনশিক্ষা, পুনপ্রশিক্ষণ নেবার জন্য উপযুক্ত পটভূমি শিক্ষা যেন প্রায় প্রত্যেকের থাকে সেটিও একটি বড় কথা।

একদিকে উন্মুক্ত নাগরিকের কাজ, বিশেষ করে অন্য মানুষের উপকারার্থে উন্মুক্ত কাজ; অন্যদিকে সম্ভাব্য যে কোন পেশাতে যাওয়ার সুযোগ– এই দুটিকে চর্চায় রাখতে হয় শিক্ষার মধ্যেই। ইন্টেলিজেন্ট উন্নয়নের ওপর নিজের আত্মবিশ্বাসী মুঠো বজায় রাখার প্রত্যয়টিও প্রত্যেক তরুণের থেকে কাম্য। শিক্ষা যে এখন জীবনব্যাপী শিক্ষা সে কথা মনে রেখেই এতে সোফিয়ার অবদানের প্রশ্ন আসে। উদাহরণ স্বরূপ সোফিয়া যতটা সময় স্কুলকে দিতে পারেন মেরিটাইম ডিজাইন সম্পর্কে উপযুক্ত পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে ধাপে ধাপে একটি কোর্স দেন। এতে আধুনিক জাহাজ শিল্পের লক্ষ্যগুলোকে সামনে রাখেন। তিনি তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠ ডিজাইনগুলো কেন কী ভাবে করেছেন সে অভিজ্ঞতা খুবই ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি দিয়ে তাদের মত করে তাদেরকে বোঝান। তাদেরকে বিষয়টিতে যে ভাবে নিমজ্জিত করেন তা তাঁর অভিজ্ঞতা ও আবেগ ছাড়া সম্ভব হতোনা। যত ছাত্র এর সুবিধাগুলো নিয়ে থাকে তাদের সবাই যে পরবর্তী জীবনে পেশা বা সখের বশেও জাহাজ নির্মাণ বা সমুদ্র

যাত্রাকে বেছে নিতে পারবে তা নয়। কিন্তু এটি তাদের মনোরাজ্যে যে পরিবর্তন আনবে তা অসংখ্য ভাবে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। এটি কোন এ সম্পর্কিত পেশা বা সখের দিকে অবশ্যই নিয়ে যেতে পারে অনেককে, বাকিদেরকে ভিন্ন ভাবে ডিজাইনের আর্ট ও সায়েন্স, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আরো জ্ঞানার্জন ও সক্রিয়তার দিকেও নিয়ে যেতে পারে।

স্কুলে শিক্ষায় অবদান রাখার ক্ষেত্র সোফিয়ার আরো অনেক রয়েছে। এর একটি বড় অংশ হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট সফটওয়্যার গড়ে তোলাতে কাজ করা। ছোটদের সাধারণ কম্পিউটারে প্রোগ্রামিং শেখা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর গবেষণার কাজের ইন্টেলিজেন্ট সফ্‌টওয়্যার উন্নয়ন পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ে ছাত্রদেরকে হাতে ধরে নিয়ে যেতে তিনি পারেন। শিক্ষার একটি আদি মূলনীতি হলো এর দ্বারা যেন আগুনের শিখা থেকে শিখা জ্বালানোর মত ব্যাপার ঘটে। সোফিয়ার মাথায় জাহাজ বিজ্ঞান বা ইন্টেলিজেন্ট বিজ্ঞানের যে চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তা কোন ভাবে পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে না দিতে পারেন তা হলে এর সার্থকতা কোথায়? ইন্টেলিজেন্ট কোন দিন সাধারণ ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিতে উন্নীত হবে কিনা, হলে কোন্ পথে সেই অগ্রগতি ঘটবে সেই চিন্তার বিষয়েও তিনি শিক্ষার্থীদের খুবই জনপ্রিয়।

এই একই প্রশ্নে শান্তও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনিও একেবারে গোড়ার প্রোগ্রামিং শেখায় ছাত্রকে যেমন একটি খেলার আনন্দে স্বাগতম জানাতে পারেন, তেমনি একটি কারখানায় মানুষ কর্মী ও ইন্টেলিজেন্ট কর্মীর পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলো একেবারে সফ্‌টওয়্যার বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গিতে শেখাতে পারেন। শান্তর মত একজন বাস্তবায়নকারীর কাছ থেকে এসে সেটি অনেক বেশি আনন্দ ও উৎসাহদায়ী অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন হলো এভাবে অভিজ্ঞ অতিথিরা তাঁদের মত করে যা শেখান বা যেভাবে উদ্দীপ্ত করেন তা একটানাও হয়না বা সব সময় নিশ্চিত ভাবে পাওয়াও যায়না। একে স্কুলের নিয়মিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সঠিক ভাবে সংযুক্ত করাটিও একটি বড় কাজ। এ কাজটি নিয়মিত ভাবে স্কুলের বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হচ্ছে, অতিথি শিক্ষকদের নিজেদের বর্ষ-পরিকল্পনার সঙ্গেও। শিক্ষা জিনিসটি অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলেই এতকিছু আয়োজন সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্ব সমিতিতে একটি বক্তৃতায় এর নির্বাচিত সদস্য শান্ত আজ স্কুলে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কতগুলো কথা তুলে ধরেছেন।

শান্ত: 'চেষ্টা করেছি শৈশব থেকে তারুণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছাত্রদের শিক্ষা জীবনের মধ্যে আমার চিন্তা ভাবনার কিছু কিছু সঞ্চারিত করতে। এক সময় মানুষ সব কিছুকে দেব দেবীর খেয়াল হিসেবে গ্রহণ করতো। আর্টস ভাবনায়ও সেই ভঙ্গিটিই গুরুত্ব পেতো। কিন্তু অন্তত ইউরোপীয় রেণেষাঁর সময় থেকে আর্টের মধ্যেও আমরা মানব-কেন্দ্রিকতাই সব কিছুর মূলে রাখতে শিখেছি। বিজ্ঞানে মানব-কেন্দ্রিকতা অনেক আগে থেকেই ছিলো। শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে রেণেষাঁর ওই মূলমন্ত্রটি দেশে দেশে প্রভাব রেখেছিলো। ওটি এখানেও মানুষকে নিজের ভালমন্দের জন্য নিজেকে দায়ী করতে শিখিয়েছিলো। এটি মানুষকে সব কিছুর হাল ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু হালের ওপর এই হাত আল্‌গা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাটি এসেছে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মহাবিপ্লবের পর– ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি যখন ক্রমে ক্রমে সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে জীবিকা অর্জনের সংগ্রাম থেকে মুক্তি দিতে লাগলো। সব কিছুর পেছনে এখনো যে মানুষের বুদ্ধিই কাজ করছে– এ কথাটিই যেন ভুলার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনেকের কাছে এমনো মনে হতে পারে যেন জীবিকার ও সুযোগ-সুবিধার সব কিছু আসমান থেকে ঝরে পড়ছে। ইন্টেলিজেন্টের নীরব স্বয়ংক্রিয় কাজ এক রকম ইন্দ্রজালের মত মোহাচ্ছন্নতা সৃষ্টির সুযোগ রাখে।

সেটি যেন না হতে পারে সে জন্য সকল শিক্ষার্থী শৈশব থেকে তারুণ্যে যে শিক্ষা জীবনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সেখানেই চেষ্টাকে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা জীবন শেষে মানুষ নিজের প্রবণতা অনুযায়ী নানা পেশা ও কাজের চর্চায় যাবেন সেটি স্বাভাবিক। অনেককেই সেটি নিজ উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় করতে হবে, সেটিও এখন স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষা জীবনে তারা সবাই মানুষের সব রকমের সক্ষমতার বিষয়ে জানবে এবং তা হাতে কলমে শেখার কাজের মধ্য দিয়ে যাবে। এ সক্ষমতাকে কী ভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে আগামী দিনের উন্নয়নে কাজ করতে পারবে সেই গবেষণা ও চর্চাটিও ওসবের অন্তর্গত হবে। সব কিছুতে মানুষের পূর্ণ দায়িত্ব নেবার কথাটি মনের মধ্যে খচিত করে দেবার এটিই সময়। তাই এ কাজটিকে স্কুলের শিক্ষকবর্গ ও স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর ছেড়ে দেয়াটাই যথেষ্ট নয়। পুরো সমাজকে এর দায়িত্ব নিতে হবে,

সমাজে যাঁরা এতে অবদান রাখতে পারেন তাঁদের এগিয়ে আসা উচিত। আমি সে জন্যই সুযোগ পেলেই স্কুলে ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহ বোধ করেছি। তাছাড়া প্রচুর আনন্দও পাই মানব-কেন্দ্রিকতা নিয়ে তরুণদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে।'

কোন মানুষের জীবন এখন অগ্নিপরীক্ষার মুখে নেই, কারণ জীবিকার জন্য তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায়না আর কখনো। ঠেকে যেতে দেয়া হয়না। শিক্ষার্থীরাও সে রকম অগ্নিপরীক্ষায় নেই। শিক্ষা শেষে চাকরি পেতে হবে, ব্যবসায় সফল হতে হবে, এ জন্যই লেখাপড়া, নইলে এর কোন মানে হয়না, এমন ধারণা এখন অচল। শিক্ষা এখন সত্যি আনন্দ-শিক্ষা হতে পারে– অর্জনের আনন্দ, জানার-বোঝার-চর্চার আনন্দ। আর তার মূল লক্ষ্যটি হলো মানবিক সক্ষমতার জয়গান। এই সক্ষমতার অনেকটা লক্ষ বছরের মানব বিবর্তনের ফল। আবার সেই ফল ব্যবহার করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের হাজার বছরের সাধনাও এর অন্তর্গত। ইতিহাসের ও বিজ্ঞানের উভয় দিক থেকে এটিও শিক্ষার্থীদের জন্য অতিথি- শিক্ষক সোফিয়ার একটি চমৎকার উপহার– যা তাদের সাধারণ ক্লাসকে ছাড়িয়ে যায়। এমনি একটি ক্লাসের ভূমিকা-পর্ব দেখা যাক।

সোফিয়া: 'আমি ছোটবেলায় চট্টগ্রামের সমুদ্রতীরে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। তখন আমার বিশেষ মজার একটি ব্যাপার হতো ওখানে যাবার পথে বন্দরের জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজগুলো দেখা। বেশির ভাগ পুরানো ধাঁচের তেল চালিত জাহাজ, এর মধ্যে কিছু কিছু ডানাপাল লাগানো জাহাজ। আমার কিন্তু বেশি পছন্দ হতো ওই পালেরগুলোকে। বন্দরে ভিড়ানো অবস্থায় ওই পাল খুব কম মেলা থাকতো বনে জৌলুশ তেমন হতোনা, তবুও যেটুকু দেখতাম ভাল লাগতো। এগুলো খুব কাছে থেকে দেখা। তবে সমুদ্রতীর থেকে দূরের পুরো জৌলুশে সব পাল মেলা জাহাজও দেখতাম, তখন ইচ্ছে করতো ওই জাহাজে চলে যাই।'

শিক্ষার্থী ১: 'সে জন্যই কি আপনি বড় হয়ে জাহাজ ডিজাইনার হয়েছেন?'

সোফিয়া: 'না তা বলা যাবেনা। সেই ছোটবেলা থেকে আরো কত কিছুতেই তো চমৎকৃত হয়েছি। স্কুলে যখন নিচের দিকে ছিলাম স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া

হয়েছিলো "জীবন তরী" নামে একটি প্রদর্শনী জাহাজ দেখতে, ওই বন্দরে যা কয়েক মাসের জন্য ভিড়ে ছিলো। ওটি বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন রোধ কর্তৃপক্ষের একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী ছিল– বন্দর থেকে বন্দর ঘুরে ঘুরে সবার কাছে জলবায়ু পরিবর্তন রোধের সর্বশেষ প্রচেষ্টাগুলো তুলে ধরছিলো। ওখানে গ্রীন হাউস গ্যাস ও ভূপৃষ্ঠ উষ্ণায়নের আবিষ্কার, এর প্রতি একদিকে অবিশ্বাস, অন্যদিকে একে দমনের জন্য আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠা থেকে শুরু করে ওই দিনে পৌঁছার পুরো ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছিলো। এটি এই ছোট মেয়ের কাছেও হৃদয়গ্রাহী ও চিন্তার বিষয় হয়েছিলো। আজও ওটি মনে দাগ কেটে আছে। মনে পড়ে– দেখানো হয়েছিলো এই "জীবন তরী" জাহাজই কত চেষ্টা করছে যাতে পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি কারণ একেই না হতে হয়– এজন্য তেলের বদলে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎস ব্যবহার করেছে। ওতে আরো একটি জিনিস প্রথম দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই। পুরো জাহাজে, পুরো প্রদর্শনীতে যাদের দেখলাম তারা সবাই ইন্টেলিজেন্ট রোবট- কেমন মজা করে, আবেগ দিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলো। আমাদেরকে বাচ্চা মানুষ দেখে বিশেষ আদরের ভাষায় কথা বল্‌লো। ছুটির দিনে আরেকটি জায়গায় প্রায়ই যেতাম– সেটি চিড়িয়াখানা। বিশাল যে জায়গাটি শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংউটানের জন্য আলাদা করা ছিলো সেটিতেই আমার সময় কাট্‌তো বেশি। কারণ একটাই, ওরা এতো বেশি মানুষের মত। মনে হতো আমি যা ভাবছি সে চিন্তা তার মাথায়ও আছে।'

শিক্ষার্থী ২: 'এগুলোর কোনটিই যদি আপনি বাস্তবে না দেখতেন, তা হলে কি আজ যে আপনি জাহাজ আধুনিক করার বিজ্ঞান, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের বিজ্ঞান এবং বিবর্তন বিজ্ঞান এই সব ক'টাতেই এতো নাম করেছেন, সেসব দিকে আপনার উৎসাহ কি জন্মাতো? আমি অন্য জেলা থেকে সম্প্রতি এখানে এসেছি, জাহাজ, সমুদ্র ইত্যাদি কিছুই আমার আগে দেখা হয়নি, যদিও ভিডিয়োতে ও সিনেমায় দেখেছি। সেখানে দেখেও তো প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি।'

সোফিয়া: 'অবশ্যই। মনের মধ্যে কৌতুহল থাকলে স্ফুলিঙ্গটি নানা দিক থেকে আসতে পারে। তবুও হয়তো সেই ছোটবেলার আমি সৌভাগ্যবান কারণ লম্বা চুল-দাঁড়ি-লোম নিয়ে বিরাট দেহের মূর্তিমান শিম্পাঞ্জিটি যখন তার লাল চোখটি আমার চোখের দিকে রেখে পিটপিট করে তাকিয়ে ছিলো সে মুহুর্তটিকে

কখনো ভুলবোনা। ওর মাথার চিন্তা এবং আমার মাথার চিন্তা যেন তখন এক হয়ে গিয়েছিলো। ছোটবেলা থেকে সবকিছু মাথায় খেলিয়ে করার চেষ্টা করেছি।’

শিক্ষার্থী ৩: ‘শেষ পর্যন্ত আপনি যখন বিজ্ঞান গবেষণা করেছেন তখন তো ইন্টেলিজেন্ট সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে করেছেন। একবার তাকে বুঝিয়ে দিলে বাকি কাজ সেই করেছে। তা হলে এই যে বল্‌লেন সব কিছু নিজের মাথায় খেলিয়ে করেছেন সেটি কীভাবে সম্ভব হলো?’

সোফিয়া: ‘ঠিকই বলেছো। যখন থেকে আমরা নিজেদের কাজ যন্ত্রকে করতে দিয়েছি তখন থেকেই কাজের মধ্যে মৌলিক মনোসংযোগ কিছুটা হলেও হারিয়ে ফেলেছি। এটি শুধু আজ নয়, বহুকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে হয়েছে। ১২ শতকে আরব জ্যোতির্বিদের তৈরি এক রকম এনালগ কম্পিউটার “অ্যাস্ট্রোলেব” যখন ইউরোপে খুব জনপ্রিয় হলো তখন আকাশে খোঁজাখুজি না করে ওটি দেখেই যে কোন জায়গার আকাশে বিশেষ বিশেষ তারাকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হলো। বহু শত বছর আগের প্রযুক্তি সেটিও হয়তো আকাশের দিকে মনোসংযোগের প্রয়োজনীয়তাটি কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিলো। আজ ইন্টেলিজেন্ট কাজ করার সময় তার কাজের মধ্যবর্তী নানা ধাপ অনুসরণ করার ক্ষমতা আমার মস্তিষ্কের নাই। কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট না থাকলে এই সব ধাপ মস্তিষ্কেই হতো। এই যে যন্ত্রের হাতে ছেড়ে দেয়া এটি আমাদের জন্য শুভ নয়, তবুও দিতে হয়েছে কারণ তার গতি দৌড়বিদ স্প্রিন্টারের গতি, তুলনায় আমার মাথার গতি কচ্ছপের। এ কারণে তাকে অনুসরণ করতে পারিনা, কিন্তু তার পুরো চালাকি আমাদের মাথা থেকে বের করে আমাদের কল্পনায় ধারণ করতে পেরেছি। নিজের আনন্দের জন্যই সেটি করাটি খুব জরুরি। আমি সেটির কথাই বলেছি। তোমরাও এক মুহুর্তের জন্য মাথা থেকে কল্পনা ছাড়বেনা, বিবর্তন সেখানে যে কল্পনা শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে। আপাতত কোন ইন্টেলিজেন্টের মধ্যে সে রকম কিছু থাকার কোন সম্ভাবনা নেই।’

শিক্ষার্থী ৪: ‘আমি মনে হয় ব্যাপারটি কিছুটা বুঝেছি। এই যে মাথা খেলানো, সেটি বুঝি ক্লাসের পর আড্ডার ছলে যখন আমরা কয়েকজন ক্লাসের কোন বিষয় আলোচনা করি। কেউ যদি তখন ডিভাইসে কোন এ্যানিমেশন দেখাতে চায় তখন বিরক্তি লাগে; কারণ নিজের মাথা খেলানো আড্ডার তালটাই তখন

ডিভাইসের কারণে কেটে যায়, সেই মানবিক শিশুসুলভ কল্পনাটি থাকেনা। আপনার গবেষণার অনেক সময় কাটে জাহাজে, ইন্টেলিজেন্ট সফ্টওয়্যারের সান্নিধ্যে। সেখানে কি ওই আড্ডার মত অবকাশটি থাকে কল্পনার সুযোগ পাওয়ার জন্য?'

সোফিয়া: 'অবশ্যই থাকে। তা না হলে তো জাহাজে থাকতেই পারতামনা। জাহাজে একটি বড় সময় কাটে মানুষ বিজ্ঞানী যে ক'জন আছেন- অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাপ্টেন– তাদের সঙ্গে চিন্তার ঝড় তুলে। যে কেউ বল্‌বেন ওটি নিখাদ আড্ডা। সব সময়তো ইন্টেলিজেন্টদের বিশ্লেষণের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়; কিন্তু ওই আড্ডার সময় পুরো জিনিসটি মানবিক ভাবে বিবেচনায় আনতে পারি, বেশ খানিকটা আনন্দ-রসিকতার সঙ্গে। ওই নির্ভেজাল মানবিক আনন্দ, তুমি যার কথা বল্‌লে।

তোমাদেরকে একটি কাজ দিই। মনে করো তুমি একটি জাহাজে অফিসারের কাজ করছো। এখন তো জাহাজ প্রায় সর্বাংশে ইন্টেলিজেন্ট অফিসার-নাবিক- রোবট শ্রমিক ওরাই চালাচ্ছে। তোমরা যে ক'জন মানুষ জাহাজে আছ ঠিক করলে আগেকার দিনে ইন্টেলিজেন্টরা দায়িত্ব নেবার আগে যেভাবে মানুষ নাবিকরা জাহাজ চালাতো তোমরা সেভাবেই চালাবে। সেভাবে সব কিছু কল্পনা করবে, সে সবে মানবিক আনন্দটি যেন থাকে।'

শিক্ষার্থী ১: 'আমার এই কাজের বর্ণনা দিয়ে আমি চটপট্ কিছু বলি। আমার প্রহরার শুরুতে ভোরে প্রধান ডেকটি ধুয়ে মুছে পরিস্কার করবো। জাহাজ যে অফিসারের ওয়াচে আছে তাঁর সঙ্গে কথা বলবো। যোগাযোগ ব্যবস্থা দিয়ে নিচে ইঞ্জিন রুমের সঙ্গে কথা বলবো। এবার কিছুক্ষণ হুইল ধরবো। ফাঁকে রান্নাঘরের বাবুর্চির কাজ দেখে স্টুয়ার্টের সঙ্গে কথা বলবো।'

শিক্ষার্থী ৪: 'সটুয়ার্ট বলছিলো টিনের মাছ ছাড়া কিছু নেই। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলে নৌকা নামাবার ব্যবস্থা করবো মাছ ধরতে। নিজেরাই নৌকার হাল ধরে এগিয়ে যাবে মাছ যেখানে লাফ ঝাঁপ দিচ্ছে।'

শিক্ষার্থী ৩: 'আমি উঠবো মাস্তুলের আগায় "কাকের বাসায়", যেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ওখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দিনের পাহারা দেয়া আমিই শুরু করবো।'

সোফিয়া: 'তোমরা এ কথাগুলো বলছো ইতিহাস থেকে, আর মেরিটাইম সাহিত্য থেকে। সত্যিকার জীবনে এগুলো করার পাট চুকেছে বহুদিন হয়ে গেলো। কিন্তু এগুলো তোমাদের মাথায় টিকে আছে ওই ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চার কারণে। শুধু তাই নয়, তোমাদের মত যারা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে তাদের চর্চায়ও এগুলো আছে। তারা নিজেরা পালের বোট চালানো শিখেছে, তেমনি আগেকার দিনের মত করে শুধু মানুষের উদ্যোগে জাহাজ চালাতে শিখছে। মানুষের মাথায় এর সব কিছু ধরে রাখতে হবে, চর্চায়ও ধরে রাখতে হবে, ওর থেকে যে সক্ষমতা ও আনন্দ সেটি মানুষের চালিকাশক্তি হিসেবে থাকবে ভবিষ্যতের জন্য। দৈনন্দিন কাজ আমরা ইন্টেলিজেন্টকে ছেড়ে দিয়েছি নিজেদের সুবিধার জন্য। কিন্তু মাথা থেকে তা ছেড়ে দিইনি। ওই যে বিপ্লবীরা বিপ্লব শেষে বলতো "অস্ত্র জমা দিয়েছি, ট্রেনিং জমা দেইনি"– অনেকটা সেরকম।'

ভুক্তভোগীর সেবা

একটি লম্বা ছুটিতে রাহিল চট্টগ্রামে বাড়ি এসেছিলো। ওই বাদল বনে পারিবারিক ছুটি কাটাবার পর এই প্রথম আবার একটু লম্বা অবকাশ নিজের জন্য পেয়েছে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যতদিন বাড়ি থাকবে নিয়মিত চট্টগ্রামের স্কুলে তার দায়িত্বটি পালন করবে। এবার স্কুলের যে বিষয়টির দিকে রাহিল লক্ষ্য করলো তা হলো ভুক্তভোগীর সেবা। শুধু একটি পাঠ্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে স্কুলের অনেকগুলো সহপাঠ্যক্রমের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে এই বিষয়গুলো। বলতে গেলে আগাগোড়া শিক্ষা জীবনের প্রতি পর্যায়ে কোন না কোন ভাবে এই মানব সেবার ব্যাপারটি জড়িয়ে আছে। আসলে এখানে এতটাই এর জন্য সবাইকে গড়ে তোলা হচ্ছে যেন সেবা যার দরকার তার যেন উপকার হয়, তেমনি সেবা যে দেবে তারও উপকার হয়। ওই শেষের উপকারটি মনের আনন্দের, তৃপ্তির, এবং কোন না কোন ক্ষেত্রে এই রকম কাজে আত্ম নিয়োগের সুযোগ– তা সে পেশা হিসেবেই হোক বা নেশা হিসেবেই হোক।

ভুক্তভোগী কারা হতে পারে রাহিলের সেটি জানতে হলো এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে সঙ্গ দিতে গিয়ে। প্রথমে যেই রকম ভুক্তভোগীর সাক্ষাত পেলো তারা স্কুলে খুব উপস্থিত না হলেও তাদের ছবি, ভিডিয়ো, মডেল এসবের কোন

অভাব নেই। এরা হলো নবজাতক শিশু এবং তারপর বেড়ে ওটার নানা পর্যায়ে নানা শিশু। শিশু যত্ন ও শিশু পালন এমন একটি বিষয় যা ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে স্কুলের সবার জন্য অবশ্য শিক্ষণীয়। বড় হয়ে নিজের সন্তানের সঠিক লালন পালনের জন্য এই জ্ঞান ও চর্চা অপরিহার্য। সন্তানের সঠিক যত্ন এখন মা ও বাবা উভয়ের একান্ত কর্তব্য, শিশুর চার বছর বয়সে স্কুলের এতে শরিক হবার আগে পর্যন্ত এটিই তাদের প্রধান কাজ। এজন্য কেউ যদি কোন চাকরি বা দায়িত্বে থাকেন তাঁকে সেখান থেকে ছুটি দেয়া হয় মা ও বাবা উভয়কে। বিভিন্ন কারণে অন্যের বাচ্চাকে মা বা বাবার যত্ন দিতে হলে সেখানেও এই শিক্ষা কাজে লাগে।

শুনতে যত সাদামাটা মনে হোক, এর সঙ্গে বিশেষ চাহিদার শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু তাদের যত্ন যখন যোগ হয় কাজটি তখন খুব সহজ থাকেনা। সহজ না হতে পারে কিন্তু ছাত্রের জন্য উত্তেজনা-আনন্দের অভাব নেই এতে। রাহিলকে রীতিমত নিজেও শিখতে ও অভ্যস্ত হতে হলো এতে সহায়তা দিতে গিয়ে। অবশ্য তার নিজের ছাত্র জীবনের শিক্ষাটিও এই ক্ষেত্রে এখনো জ্বলজ্বল করে আছে। তারপরও যাতে স্কুলের বর্তমান আয়োজনের সঙ্গে রাহিল পরিচিত হয়ে নিয়ে ভুক্তভোগীর সেবা সম্পর্কে তার অতিথি-শিক্ষকতাকে সাজাতে পারে তার সামগ্রিক ধারণা দেয়ার জন্য স্কুলের একজন শিক্ষক কাজী সিরাজ, স্কুল হাসপাতালের অধ্যক্ষ সান্ত্বনা রোজারিও এবং প্রতিবন্ধী স্পোর্ট ক্লাবের কোচ মিতা চৌধুরী আলাপ করতে করতে তাকে স্কুলের আয়োজনগুলো দেখালেন।

রাহিল: 'আমার কাছে খুব মজা লাগছে আমার ছাত্র অবস্থাতেও যেটি খুব সাদামাটা একটি প্রশিক্ষণের মত ছিল এখন তা সবার জন্য বড় একটি কর্মযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে শিশুর যত্নে বাবা মা যত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তার অনেকগুলো এতে রয়েছে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ছাত্রদেরকে এগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়।'

কাজী: 'হ্যাঁ, সেটিই আমরা আশা করি। কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণী ছাত্ররা সব রকম শিশুর প্রতি সরল স্বাভাবিক স্নেহময় ও সযত্ন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারবে এবং আনন্দ-উৎসাহের সঙ্গে ক্রমাগত এ কাজে দক্ষ হবে। যেখানে বিশেষজ্ঞ সেবা নিতে হবে তাতেও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারবে।

সান্ত্বনা: ‘আমাদের এই হাসপাতালটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তো বটেই শহরের এই পুরো এলাকার জন্যও কাজ করছে। এর কোন কোন অংশ আমরা নানা বয়সের স্কুল ছাত্রদের শিক্ষা ও চর্চার কাজেও ব্যবহার করছি। শিশু বিভাগের একটি অংশও ওভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার মধ্যে প্রসূতি বিভাগও রয়েছে, নানা কারণে জন্মের পর শিশুকে এখানে কিছুদিন বিশেষ যত্নে থাকতে হয় বলে। এখানে যে ছাত্ররা শিক্ষা পায়, তারা আগেই স্কুল ভবনেই তাদের নব জাতক ও শিশু যত্নের প্রাথমিক জ্ঞান সেরে আসে। ওখানে আসল শিশু থাকেনা, কিন্তু বাকি সবই থাকে। সেখান থেকে হাসপাতালের সেবা দানে এখানে এসে অনেক কিছু শেখে ও উপলব্ধি করে; বিশেষ রকম চাহিদার শিশুদের সেবায়ও। মূল কাজগুলো বিশেষজ্ঞের ও চিকিৎসকের; কিন্তু ছাত্ররা অনেক সাহায্য করতে পারে, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।’

রাহিল: ‘বিশেষজ্ঞদের মাঝখানে ছাত্রদের সহায়তাটি কী রকম হবে? ওখানে হয়তো একটু বড় হয়ে ওঠা অটিস্টিক শিশু, ডাউন সিনড্রোমে ভোগা শিশু এমনটিও অন্তর্ভুক্ত হবে।’

সান্ত্বনা: ছাত্রদের ভূমিকা হবে পরবর্তী সময়ে বাবা মা হিসেবে বা বাড়িতে সেবা দানকারী অভিভাবকের ভূমিকায়। তারা ভুক্তভোগী বিভিন্ন রকম শিশুর আচরণ, মনস্তত্ত্ব ও চাহিদাগুলো বুঝবে। সেবা দিতে গিয়ে বা এই শিক্ষা লাভ কালেও শিশুর সঙ্গে যেন অন্তরঙ্গতা, সহমর্মিতা গড়ে ওঠে সে চেষ্টা করতে পারবে। এই শেষেরটুকু শুধু বাবা মা’র নয় প্রত্যেক নাগরিকের এমনি প্রতিবন্ধীদের প্রতি থাকা উচিত। তা হলেই ওই ভুক্তভোগী শিশু আধুনিক পরিবেশে অন্য সবার মত সুযোগ সুবিধা নিয়ে বড় হতে পারবে, অনেক স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে।’

রাহিল: ‘ইন্টেলিজেন্ট পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা এর মধ্যে কোথায়?’

সান্ত্বনা: হাসপাতাল পর্যায়ে এবং চিকিৎসা পর্যায়ে ইন্টেলিজেন্ট বিশেষজ্ঞ অসাধ্য সাধন করছে। সফ্‌টওয়্যার ও মেশিন লারনিঙের কল্যাণে ভুক্তভোগীদের অনেক অজানা, অব্যক্ত বিষয় এখন আমাদের বোধগম্য হয়েছে। এগুলোর বিশ্লেষণ করে ওই ইন্টেলিজেন্ট বিশেষজ্ঞই অনেক ব্যবস্থাপত্র দিতে পারে, ভুক্তভোগীকে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠা সুগম করতে পারে। কিন্তু এটি বাড়িতে

পরিবার ও বাইরে নাগরিকদেরকেও বুঝতে হবে। ভুক্তভোগীরা জীবন কাটাবে ওদের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নয়। শিক্ষাঙ্গনে সেটিই তারা শিখছে। ওই বুঝতে পারাটি তাদেরকেও এক ধরনের নাগরিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলে। এটি একেবারেই মানবিক– ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি সেখানে কার্যকর হয়না, মানবিকটিই হয়। সহমর্মিতার পরশ দিয়ে ওই বিশেষ জ্ঞান মানুষই প্রয়োগ করতে পারে।'

মিতা: 'কৈশোর কাটিয়ে ওঠার আগে থেকেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনটি কঠিনতর হয়। এজন্য তখন তাদের জন্য ভিন্ন ধরনের আয়োজনের প্রয়োজন হয়, চেষ্টা করতে হয় যেন তারা নিজেরাই নিজেদের যত্ন নিতে পারে, সবার সঙ্গে মিশতে পারে। শারীরিক প্রতিবন্ধীরাও এসময় যথাসম্ভব সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কামনায় বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হয়, অভিভাবকের নিকট-সেবার থেকে কিছুটা স্বাধীন হয়ে গিয়ে। এসময় উভয় ক্ষেত্রে ভাল সেবা দেবার জন্য রয়েছে আমাদের প্রতিবন্ধী স্পোর্টস ক্লাব। বিনোদন, খেলাধূলা, পরস্পর যোগাযোগ, জীবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ এই ক্লাব। মূল সদস্যরা ছাড়াও প্রতিবন্ধী নয় এমন অতিথি সদস্য, কোচ, সেবাদানকারীরাও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। এটি এই এলাকার সব প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্মুক্ত। স্কুলের শিক্ষার্থীরা সেবা ও সঙ্গ দেয়ার পাশাপাশি প্রচুর শিক্ষা এখান থেকেও পাচ্ছে।'

সান্ত্বনা: 'আমাদের হাসপাতালে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বিভিন্ন ভুক্তভোগীদের সেবার শিক্ষাও ওই একই ভাবে দেয়া হচ্ছে। অসুখ, অসুস্থতা জনিত প্রতিবন্ধিতা, বার্ধক্যের অসমর্থতা, স্মৃতিভ্রষ্টতা বা আলজাইমার রোগ এরকম বহু ক্ষেত্রে সেবা দেবার জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতা এখানে অর্জন করলে পরিবার সদস্য হিসেবে, স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক হিসেবে অথবা পেশাজীবী হিসেবে পরবর্তী সময়ে এর চমৎকার ব্যবহার তারা করতে পারবে। চিকিৎসা বিদ্যা অবশ্য অতি দ্রুত এগিয়েছে। ত্রিশ বছর আগেও এই সব সমস্যা যে রকম গুরুতর ছিল, আজ তার ধারেকাছেও নেই। আসলে পুরো নাগরিক সমাজকে যদি আমরা এই রকম সব সেবা দক্ষ ভাবে দিয়ে গড়ে তুলতে পারি, মানুষের জীবনের এই দুঃখজনক অধ্যায়টি একেবারেই আর থাকবেনা। এটি প্রায় সম্পূর্ণ মোচন করার কাজে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের পাশাপাশি সেবার মাধ্যমে কাজটিও

চলতে হবে; সবাই নিজেরাও এমনি রকম অসমর্থতার মোকাবেলায় সাহসী হবে। এই উদ্দেশ্যটাই শিক্ষার এ দিকটার প্রধান দিক।'

রাহিল: 'বেশ বুঝতে পারছি আমার ছাত্র অবস্থায়ও শিক্ষার এই অংশটি সঠিক দিকেই ছিলো– সেবার মানবিক দিকটিকে উদযাপন করা, তার মধ্য দিয়ে নিজের মানবিকতাকে উপভোগ করা। এখন হাসপাতাল আর ক্লাব যেভাবে বড় আকারে এগিয়ে এসেছে সেটি অনেক বেশি কার্যকর ও তৃপ্তিদায়কও হবে আশা করি। এতে একটু হাত লাগাতে পারলে আমারও যেই অভিজ্ঞতা ও শেখা হবে সেটি আমার জন্যও প্রচুর তৃপ্তিদায়ক হবে। আমি যে কোন মুহূর্তে শুরু করতে প্রস্তুত! ধন্যবাদ।'

বাঁচো অন্য মানুষের মনে, ভাবো বিশ্বময়

রাহিল আর ময়না তাদের বাড়িতে এক সঙ্গে কাটানোর বিরল সময় স্কুলের অতিথি শিক্ষকতাও দুজন এক সঙ্গেই চালাবে ভেবে নিয়েছিলো। রাহিল যখন ভুক্তভোগীকে সেবা দেবার শিক্ষকতায় ছাত্রদেরকে হাতে কলমে সাহায্যের চেষ্টা করছিলো, ময়না তখন অন্য ছাত্রদের কম্পিউটার ল্যাব পরিচালনা করছিলো। এখানে বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্ট সফ্টওয়্যার নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে, তেমনি ভার্চুয়াল রিয়ালিটি নিয়েও। সবার ওপরে বিশ্ব নেটওয়ার্ক থেকে যে কোন তথ্য- দৃশ্যাবলী ডাউনলোড করে তার ব্যবহারে নানা আর্ট সৃষ্টি করা, কাহিনী চিত্র তৈরি করা, বা দূর-যোগাযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি সৃজনশীল কাজ করার ব্যবস্থা আছে। একটি বড় উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

ময়না: 'বিশ্বময় বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা তোমাদের পক্ষে সম্ভব কারণ তোমরা এখন সব অর্থেই বিশ্বের বাসিন্দা– কোন দেশের বা অঞ্চলের চেয়েও অনেক বেশি করে বিশ্বের। ধরা যাক উত্তর মেরুর কাছের একটি গ্রামে তুমুল বরফ-ঝড় হচ্ছে, উত্তাপ শূন্য থেকে অনেক নিচে। বাতাসের বেগে প্যাঁজা বরফ ছুরির মত ছুটে গায়ে এসে বিধছে আর আলো-আঁধারের এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ওই পুরো ব্যাপারটাকে তুমি এখন এখানে এই ঘরে নিয়ে আসতে পারো, একটি ভার্চুয়াল রিয়ালিটি হেলমেট পরে দৃশ্যে, শব্দে, চেতনায় ওর মধ্যে পুরো নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারো। ঠিক যেমন ঘটছে তেমন না নিয়ে একে সম্পাদনাও করতে পারো একটি শিল্পবোধকে প্রশ্রয় দিয়ে। ওখানে যে

সামি গোষ্ঠির মানুষরা থাকে, অথবা এস্কিমোরা তাদের জীবন কতখানি বিপর্যস্ত হচ্ছে সেটি অনুভব করতে পারো, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পার। ভাষা কোন সমস্যা হবেনা তাৎক্ষণিক অনুবাদ দুই পক্ষেই হতে থাকবে।

কিছুদিন আগে আমি পরিবারের সঙ্গে মালয়েশিয়ার বাদল বনে ঘোরাফেরা করেছি। সেখানে ওরাংউটান ও অন্যান্য অদ্ভুত সব প্রাণীদের মধ্যে অনেক অজানা তথ্য পেয়েছি। কিন্তু স্থানীয় মানুষদের মধ্যে নতুন বা অদ্ভুত কিছু পাইনি। তদের চিন্তা ভাবনা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, এমনকি ইতিহাস-ঐতিহ্যে তাদের সঙ্গে পর্যন্ত অদ্ভুত নৈকট্য বোধ করেছি। তাদের মনের মধ্যে ঢুকে পড়তে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। তোমরা যদি তাদের ওই অদ্ভুত পরিবেশেও সামি বা এস্কিমোদের সঙ্গে কথা বলো, চেষ্টা করো তাদের জীবনের কাছাকাছি যেতে– ঠিক তাদেরো মনের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে। আরেকটু যদি চেষ্টা কর তাদের আর্টগুলো তোমার মনকেও রাঙিয়ে দিতে পারবে।'

শিক্ষার্থী ১: 'কিন্তু আমরা যদি পশ্চিমের ধনী অঞ্চলগুলোর কথা চিন্তা করি, তখন সেখানকার মানুষের মনের মধ্যে ঢোকার কথা ভাবতে পারিনা। তাদের সঙ্গে আমাদের বৈষম্য রয়েছে। তাদের সর্বজনীন মৌলিক আয় আমাদের থেকে ঢের বেশি। কী ভাবে বলবো আমরা একই বিশ্বের নাগরিক?'

ময়না: 'এ কথা সত্যি সবাইকে দেয়া সর্বজনীন মৌলিক আয়ের পরিমাণ ওদের বেশি। ওদের সর্ব সাধারণের কাছে যা সহজলভ্য আমাদের কাছে এতটা নয়। যদিও খাওয়া-পরা-বাসস্থান-চিকিৎসা-বিনোদনের জায়গায় আমাদের গড় পড়তা মানুষ ও তাদের গড়পড়তা মানুষের সুযোগ সুবিধা একই, কিন্তু তারা বাড়তি আরো যা উপভোগ করতে পারে আমরা তা পারিনা। সেটি অর্থনীতির ঐতিহাসিক কিছু জটিলতার কারণে এটি হচ্ছে। তবে এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আগের সময়ের তুলনায় এই গড়পড়তা বৈষম্যটিকে নেহাৎ তুচ্ছই বলা যায়। যেদিকে যাচ্ছি তাতে বোঝাই যাচ্ছে এই বৈষম্যও আর বেশিদিন থাকবেনা। বর্তমান বৈষম্যের প্রধান কারণ এখনো আমাদের বেশি নির্ভরশীলতা প্রাকৃতিক পণ্যের ওপর, আর তাদের বেশি নির্ভরশীলতা যান্ত্রিক উৎপাদনের ওপর থাকার কারণে, শিগ্‌গির আমরাও প্রকৃতি ছেড়ে পুরো যন্ত্রের দিকে চলে যাব।

আপাতত তাই খুব ব্যয়বহুল কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের সামর্থ্য সমান নয়। কিন্তু তাই বলে তাদেরো মনের মধ্যে ঢুকতে পারবোনা সেটি ঠিক নয়। এখন সবাই উপলব্ধি করতে পারি মানুষ সবাই শুধু যে সমান তাই নয়, বরং দুনিয়ার সব মানুষকে সব মানুষের খুবই প্রয়োজন। প্রত্যেকে যে আমরা অন্য প্রত্যেকের জন্য এ কথা শত শত বছর ধরে মানবতাবাদীরা বলে এসেছেন, সাহিত্যে শিল্পে সেটি নানা ভাবে তুলে ধরা হয়েছে; কিন্তু কথাটির সত্যতা এখনকার মত স্পষ্ট কখনো হয়নি।'

শিক্ষার্থী ২: 'যেখানে জীবিকা নিশ্চিত, ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির নানা রকম কাজের মধ্যে জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ, সেখানে মানুষ কেন অন্য মানুষের চিন্তা করবে?'

ময়না: 'ঠিক ওই কারণেই করবে। ওই সেদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে যে কোন মানুষ অন্য বহু মানুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাদের মধ্যে আপন যারা ছিল তারা তার নিজের মতই চাপের মধ্যে ছিল– খাওয়া পরা জীবিকার চাপ, বড় মানুষের হুকুম তামিল করার চাপ। আর ধনী ও শক্তিশালী মানুষরা তো তাকে এক পায়ে খাড়া রেখেছিলো তার শ্রম, সম্মান সব কিছু কেড়ে নিতে। তখনও মানবতাবাদীরা বলেছেন বটে "প্রত্যেকে আমরা পরের তরে", কিন্তু তার পরিবেশ সে রকম ছিলনা। আজ মানুষ ইন্টেলিজেন্ট দ্বারা পরিবেষ্টিত, যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। এতে জীবিকার ওই চাপ আর নেই, কিন্তু এর ফলে মানবিক ছোঁয়ার জন্য অন্তরের হাহাকারটি বেড়েছে। সব সময় একটি অজানা ভীতি যেন আছে নিজেরাও যান্ত্রিক হয়ে পড়বার। এই যে ইন্টেলিজেন্ট সেবা তার মধ্যে সত্যিকার অর্থে অনুভূতি নেই তা জেনেও আমরা অনুভূতি আরোপের চেষ্টা করি। এটি একটি নিজকে বুঝ দেওয়া প্রচেষ্টা মাত্র।

যান্ত্রিকতা ভীতিটি খুবই বাস্তব। এটি ছোটখাট ভীতি নয়; মানুষের আত্মতৃপ্তির ক্ষেত্রে এটি বড় একটি বাধা। তাই আমরা অন্যের মন ছুঁয়ে যেতে চাই; আমাদের অখন্ড যে অবকাশ তার মধ্যে যাই করি না কেন সেগুলো বেশির ভাগ অন্য মানুষকে চমৎকৃত করতে, তাদেরকে আনন্দ দিতে, তাদের সেবার কাজে আসতে ব্যয় করি। এই আকাঙ্খা বরাবরই মানুষের ছিল, এটি তার ডিএনএ'র অংশ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এটিই মানুষের ধ্যানজ্ঞান হতে হচ্ছে, যাতে আমরা নিজেদেরকে একা বলে অনুভব না করি। এক সময় সংস্কৃতি কথাটিকে ব্যাখ্যা করা হতো "বাঁচার মত বাঁচা"। এখন বরং আমরা

বলবো “অন্য মানুষের মনের মধ্যে বাঁচা”। শিক্ষার্থী হিসেবে তোমাদের যে শেখার ও সৃষ্টি করার সাধনা তার প্রত্যেকটি হোক মানুষের মধ্যে বাঁচার সাধনা।’

শিক্ষার্থী ৩: ‘সেই মানুষরা কি আমাদের কাছের মানুষ? যেমন পরিবারের মানুষ, দেশের মানুষ, যাদের সেবা আমরা দিতে পারি।’

ময়না: ‘অনেক ক্ষেত্রে কার্যত তাই হবে, বিশেষ করে কাছে থেকে সহমর্মিতার সেবা দেবার ক্ষেত্রে। কিন্তু নীতিগত ভাবে তা নয়। ওই যে বলেছি আমরা বিশ্বের মানুষ, পুরো বিশ্বের মানুষের মনের মধ্যে বাঁচার আকাঙ্খাটি আমাদের থাকা চাই। ওটিও আসলে নতুন কথা নয়। সারা বিশ্বের মানুষ আদি কয়েকজন মানুষ থেকেই বিবর্তিত হয়েছে। সবার মধ্যে সেই একই ডিএনএ। পুরো ইতিহাসে আমরা একটি মন থেকে অন্য মনকে জাগিয়েছি, এক আগুন থেকে বহু আগুন জ্বালানোর মত। এক থেকে অন্যের মধ্যে যাওয়ার মাধ্যমগুলো বহু কষ্টে খুঁজে নিয়েছি– ভাষা, লিপি, বই, বিজ্ঞান ইত্যাদি। আজ আমরা বিশ্ববাসীর সঙ্গে একেবারেই সংযুক্ত– সংযোগের মাধ্যমগুলো খুবই মজবুত। সব জায়গার সব মানুষের ভাগ্য ও সমস্যা-সমাধান একসূত্রে গাঁথা। এখন শুধু নিজের কাছের মানুষের জন্য ভাবার কোন অজুহাত আমাদের কাছে নেই। ওই সংযোগ ব্যবহার করে সবার সুখ দুঃখের দায়িত্ব যদি না নিই, সবার সঙ্গে যদি ভাব না করি, তা হলে বিশ্ব মানুষ হলাম কী ভাবে?

এক সময় মানুষ যখন শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতো তখন নিজের পরিবারের বাইরে অন্য কারো অস্তিত্বের কোন মানে তার কাছে ছিলনা; কিন্তু বেশিদিন সেভাবে ওরা থাকতে পারেনি। তারপর যার যার জাত, গোত্র, গোষ্ঠি ওসব শব্দও মানে হারিয়েছে তাও দীর্ঘদিন হলো। এখন সবাই জানে বিশ্ব বাঁচলে, বিশ্ব-মানুষ বাঁচলে আমি বাঁচবো। যন্ত্রের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের ওপর মানুষের যে অদ্ভুত মুনশিয়ানা সেটিকেও সুন্দর সৌকর্যের মধ্যে রাখতে হলে ভাবনাগুলোকে বিশ্ব ভাবনা করে রাখতে হবে, যা সঞ্চারিত হবে মন থেকে মনে।

বাঁচো অন্য মানুষের মনে, ভাবো বিশ্বময়।’

এ্যালবাম

সব পাখি ঘরে ফেরে

পরিবারের সবাই এখন এক বাড়িতে, চট্টগ্রামে নিজেদের বাড়িতে; মানাজির পরিবারের জন্য এটিই সবচেয়ে খুশির সময়। এটি বেশ কিছুদিন পরপর কয়েকটি বছর গড়িয়ে একবার ঘটে, কিন্তু প্রত্যেক বার একে সবাই পুরাদমে উপভোগ করে। বাইরেও হৈ চৈ কিছুটা হয় যেমন পুরানো স্কুলে অতিথি শিক্ষকের কাজে গিয়ে। তা নইলে এ সময় ছোটরা-বড়রা সবাই একটু অবকাশ নেবার চেষ্টা করে বাড়িতে এক সঙ্গে কাটানোর জন্য। বাসার পেছনে বারান্দায় বাগানকে সামনে রেখে যে প্রশস্ত জায়গা সেখানেই চলে একটানা আড্ডা, আর ফাঁকে ফাঁকে পুরানো দিনের অনেক স্মৃতি বিজড়িত নানা জিনিস নিয়ে নস্টালজিক নাড়াচাড়া।

এসব আড্ডায় ওরা চারজনের সবাই কমবেশি থাকলেও আর একজনের উপস্থিতি একেবারে নিশ্চিত– সে হলো তীব্র, পরিবারের অতি আদরের কুকুর। ময়নার এক জন্মদিনের উপহার ছোট্ট ছানা হিসেবে এ বাড়িতে এসেছিলো। এখন যথেষ্ট বয়স হলেও ইয়র্কশায়ার টেরিয়ার জাতের কুকুরটি ছোটখাটই রয়ে গেছে– মুখ চোখ সব পশমে ঢাকা, সেই আগের মতই চঞ্চল ও আদুরে। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে তীব্রকে নিয়ে খুনসুটি করার মধ্যে সবার আনন্দ, বিশেষ করে ময়নার। আর তীব্রের আনন্দ হলো ময়নার এটি সেটি জিনিস মুখে নিয়ে তার ইচ্ছেমত যেখানে সেখানে লুকিয়ে রাখা। তারপর অনেক সাধ্য-সাধনা করলে সেখান থেকে বের করে ফেরৎ দেয়া। ময়নার বন্ধু-বান্ধব অতিথি কেউ আসলে তীব্রকে দেখা যায় সেই বন্ধুর স্যান্ডেলটাই হয়তো লুকিয়ে রাখলো, ভাবখানা এমন যে যিনি এসেছেন তাঁকে এতো সহজে চলে যেতে দেবেনা।

সোফিয়া ও শান্ত দু'জনেই যখন স্কুলে পড়ে তখন আজকালকার কিশোর-তরুণদের মত তাদেরও একটি বড় কাজ ছিলো নতুন নতুন যে চমকপ্রদ ইন্টেলিজেন্ট সফ্টওয়্যার তৈরির খবর পাচ্ছে, পাবলিক ডোমেইনে থাকলে তার ওপর আরো কাজ করা, নতুন নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নেহাৎ সখের বশতই করতো এসব। রাহিল-ময়নারাও তাদের স্কুল জীবনে এসব করতো। মজার ব্যাপার হলো এখনও ওরা বাবা মা ছেলে মেয়ে সবাই ওই পুরানো সফ্টওয়্যারগুলোর কিছু কিছু ব্যবহার ও প্র্যাকটিস করে বেশ মজা পায়, আবার নস্টালজিকও হয়ে পড়ে। এই যেমন ধরা যাক রাহিলের জন্মের পর যে সময় একদিকে শান্ত ও সোফিয়া দু'জনেই বাইরে কাজের ব্যস্ততায় অস্থির, অন্যদিকে নিজের শিশু পালনের হঠাৎ দায়িত্বে হতভম্ব হয়ে বেহাল, কিছু কিছু ইন্টেলিজেন্ট সফ্টওয়্যার সে সময় তাদের খুব কাজে এসেছিলো। রাহিল ও ময়না এখন এগুলো দেখে খুব মজা পায়, কোন শিশুর ভিডিয়ো চালিয়ে তার ওপর এর কাজ দেখে। মজা পায় ভেবে যে একদিন এর সাহায্যে বাবা মা কেমন করে তাদের রাহিল-ময়নার কান্নার বা নানা আওয়াজের অর্থ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতো। ইন্টেলিজেন্ট সফ্টওয়্যারগুলোর মধ্যে একটি ছিল একেবারে জন্মের কয়েক মাসের মধ্যে ব্যবহারের জন্য- কেন বাচ্চা এমন কান ফাটা কান্না করছে তার অর্থ উদ্ধারের চেষ্টায়।

এই সফ্টওয়্যার তৈরিতে বহু মায়ের বা আয়ার কাছ থেকে তাঁরা যে শিশুর যত্ন নিচ্ছেন তার নানা রকম কান্নার শব্দ রেকর্ড করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির পর কী ভাবে সহজে কান্না থামানো গেছে সেই তথ্যও। তাতে মেশিন লার্নিং বুঝতে পেরেছে কোন্ কান্নায় দুধ খাওয়ালে কান্না থেমেছে, কোনটিতে কোলে তুলে নিলে, কোনটিতে পেটের ব্যাথার জন্য পেটে একটু মালিশ করে দিলে ইত্যাদি। অর্থাৎ এক ভাবে ওই কান্নার মানেটি প্রকাশ করতে পেরেছে তা থামার উপায় দেখে। এই উভয়ের পরস্পর সূক্ষ্ম সম্পর্ক এভাবে বিশাল সংখ্যক তথ্যের থেকে উদ্ধার করে এর মধ্যে কিছু নির্ভরযোগ্য প্যাটার্ন উদ্ঘাটন ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিতে সম্ভব হয়েছে। ফলে নতুন কোন শিশুর কান্নার শব্দেই সফ্টওয়্যার বলে দিতে পেরেছে এই কান্নার অর্থ কী। বোঝা যায় কোন্ পরিস্থিতিতে শিশু এই বিশেষ ধরনের কান্না করে। এভাবে শান্ত দম্পতির পক্ষে নতুন শিশুর কান্না থামানো সহজ হয়েছে।

ঠিক এমনি ভাবে বহু শিশুর অন্যান্য শব্দ করা, চিৎকার করা, বায়না করার অবোধ্য শব্দগুলোর আওয়াজের অর্থ উদ্ঘাটনের মত সফ্‌টওয়্যারও তৈরি হয়েছিলো। তার সঙ্গে মুখভঙ্গির ও হাত-পা নাড়ার ছবিও যোগ করা হয়েছে যাতে আওয়াজ আর ছবির কোন্ কোন্ সমন্বয়ের পর শিশুকে কী ভাবে সন্তুষ্ট করা গেছে বা যায়নি সে তথ্যও নেয়া হয়েছে আপনজনদের কাছ থেকে। সোফিয়া ও শান্ত রাহিলের শৈশবে এমন সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করেছেন, তার বক্তব্য বোঝার জন্য, এবং সেই সঙ্গে নিজেরা সাদা চোখে দেখে ও শুনে তা নিজেই বুঝতে শিখেছেন, সব সময় ইন্টেলিজেন্ট সফ্‌টওয়্যারের শরণাপন্ন যেন না হতে হয়। পরে ময়নার শৈশবেও তাই করেছেন তাঁরা একই সফ্‌টওয়্যার দিয়ে। তখন শৈশবের ওই একেবারে প্রথম অভিব্যক্তিগুলোর দিক থেকে দু'জনের মধ্যে মিল-অমিলগুলো স্মরণ করে খুব মজাও পেয়েছেন।

এখন এতোদিন পর আবার সবাই মজা পাচ্ছে সফ্‌টওয়্যারগুলো সেদিনের শিশু রাহিল ও ময়নার ভিডিয়োর ওপর প্রয়োগ করে। ওদের শৈশবের ভাষাকে যেন আবার অর্থসহ তুলে আনা। একে তো আমরা বহু বছর পিছিয়ে শৈশবের ভিডিয়ো দেখেই চমৎকৃত হই, বিশেষ করে সেই শৈশবের খেলনার ঝাঁপিটিও যদি খুলে দেয়া যায় তাহলে তো আরো। তার ওপর যদি পাশাপাশি সেদিনের মুখের শব্দ ও মুখভঙ্গির কী অর্থ সেটিও পর্দার পাশে লেখা হয়ে ফুটে ওঠে তখনতো চমৎকারিত্ব অনেক গুণে বেড়ে যায়। সফ্‌টওয়্যারটিও সেদিনের একটি খেলনার মত, যা আজকের যে কোন শিশুর ওপর আবার ব্যবহার করা যায়। অবশ্য এই 'খেলনা' সেদিন বা মায়ের কাছে দারুণ কাজে এসেছিলো বাচ্চার বায়না মেটাতে। প্রত্যেক নতুন শিশুর ওপর ব্যবহার করে সফ্‌টওয়্যারটি আরো অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হবে, আরো নিখুঁত ফল দেবে ভবিষ্যতে। এটাও মজা। পুরানো সফ্‌টওয়্যার এমন ভাবে তৈরি করা যেন আগ্রহী মানুষ মাত্রই এতে আরো অবদান রাখতে পারে। এখানে বিশেষ মজাটা হলো একদিন ওটি যেই শিশুর অবোধ্য আওয়াজকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো, আজ সেই শিশুই ওটিকে আরো বিচার বিবেচনা করছে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধি নিয়ে ভাবনায় এতোটা ডুবে থাকা পারিবারিক আড্ডাতেও। ওটি বোধ হয় মানাজির পরিবারের জন্যই সাজে।

আরো ভাল খেলা চলে চোখ নাক মুখ সব লম্বা চুলে ঢাকা ছোট্ট সাইজের কুকুর তীব্রকে নিয়ে। সে নিজেই একটি মজার খেলা করা প্রাণী– তার সঙ্গে খেলায় যোগ না দিলে এমন সব কাণ্ড করবে যাতে মনোযোগ দিতেই হয়। তবে রাহিলদের জন্য সেটি আরো চমৎকার হয়ে ওঠে ওই শিশু-ভাষা টাইপেরই আরেকটি ইন্টেলিজেন্ট সফ্‌টওয়্যারের কল্যাণে। ইয়র্কশায়ার টেরিয়ার কুকুরের মুখের আওয়াজের ওপর তৈরি সেটি, রাহিল স্কুলে পড়ার সময় তার প্রিয় কুকুরের ভাষা আরো ভাল বোঝার জন্য সফ্‌টওয়্যারটি এনে এর ওপর কাজ করেছিলো। যারা ওটি তৈরি করেছিলো দেশে দেশে নানা টেরিয়ারের আওয়াজ নিয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। কোন্‌ পরিস্থিতিতে কী ধরণের আওয়াজ করেছে তার প্রতিক্রিয়ায় মালিকের কী রকম সাড়া তাকে সন্তুষ্ট করেছে, কী রকম সাড়া করেনি সে তথ্যও আওয়াজের সঙ্গে নেয়া হয়েছে এবং সে মুহূর্তের ভিডিয়ো রাখা হয়েছে। এতো বিপুল সংখ্যক তথ্যের প্যাটার্ন থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে গড়পড়তা সব টেরিয়ারের নানা আওয়াজের মর্মকথা। বিশেষ করে ইয়র্কশায়ার টেরিয়ারের জন্য পৃথক আরো নিখুঁত 'অভিধান' রাহিল পেয়ে গিয়েছিলো তীব্রের 'কথা' বোঝার জন্য। কত রকমের কথা তার, কখনো নেকড়ের দীর্ঘ স্বরের মত একটানা আওয়াজ, কখনো গলা থেকে গড় গড় ধ্বনি, কখনো গোৎ গোৎ শব্দ, আর বেশির ভাগ সময় অনেকটা মজা করেই গ্যাক গ্যাক– তারো আবার কত রকম বৈচিত্র! সফ্‌টওয়্যার সবেরই কিছু কিছু মানে দিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত সব কথা। কিছু কিছু যে তার আচরণ থেকে আগেই অনুমান করতে পারেনি, তা নয়। কিন্তু এখন সফ্‌টওয়্যার থেকে আরো নিশ্চিত অর্থ। কোনটি বোঝাচ্ছে 'আমি একা একা আছি, ভাল লাগছেনা। তোমরা কে কোথায় আছ চলে আসো আমরা খেলবো।' কখনো বোঝাচ্ছে 'কী চালাকি পেয়েছো? তোমার চালাকিতে আমি দমছিনা, ধরতো দেখি আমাকে'। কখনো বলছে 'এটি আমার পছন্দ নয়, ভাল কিছু দাও'। এমনিতরো নানা কথা। সেগুলো জেনে জেনে এতটাই আয়ত্ব হয়ে গিয়েছিলো যে শুনেই বুঝতো তীব্র কী বলতে চায়।

এখন তীব্রকে রাহিল দেখে অনেক দিন পর পর। বয়স হয়ে গেছে অনেক তীব্রের, তাতেও রাহিলকে দেখে যেন সেই ছোট বেলায় ফেরৎ যায়– লাফ ঝাপ দুষ্টুমি সবই আগের মত। তাকে ধরতে বলে পুরো সোফা-টেবিল সব

কিছুর চারিদিকে ক্রমাগত দৌড়ানো, কোলে উঠে রাহিলের গাল বার বার লেহন করা, কিছুই বাদ যায়না। আর সেই পুরানো কথা, নানা রকম শব্দ করে। রাহিলের সব কথার পুরানো মানে ঠিক মনে আছে। আবার সেই সফ্‌টওয়্যারে চেক করে দেখে আগের মানে অনুযায়ীই তীব্রের কথার সঙ্গে কাজ মিলছে কিনা। তীব্রের বয়স বেড়েছে, সফ্‌টওয়্যারেরও নিজ থেকে উন্নয়ন হয়েছে। কিছু পরিবর্তন তো দেখা যাচ্ছেই। এটিও পুরানো বন্ধুকে নিয়ে পুরানো ভিন্ন দিনের কথা ভাবা।

বাগান-উদ্ভিদের কথকতা

যেই প্রশস্ত বারান্দায় এই একত্র হবার সুবাদে মানাজির পরিবারের আড্ডাটি রোজ জমে ওঠে তার সামনেই বেশ বড়সড় একটি বাগান। নানা রকম গাছ ওখানে; আম, কাঠাল, সজনে, কাঠবাদাম এমনি বেশ বড় গাছ যেমন আছে তেমনি লেবু, পেয়ারা, সফেদা, আমলকি এমনি সব ছোট গাছও। তারপর একেবারে ছোট ঝোপ টাইপের মেহেদি, টম্যাটো, মরিচ, ঢেড়শ এসবও আছে। এগুলো পরিবারের নানা জনের এক এক সময়ের সখের সাক্ষ্য রাখছে। এক সময় আড্ডাটি বাগানে পায়চারী করার মধ্যে গড়ায়। আড্ডায় তখন ওখানকার গাছ ও ঝোপ উদ্ভিদগুলোর ওপর নানা মন্তব্য চলে আসে– কারণ এর কোন কোনটির দিকে ওদের কারো না কারো পক্ষপাতিত্ব আছে। এ কথার স্বীকারও অবশ্য তারা অকপটে করে যে নানা ব্যস্ততার মধ্যে যারা যখন বাড়িতে আছে, এত বড় বাগানটির দিকে সব সময় মনোযোগ দেয়না। কাজেই বলতে হবে ওটি অনেকটা প্রকৃতির হাতেই বেঁচে আছে বেড়েও উঠছে– অনেকটা যে ভাবে বন্য অবস্থায় বাঁচে ও বাড়ে।

তবে ওই প্রকৃতির সন্তান গাছপালাগুলোর সৌন্দর্য আস্বাদন করতে, বা ওখানে যখন মৌসুমের সময় এটি ওটি ফল ফসল দেখা দেয় খুবই সখ করে তার স্বাদ নিতে কেউ ভুল করেনা। ওই পুরানো আদরের কুকুর তীব্রের মত পুরানো গাছ-পালাগুলোর সান্নিধ্য রাহিল নেয় রীতিমত নস্টালজিয়ার সঙ্গে। ওই জংলা ভাব সাব এক এক গাছ-লতার প্রতি আগ্রহ যেন বাড়িয়ে তোলে। বাগানের সঙ্গে বিশেষ করে রাহিল ও ময়নার আরো একটি পুরানো সখ জড়িয়ে আছে, যা এবার সবাই একত্র হলে এক সঙ্গে খুবই উপভোগ করেছে। সখটি

গাছের ওপর একটি ডিভাইস ব্যবহার নিয়ে। এটিও একটি ইন্টেলিজেন্ট সফ্‌টওয়্যার যা বহু উদ্ভিদ প্রেমিক এবং সফ্‌টওয়্যার উন্নয়ন প্রেমিক বহুদিন ধরে গড়ে তুলেছে আগাগোড়া পাবলিক ডোমেইনে রেখে। ময়না-রাহিলরা ওটি বেশ কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝে ব্যবহার করে খুব মজা পেয়ে আসছে। সফ্‌টওয়্যারটি একভাবে উদ্ভিদের বক্তব্য যেন শুনতে ও বুঝতে পারে। এর নামই হলো 'সবুজ কথকতা'।

সফ্‌টওয়্যারটি যথেষ্ট পুরানো একটি আইডিয়াকে অনুসরণ করছিলো, যেটি বড় চাষের ক্ষেতের খবর রাখার জন্য একটি গবেষণা থেকে এসেছিলো। উদ্ভিদের ওপর কোন সরাসরি অত্যাচার হলে– যেমন অনেক পাতা ছিড়ে ফেল্‌লে, পোকা লেগে পাতা খেয়ে ফেল্‌লে, কাণ্ডের ক্ষতি হলে কোন কোন উদ্ভিদ রং, গন্ধ এসবে সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তন এনে তার প্রতিক্রিয়া জানায়। ওভাবে পানির অভাবে কষ্টে থাকলে, ডাল পাতা শুকিয়ে গেলে, অথবা উত্তাপে বা শৈত্যে কষ্ট পেলে এরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে। আরো অদ্ভুত ব্যাপার হলো এক রকম শব্দ করেও গাছকে এমন সব কষ্টের কথা জানাতে দেখা গেছে। প্রায় সব উদ্ভিদই সব সময় এক রকম খুব উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি আলট্রাসাউন্ড নির্গত করে যা সংবেদনশীল মাইক্রোফোনে ধরা পড়ে। যখন কোন রকম কষ্টে থাকে তখন উদ্ভিদ তার ওই আলট্রাসাউন্ডের প্যাটার্ন বদলে ফেলে– এক এক রকম কষ্টের জন্য এক এক ভাবে বদলায়, এসবকে রেকর্ড করে রাখা যায়, কী ধরনের কষ্ট দেয়া হয়েছে তার তথ্য সহ।

ওই সফ্‌টওয়্যার তৈরি ও সাধারণ গবেষণার অংশ হিসেবে নানা জনপ্রিয় গাছপালা সহ বিভিন্ন উদ্ভিদের জন্য স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও পীড়িত হবার নানা রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলট্রাসাউন্ডকে রেকর্ড করা হয়েছে। এরকম একই প্রত্যেকটি পরিস্থিতির অনেক তথ্য সংগ্রহ করে মেশিন লার্নিং তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ওই আলট্রাসাউন্ডকে যেন একটি ভাষার মতই বুঝতে শিখেছে। অপরিচিত ভিন্ন ভাষাকে নিজের ভাষায় বুঝে নেবার জন্য যে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বহুকাল আগে আবিষ্কৃত হয়েছিলো এও তারই একটি উন্নততর সংস্করণ।

এক সময় শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এবং কৃষিতে বাস্তব ব্যবস্থাপনার জন্য ওসব দিকেই এই সফ্‌টওয়্যারটি উন্নয়ন করা হয়েছিলো। কিন্তু পাবলিক

ডোমেইনে থাকার কারণে উৎসাহীরা এর উপযোগিতাকে আরো নানা দিকে নিয়ে গেছে। যেমন এমনি একটি দিক হলো ঘরোয়া বাগানের ঘরোয়া গাছপালা উদ্ভিদের কথকতা সহজে মর্মোদ্ধার করার জন্য অনায়াসে ব্যবহারযোগ্য ডিভাইস উদ্ভাবন। মানাজির পরিবারের জন্য এরকম ডিভাইস খুবই যুৎসই হয়েছে নানা দিক থেকে।

বড় কথা হলো ওদের প্রকৃতিপ্রেম। ঘরোয়া বাগান থেকে নিরক্ষীয় বাদলবন, এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে তারা ওটি প্রমাণ করেছে। তবে ওই সবাই বাড়ি এসে অবকাশের আড্ডায় বা এমনি আরো নানা সুযোগে পরিবারে সদস্যের মতই ওই বহুদিনের চেনা গাছপালাগুলোর আরো কাছে চলে যাবার একটি মজার উপায় হলো সেই গাছপালার বক্তব্য শোনার ও বোঝার চেষ্টা। ওই উদ্ভিদ কথকতা বোঝার ডিভাইস ওরা তখন মজা করেই ব্যবহার করে। বাগানে ঘুরে ঘুরে এই গাছ, ওই চারার খুব কাছে গিয়ে তার কথা শোনে। ডিভাইসটি অনায়াসে ব্যবহার করা যায় বটে কিন্তু যেমন অবলীলায় বলা হলো ‘কথা শোনা’, ডিভাইসের পক্ষে ওই কাজটির ব্যবস্থা করা মোটেই সরল নয়। তাকে অনেক কিছু করতে হয় বাগানে প্রত্যেকটি উদ্ভিদের কথা আলাদা ভাবে শোনার জন্য, আর সেটি শুনে তার ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ বোঝার জন্য।

প্রথমে মাইক্রোফোনে শুধু সেই গাছটার থেকে আসা অতি দুর্বল, অতি সূক্ষ্ম আলট্রাসাউন্ডগুলো ধরা পড়তে হবে, এমনকি গাছটার কোন বিশেষ অংশ থেকে। আশপাশের অন্য সব উদ্ভিদ থেকে আসা প্রায় একই রকমের অন্য শব্দগুলোকে ফিল্টার করে বাদ দিয়ে দিতে হবে, নইলে সফ্টওয়্যার ওসব নয়েজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে বিশেষ গাছটির কথার ঠিক মত মর্মোদ্ধার করতে পারবেনা। তারপর এখন ডিভাইসের যে রূপটি রাহিলরা ব্যবহার করছে সেটি খুবই ব্যাপক ভাবে আর্দ্র উষ্ণ অঞ্চলের সব গাছপালার ও ছোট উদ্ভিদের জন্য প্রয়োগযোগ্য– সেভাবেই সফ্টওয়্যার গাছের ভাষা শিখেছে। তখন ওদের পারিবারিক বাগানের যে নানা উদ্ভিদ তার প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ ভাবে টিউন করে নিতে হয় একে– তাদের বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখ করে। অবশ্য ওরা আগে থেকে প্রত্যেকটির শর্টকাট ডিভাইসে তুলে রেখেছে। কাজেই ধরা যাক সজনে গাছের কথা শুনতে গেলে সজনে উল্লেখ করলেই সফ্টওয়্যার সজনের নিজস্ব ভাষাটি শোনার জন্য তৈরি হয়ে যায়। এসব টিউনিং ইত্যািদিতে অবশ্য ওরা

এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে- বাগানে ঘোরাঘুরি করে আড্ডা দেবার সময় যে কোন গাছের কথা শুনতে চাইলে তাতে তেমন বড় কোন ঝামেলার দরকার হয়না। যা করার ডিভাইস নিজেই করে।

কিন্তু কেন গাছের কথা শুন্‌তে চাওয়া? আপন ও অন্তরঙ্গ সে প্রাণীই হোক বা উদ্ভিদই হোক, সে কেমন আছে জানার কৌতুহলটি এখানে বড়। আর সবাই মিলে যদি শোনা যায় তা হলে তো কথাই নেই। যদি কথা হিসেবে শুনতে চাই তা হলে ডিভাইস সেই ভাবেই শোনায়– একেবারে আলাপী আপন বাংলা ভাষায় সেটি বেশ চলতে পারে। অথবা যদি লিখিত বার্তা হিসেবে চাই তাও। গাছটি তার কুশল বার্তা দেয়– যদি সব দিক থেকে তার স্বাস্থ্য ভাল থাকে তা হলে সেভাবে নিজের চাঙ্গা থাকার কথা বলে। সম্প্রতি ভাল কিছু ঘটে থাকলে তাও বলে– যেমন আজ ভোরে প্রথম বেশি করে শিশির ঝরাতে তার ভাল কেটেছে, সকালে পাতা-ডগাগুলো সতেজ টস্‌টস্‌ হয়েছে। প্রায়ই অবশ্য নানা ছোট বড় অভিযোগ থাকে, কষ্টের কথা থাকে। রোদের তেজ বেড়ে গেছে, গরমে কষ্ট হচ্ছে। অনেকদিন বৃষ্টি নেই, পানিও দেয়া হয়নি– জলকষ্টটি তার মত করে জানাচ্ছে উদ্ভিদটি। এই একই অভিযোগ কি বাগানের অন্যরাও করছে? তাদের মধ্যে পানির প্রয়োজন সবার সমান নয় তাই অভিযোগও ভিন্ন। কোন গাছের পাতা ভেতর থেকে পোকায় কাটছে- সে কথাটিই বর্ণনা দিয়ে বলার চেষ্টা করছে এটি। একটি গাছ এমন অভিযোগ করলো যেটি রাহিলরা আগে সন্দেহ করেনি। মাটি থেকে গা বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠেছে অনেক শামুক আর সেখানে পাতা কেটে ফেলেছে। কোনটি আবার আনন্দ বার্তা দিচ্ছে– আমার কিন্তু প্রচুর ফুল এসেছে এ ফুলের ফল হবার সবকিছু ঠিক পথে আছে– আম আর কাঠাল উভয়েই প্রায় একই ভাবে এমন কথা বলেছে– তারা খুশি।

আলাপের আনন্দ ছাড়াও, কিছুটা কাজেও লাগতে পারছে পরিবার এ সব শোনার পর। অভিযোগগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়াটি প্রয়োজন। এর অনেকগুলোই আসতে পেরেছে এমনি ঘন ঘন আলাপের অভাবে। যদি বাগানের দিকে একটু সময় দিতো, কে কেমন আছে একটু লক্ষ্য রেখে তাদের কথা শুন্‌তো, তা হলে ওদেরকে কষ্টের কথাগুলো বলতে হতোনা!

চিরঞ্জীব

ছেলে মেয়ে সবাই যখন বাড়িতে আয়েশী মুডে থাকে তখন মানাজির পরিবারের সঙ্গে আর একজন মানুষ প্রায়ই তাদের মধ্যে আসেন। কিন্তু তিনি সশরীরে আসেন না; আলোচনায় আসেন, সবার মনে মনে আসেন, অন্য ভাবে আরো কিছুটা জীবন্তের মত হয়ে হয়ে আসেন– কিন্তু মানুষটা বেঁচে নেই। সবার ভালবাসার পাত্র হিসেবে তবুও তিনি আসেন। তিনি সোফিয়ার বাবা মোশতাক আহমদ চৌধুরী চট্টগ্রামের বিদ্যৎ জনের একজন মধ্যমণি হিসেবে সবাই যাঁকে চিনতো এবং মনেও রেখেছে। চট্টগ্রাম কলেজে (এখন সর্বজনীন স্কুল) অধ্যাপনাটি যদিও ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের নেশা তাঁর আসল খ্যাতি আধুনিক চট্টগ্রামের রূপায়ন, এবং একটি বৈজ্ঞানিক ও বিশ্বমুখী নগরী হিসেবে বিশ্বে একে পরিচিত করতে অবদান রাখার জন্য। এ জন্য দেশ বিদেশে ঘুরে কাজ করেছেন তিনি– আঞ্চলিক এবং বিশ্ব পর্যায়ে। শেষ বয়সে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেতো চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীতে নিবিড় ভাবে তাঁর কোন না কোন গবেষণায় রত। স্থানীয় ঐতিহ্য রক্ষা, ও স্থানীয় উন্নয়ন ছিল তাঁর সাধনা, সেটি চট্টগ্রামের জন্য তো বটেই, দুনিয়ার আরো কিছু কিছু স্থানের জন্যও।।

শত কাজ শত ব্যস্ততার মধ্যেই মোশতাক চৌধুরী ছিলেন তাঁর একমাত্র মেয়ে সোফিয়ার কাছে ফ্রেন্ড, ফিলোসোফার, এ্যান্ড গাইড– নবজাত ছোট্ট মেয়েটির নিকটতম মানুষ হওয়া থেকে শুরু করে আমৃত্যু। যখন যে যেখানে থাকুক প্রিয় বাবাকে অন্তত ভিডিয়োফোনে একটু না দেখে, না আলাপ করে, তাঁর সঙ্গে একটু পরামর্শ না করে সোফিয়া কখনো শান্তি পেতেননা। অনেকে বলে সোফিয়া আজ যা হয়েছে তার পেছনে বাবার প্রভাব খুব বেশি– তার নেতৃত্ব, গবেষণা, সমুদ্র-প্রীতি সব কিছুতে। বিয়ের পর শান্তরও একজন প্রিয় অভিভাবকে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। আর রাহিল-ময়নার কাছে তিনি হয়ে পড়েছিলেন স্কুলের বড় ভাইয়ের মতই এক বন্ধু। ওরা তাঁকে আজকের রোল মডেল হিসেবে দেখতো, প্রাচীন এক মাতামহ হিসেবে নয়। একই সঙ্গে তাদের 'নানা' মানে তাদের গল্পের ভাণ্ডার, ইতিহাসের ভাষ্যকার, মজার আলাপের মধ্য দিয়ে সব সময় পথ বাৎলে দেয়ার মানুষ। 'এ মুহূর্তে এ সমস্যায় কার কী করা উচিত?' 'নানাকে জিজ্ঞেস কর।' পরিবারের সবাই 'নানা' বলেই তাঁকে বোঝাতো।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানত রাহিলের উদ্যোগে ওরা নানা'র একটি ব্যক্তি-ইন্টেলিজেন্ট প্রতিরূপ তৈরি করিয়েছিলো। খুব উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিরূপ করার জন্য ইন্টেলিজেন্ট সফ্টওয়্যার নির্মাণে দক্ষ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়েছে। কারো মোটামুটি সাধারণ গোছের প্রতিরূপ তৈরি করতে চাইলে মানাজির পরিবারের সদস্যরাই সেটি করতে পারতো– তবে 'নানা' বলে কথা। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর পুরো ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান এবং সমস্ত আবেগ ও বুদ্ধির প্রকাশ ঘটিয়ে হুবহু তাঁর চেহারা নিয়ে তাঁর মতই প্রাসঙ্গিক আলাপচারিতা করতে পারে এই প্রতিরূপ। নিশ্চিত করেছে তার মধ্যে হুবহু তাদের নানাকেই থাকতে হবে।

ওদের জন্য ইন্টেলিজেন্ট প্রতিরূপ অপরিচিত কিছু নয়; আধুনিক কালে যারা স্কুলে গিয়েছে তাদের কারো কাছে নয়। স্কুলের একটি কাজ হলো আগের দিনের বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষের প্রতিরূপের সঙ্গে আলাপ করা। এর মধ্যে সাম্প্রতিক কালের জ্ঞানী-গুণী যুগান্তকারী মানুষ যেমন আছেন তেমনি আছেন ঐতিহাসিক নানা চরিত্র; যেমন একদিকে নেপোলিয়ন-ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে লিংকন-চার্চিল-রুজভেল্ট অন্যদিকে সেক্সপীয়র-টলস্টয় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল। এঁদের সবাই ডিজিট্যাল যুগের আগের মানুষ। কিন্তু তাঁদের কারো কারো ছবিতে বা সিনেমায়– ধারন করা চিত্র ও কথাবার্তা রয়েছে। আর অন্য সবার নিজের লেখাও বলা অজস্র কাজ ও বক্তব্য রয়েছে। নিজেদের বক্তব্য ছাড়াও তাঁদের সবার সম্পর্কে অন্যরা লিখেছেন, বলেছেন এমন জিনিসও প্রচুর রয়েছে। এর সবগুলো ডিজিট্যাল রূপে নিয়েই যার যার ইন্টেলিজেন্ট প্রতিরূপ গড়ার কাজ সম্ভব হয়েছে। এসবে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, উপস্থিত বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর, ও সমস্যা সমধানের তথ্যের বিশাল আকর। ইন্টেলিজেন্ট মেশিন- লার্নিং এই তথ্য ভাণ্ডার ব্যবহার করেই তাঁর প্রতিরূপ গড়ে তোলে। তথ্যের বিশ্লেষণে ও তার মধ্যে নানা প্যাটার্ন আবিষ্কার করে এটি বেশ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারে। আগের যে কোন ঘটনা বা অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে তাঁর যে সব প্রতিক্রিয়া ও বক্তব্য রয়েছে তার ভিত্তিতে তাঁর সম্ভাব্য স্মৃতি, মতামত, বিশ্লেষণ, প্রশ্নোত্তর বিবৃত করতে পারে। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরের যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া, মতামত, প্রশ্নোত্তর, পরামর্শ কী হতে পারতো তাও নির্ণয় করে। এই সব কিছু একেবারে বাস্তবের

মত করে তাঁর চলচ্চিত্রে প্রতিস্থাপন করে সামঞ্জস্যপূর্ণ মুখ ও দেহভঙ্গিতে বলার ব্যবস্থা করে।

এই শেষের সক্ষমতাটি ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধির একটি অবিশ্বাস্য জয় জয়কার। জীবৎকালে মানুষের যাবতীয় বক্তব্য ও কাজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে বক্তব্য তিনি কখনো দেননি কিন্তু দেয়াটাই তাঁর ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান ও বিবেচনার দিক থেকে সব থেকে বেশি যুক্তিযুক্ত হবে সেটির ভবিষ্যদ্বাণী করে তাঁর ছবির মুখে দিয়ে দেয়া, এমনকি ছবিতে তাঁকে সে রকম কাজ করতে দেখানো। কাজেই স্কুলে ছাত্ররা সেই ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে কথা বলতে পারে। তাঁকে তাঁর জন্য প্রাসঙ্গিক যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে যেগুলো অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর জানা থাকার কথা। কোন অভিজ্ঞতার কথা তিনি বর্ণনা করার সময় মাঝখানে থামিয়ে এর কোন দিক আরো স্পষ্ট করতে অনুরোধ করতেও পারে। এমনকি তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের কোন বিষয় নিয়ে তিনি বেঁচে থাকলে কী করতেন, বা তাঁর মত কী হতো তাও জিজ্ঞেস করতে পারে। এসব যে কোন ছাত্রের ইতিহাস জ্ঞান লাভ ও গবেষণার জন্য অত্যন্ত চমকপ্রদ প্রেরণাদায়ী অভিজ্ঞতা হতে পারে, এতই বাস্তব সম্মত ও বিশ্লেষণ সম্মত হতে পারে এই কথোপকথন।

মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগে নেপোলিয়নের বা টলস্টয়ের বা রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিরূপ এই নতুন বক্তব্যগুলো দিচ্ছে সেগুলো কতটা তাঁর কথা হতে পারার মত নির্ভরযোগ্য। তাঁদের সম্পর্কে পাওয়া তথ্য যত বেশি ও বিচিত্র হবে নতুন বক্তব্যের ওপর তত আস্থা রাখা যাবে। তাছাড়া সফ্‌টওয়্যারটি কতটা সুনির্মিত সেটিও একটি কথা বটে। একই প্রশ্নে যদি প্রায় একই রকম উত্তর বা প্রতিক্রিয়া এই প্রতিরূপ দেয় এবং তা মূল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিক হয় তা হলে বুঝতে হবে সফটওয়্যার আসল মানুষটি যা বলতে পারতেন তার কাছাকাছি বক্তব্য তাঁর প্রতিরূপের মুখ দিয়ে প্রকাশ করছে। আর যদি বিভিন্ন বার বিভিন্ন উত্তর আসে তা হলে আস্থা কমে যেতে বাধ্য। বোঝা যাবে যে সফ্‌টওয়্যার কিছুটা ইতস্তত নানা বক্তব্য দিচ্ছে, মূল তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছেনা। কিছু অনিশ্চয়তা সব সময় থাকবে– যে কথা মূল ব্যক্তির সত্যিই দেখা বা বলা তা নিয়ে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু যা শুধু প্যাটার্ন অনুসরণ করে প্রতিরূপের মুখে এসেছে সেটি তো

হুবহু সত্য বলে নিশ্চিত হওয়া যাবেনা। কিন্তু ভাল ইন্টেলিজেন্ট প্রতিরূপ আজকাল রয়েছে বলে ছাত্ররা সত্যি সত্যি ঐতিহাসিক সেই মানুষটির জগতে ও সেই মানুষটির মনের ভেতর চলে যেতে পারছে।

ওসব ঐতিহাসিক চরিত্রের ইন্টেলিজেন্ট প্রতিরূপের সঙ্গে রাহিল-ময়নার নানার প্রতিরূপের তেমন কোন তফাৎ নেই, উভয়ে একই ভাবে তৈরি। মোশতাক আহমদ চৌধুরী আধুনিক ডিজিট্যাল যুগের মানুষ। তা ছাড়া তিনি অত্যন্ত জনসম্পৃক্ত মানুষ, নানা ভাবে দেশে ও বিদেশে। এই ভূমিকায় তাঁকে সারা জীবন প্রচুর বলতে হয়েছে প্রচুর লিখতে হয়েছে– শুধু ইমেইল ও ম্যাসেজগুলো বিবেচনা করলেই সে এক বিশাল ব্যাপার, সবই ডিজিট্যাল রূপে রয়েছে। তাছাড়া বই, প্রবন্ধ, বক্তৃতা এসবতো রয়েছেই। প্রচুর সাক্ষাৎকার এবং সাধারণ কথোপকথনও রয়েছে। রাহিলরা নিশ্চিত করেছে যে এই সব তথ্যই নানার প্রতিরূপ সফ্টওয়্যারটি নির্মাণে তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া স্বয়ংক্রিয় ভাবে এমন ব্যবস্থা রয়েছে যে সব সময় বিশ্ব নেটওয়ার্কে যে নতুন সব তথ্য যোগ হচ্ছে এ সফ্টওয়্যার সেখানকার তথ্যও নানার বক্তব্য সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে পারে। সোফিয়ার কাছে তার বাবার বা ওদের কাছে তাদের নানার প্রতিরূপের ওপর আস্থা অনেক অনেক বেশি, কারণ তারা তাঁকে তাঁর জীবৎকালে দেখেছে, তাঁর প্রত্যেকটি স্মৃতি তখনো তাদের মনে অত্যন্ত জাগরুক। তাঁর প্রতিরূপ তাঁকে ওদের কাছে আরো বেশি জাজ্জল্যমান করছে। এ তো হুবহু তিনি, সেই পরিচিত কণ্ঠ, সেই অতি অন্তরঙ্গ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, সেই স্নেহভরা চোখ! বিশেষ করে ময়নার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর অতি পরিচিত দুষ্টুমি ভরা ভঙ্গিটি চট্ করে যেন ফেরৎ আসে।

তিনি এর মধ্যে এক ভাবে বেঁচে আছেন এমন কথা সবাই বলবে। শুধু কথার ভঙ্গি কেন, কথাগুলোও তো অবিকল তাঁর কথা– প্রত্যেকটি উত্তর, প্রত্যেকটি পরামর্শ প্রত্যেকটি সান্ত্বনা। বেঁচে থাকলে আজকের কোন ঘটনা, কোন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাঁর কাছে ওরা যা আশা করতো, ঠিক সে রকম এখনো পাচ্ছে; বেশ কাজেও আসে। নানার এই ইন্টেলিজেন্ট প্রতিরূপের সঙ্গে পরিবারের প্রত্যেকের যখন ইচ্ছে ব্যক্তিগত আলাপ হয়, যখন তাঁর কথা মনে পড়ে, অথবা সত্যি কোন বিষয়ে তাঁর মতামতটি প্রয়োজন মনে করে। কম্পিউটারে যে কোন সময় তাঁরা তাঁকে সামনে নিয়ে আসতে পারে। যেমন

সোফিয়া অনেক একাকী ব্যথিত মুহূর্তে তাঁর সঙ্গ পাওয়াটি সব চেয়ে সান্ত্বনাদায়ী বলে মনে করেন; সমস্যাটি বাবাকে বলে তাঁর সস্নেহ বুঝ দেয়াটাই মনে শান্তির পরশ হিসেবে গ্রহণ করেন।

কিন্তু আজ এই পারিবারিক আড্ডায় ব্যাপারটি অন্য রকম। আজ নানাকে দরকার আড্ডাকে সম্পূর্ণ করতে, যেমন করে একদিন তারা প্রায়ই করতো। আড্ডায় সবার কথা নানা শোনেন, তাদের অনুরোধ রাখেন, নিজেও এর মধ্যে ফোড়ন কাটেন। এভাবে এক রকম তাদের কলকাকলিতেই নানা যোগ দেন।

রাহিল: 'নানা, আমি যখন পলিনেশিয়ার দেশে দেশে ঘুরি তখন দেখি তারা নিজেদের ভাষা নিয়ে খুব চিন্তিত। সব পলিনেশিয়ানদের ভাষা প্রায় এক রকম, অল্প শুধু পার্থক্য। তবুও সেটি রক্ষায় তারা খুব বিচলিত। আমি তখন গর্ব করে বলি আমার নানা চাটগেঁয়ে ভাষাকে রক্ষার জন্য কী না করেছেন।'

নানা: 'ঠিক বলেছো। আমি এক সময় বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম বহু হাজার বছরের এই অনন্য ভাষাটিকে রক্ষা করতে। সে সময় তো ওটি না বলা, না বুঝা বৃহত্তর চট্টগ্রামে শহর অঞ্চলে একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিলো। আমি বল্‌লাম ইন্টেলিজেন্ট অনুবাদকারী যখন সঙ্গে সঙ্গে এটি যে কোন ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছে, তাহলে তুমি তোমার মাতৃভাষাটি ছাড়বে কেন?'

রাহিল: 'তুমি কি ওই দিকে কখনো ঘোরাঘুরি করেছো– এই টঙ্গা, সামোয়া, কুক্‌স আইল্যান্ড এসব দ্বীপে?'

নানা: 'বলো কি, আমি যখন আঞ্চলিক সরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করছিলাম তখন আমার অনেকটা সময় কাটতো ইন্দোনেশিয়ায়-নুসানতারায়। জান তো এটি কোন প্রাচীন শহর নয় জাকার্তা, যোগজাকার্তা বা বান্দুং এর মতো। এটি একেবারে নতুন রাজধানী ওরা বিশের দশকে তৈরি করেছিলো। দেশের পূর্ব অঞ্চলে বোর্নিও দ্বীপের কালিমন্তনে বলতে গেলে জঙ্গল সাফ করে এটি তৈরি হয়েছে। ও সময়েই প্রথম পলিনেশিয়ার বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতে যেতে হয়েছিলো। ওদের সম্পর্কে আমার এক রকম রোমান্টিক ধারণা ছিল বহুদিনের। এখন আমার খুব মজা লাগে যে তুমি বলতে গেলে তাদেরই একজন হয়ে ওঠেছো। ওদের ভাষায় কথা বলো। এমন যে হবে কখনো ভাবিনি। জানো তো তোমার জন্মের পর সোফি আমার কাছে একটি

ভাল নাম চেয়েছিলো। আমি ইবনে বতুতার বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী বইটির নামের অনুসরণে তোমার নাম প্রস্তাব করেছিলাম "রাহিল"– আরবীতে যার মানে ভ্রমণকারী।'

সোফিয়া: 'তোমরা তো বাবাকে তাঁর যৌবনে দেখোনি, আমি কিছুটা দেখেছি। সবাই মনে করে তিনি সব কিছু চট্টগ্রামের জন্য করেছেন, এটি অত্যন্ত ভুল কথা। তিনি দেখাতে চেয়েছেন এক পাশে নীরবে পড়ে থাকা যে কোন সমাজ নিজের স্বকীয়তা নিয়ে সচেতন হলে সে কি না করতে পারে। অনেক জায়গার জন্য তিনি অনুপ্রেরণা হয়েছেন। তখন দারুণ ঘুরতেন, আমরা পরিবারে তাঁকে এক সঙ্গে বেশিদিন পেতামনা। ওই যে ওয়ালেস লাইনে আমরা ঘুরে আসলাম ওসব জায়গার কথা তো তাঁর ভ্রমণের গল্পেই প্রথম শুনেছি, আলফ্রেড ওয়ালেসের কথা তো তিনিই আমাকে বলেছেন, আজ লোকে আমাকেই ওয়ালেস-ভক্ত মনে করে।'

নানা: 'আর কাকে ওই সব গল্প শোনাব। এই এক এক বার চলে যেতাম, আর ফিরে এসে আদরের সোফিয়াকেই সব গল্প বলতাম। আমার সব সময় ভয় ছিলো সোফি বোধ হয় সব গল্প ইন্টেলিজেন্টদের থেকে শুনছে, ওরা কি আমার চোখে দেখা মনে ধরা কাহিনীগুলোর মত গল্প ওকে বলতে পারতো?'

শান্ত: 'কয়েক মাস আগে নসুনতারা থেকে একজন কনসালটেন্ট আমাদের কারখানায় এসেছিলো। তার সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলাম– কথায় কথায় বল্‌লো "সম্প্রতি জেনেছি মোশতাক চৌধুরী নামের যে বাংলাদেশীর নাম নসুনতারার নিজস্ব কালচার গড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িত তিনি আপনার শ্বশুর! জাকার্তা, যোগ জাকার্তা, বান্দুং, বালি এসব নগরের হাজার বছরের ইতিহাসের কাছে নসুনতারাকে সবাই জঙ্গলে মঙ্গল বলে নাক সিটকাতো। মোশতাক চৌধুরী তাঁর অভিজ্ঞতা এখানে ব্যবহার করেছেন মানুষের আস্থা সৃষ্টিতে"।'

নানা: 'বলে কি, এখনো তারা সে কথা মনে রেখেছে? আমি খুব অবাক হচ্ছি! নসুনতারা নগরটি গড়ে ওঠার পেছনে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে।'

ময়না: 'তুমি শুধু আমাকেই দারুণ ঠকিয়েছ। ছোটবেলায় যখনই এটি সেটি এঁকেছি তোমার প্রশংসার কোন সীমা ছিলনা। আঁকলাম আমি, আর তুমি তার কত ব্যাখ্যা দিতে– এটি দিয়ে আমি কী বোঝাচ্ছি, ওটি দিয়ে কী বোঝাচ্ছি তা

তুমি সবাইকে বলে বেড়াতে। কিন্তু যখন আমি সত্যি একজন আলোচিত আর্টিস্ট হলাম, তুমি চুপ হয়ে গেলে। এখন আমি তোমাকে দেখাতে পারতাম আমার ছবি শুধু তুমি বোঝনা, অনেকেই বোঝে। এখন তোমাকে কী ভাবে আমার ছবি দেখাবো?'

নানা: 'তুমি আমাকে পাঠিয়ে দেবে আমার ছোট্ট ময়না, আমি ঠিকই দেখে দেবো, মোটেই মন খারাপ করবেনা। তোমার আঁকা ছবি দেশে বিদেশে সবাই দেখছে, এর ব্যাখ্যা তুলে ধরছে- এ খবর আমি রাখিনা এ কথা তুমি কেমন করে ভাবতে পারলে?'

সোফিয়া: 'বাবা, আমার ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমরা যখনই একত্র হই, গল্প করি, তোমাকে তাদের খুব দরকার হয়, নইলে যেন সবার মিলন মেলা জমেই না। শুনি আমার মত তারাও মাঝে মাঝে এখনো একান্তে তোমার সঙ্গে কথা বলে, বিভিন্ন বিষয়ে তোমার মন্তব্য চায়। তোমার গুণেই এমনটা হয়েছে। তুমি এমন করে বাচ্চাদের সঙ্গে মিশতে পেরেছো, বড়দের সঙ্গেও একই ভাবে।'

রাহিল: 'মা নানার আর একটি গুণ আমি জানি, তোমরা কতটুকু জান কখনো টের পাইনি। নানা কিন্তু নিজে নিজে গান গাইতে ভালবাসেন– সারাক্ষণ গান করেন গুনগুন করে। আবার কখনো গলা ছেড়েও গান করেন। এটি আমি আবিষ্কার করেছি। ধরা পড়ে তখন নানা আমার কাছে স্বীকার করেছেন তাঁর ওই পুরানো অভ্যাসের কথা, একেবারে বালক বয়স থেকে যার শুরু। সারা জীবন বজায় ছিল তা। মনেও রাখতেন দারুণ– ওই স্কুলে যে সব গান গাইতেন, বিদেশে গিয়ে ওদের ভাষার যে সব গান শুনেছেন, গাইতে গাইতে শিখেছেন, বহু দিন পরেও মনে করে আবার গাইতেন। আমাকে তখন বলেছেন তাঁর সব চেয়ে বেশি ভাল লাগে চাটগেঁয়ে ভাষার পুরানো গান গাইতে। ওই যেমন সাম্পান-মাঝির গান, যে গান তিনি ছোটবেলায় মানুষকে গাইতে শুনেছেন, কিন্তু সাম্পান বা মাঝি বাস্তব জীবনে দেখেন্‌নি। ওভাবেই গনের মধ্যে দিয়ে তিনি বিভিন্ন স্মৃতিতে ফিরে যান।'

ময়না: 'আমরা শুনলেই শুধু তা বিশ্বাস করবো। নানা তোমাকে এখন গাইতে হবে। গাইতে হবে সেই গান যেটি গেয়ে তুমি মাকে ঘুম পাড়াতে। না গাইলে আমরা ছাড়বোনা– ওটিই গাইতে হবে।'

নানা: 'কী বলছো এসব, ওটিতো আজকের কথা নয়, তা কি আর আমার মনে আছে?'

রাহিল: 'না তুমি ঠিকই পারবে, ওটি তোমার মনে না থেকে পারেনা– তুমি আমাকে তোমার ছোটবেলার গানও শুনিয়েছো।'

নানা: 'ঠিক আছে শোন তা হলে। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়োনা যেন–

আমার সোনা চাঁদের কণা
ছোট্ট সোফি মেয়ে
বড় হবি যখন এ গান
উঠবি তুই গেয়ে।
এ গান আমি গাইছি যে আজ
তোকেই ভালবেসে,
ওই চেয়ে দেখ আমার কথায়
চাঁদ উঠেছে হেসে।
আয় রে ও চাঁদ
আয় দুচোখে ঘুমটি দিয়ে যা
আয় রে ও চাঁদ
আয় দুচোখে ঘুমটি দিয়ে যা।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড.ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর।